কে তুমি নারী কী তোমার মর্যাদা

সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী র.

সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী

কে তুমি নারী
কী তোমার মর্যাদা

অনুবাদ
রাবেয়া বিনতে সালমান

সম্পাদনা
শাহ্ আবদুল হালীম হুসাইনী
মুহাদ্দিস, মাদরাসা দারুল হাবীব (সা.) আল-ইসলামিয়া, মিরপুর-১১, ঢাকা
সহকারী সম্পাদক, পাক্ষিক মুক্ত আওয়াজ

আল-ইরফান পাবলিকেশন্স
ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ০১৭৪৮৯৮৫১৬৩

কে তুমি নারী
কী তোমার মর্যাদা

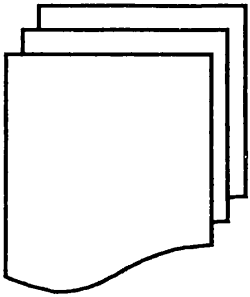

প্রকাশক

শাহ্ আবদুল হালীম হুসাইনী

আল-ইরফান পাবলিকেশন্স

ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা

মোবাইল : ০১৭৪৮৯৮৫১৬৩

গ্রন্থস্বত্ব : প্রকাশক

প্রচ্ছদ : সাজ ক্রিয়েশন

দ্বিতীয় প্রকাশ : এপ্রিল ২০১২ ঈ.

মূল্য : ১৮০ (একশত আশি) টাকা মাত্র

সাফিয়্যাহ বেগম

আমার মা
আমার আদর্শ
আমার প্রেরণা
দীর্ঘদিন বেঁচে থাক মা
আমাদের মাঝে।

রাবেয়া বিনতে সালমান

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক
https://t.me/islaMic_fdf

ইসলামে নারীর মর্যাদা

পুরুষ ও নারী মানুষ হিসেবে সমান মর্যাদার অধিকারী। ইসলাম তাদেরকে এক অভিন্ন মর্যাদা দিয়েছে। মানব সমাজে যে সম্মান ও গুরুত্ব পুরুষের জন্য স্বীকৃত, হুবহু তা-ই নারীর জন্যও স্বীকৃত। তাদের মধ্যে সম্মান ও গুরুত্বের দিক থেকে বিভাজন বা পার্থক্য সৃষ্টি করেছে মূলত মূর্খ গোষ্ঠীগুলো। এই মূর্খ গোষ্ঠী বলতে আমার উদ্দেশ্য সেসব জাতি ও সম্প্রদায়, যারা আসমানী আহকাম ও আসমানী কিতাবাদিতে প্রদত্ত হেদায়াত ও পথনির্দেশনা থেকে নিজেদেরকে মুক্ত-স্বাধীন করে নিয়েছে। সেসব জাতি পুরুষ ও নারী তো বিরাট ব্যাপার, স্বয়ং পুরুষে পুরুষে বিভাজন করেছে। দাঁড় করিয়েছে পার্থক্যের দুর্ভেদ্য প্রাচীর। তারা শ্বেতাঙ্গকে যে গুরুত্ব ও সম্মান দিয়েছে, তা মোটেও দেয় নি কৃষ্ণাঙ্গকে। কোনও কোনও মানব বংশকে অন্যান্য বংশ-গোষ্ঠীর উপর প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছে। সুতরাং পৃথিবীর শীতপ্রধান অঞ্চলগুলোর অধিবাসীদেরকে শ্বেতাঙ্গ আর বিশ্বের পূর্ব ও দক্ষিণাঞ্চলীয় দেশগুলোর অধিবাসীদেরকে কৃষ্ণাঙ্গ জাতি আখ্যা দিয়ে কালোকে সাদা বা শ্বেতকায় লোকদের দাস ও নিম্নশ্রেণীর জীব বানিয়ে দিয়েছে। অধিকন্তু তাদের সাথে পশুর মতো আচরণ করেছে। আবার উল্টো ইসলামের বিরুদ্ধে অপবাদ রটিয়েছে যে, ইসলাম নারীকে দাসী ও হীন বানায়। অথচ ইসলাম নারীকে পুরুষের সমান মর্যাদা দিয়েছে। জীবনের নেয়ামত, স্বাদ ও প্রয়োজনাদীর ব্যাপারে নারীকে পুরুষের সমান রেখেছে। পিতাকে নির্দেশ দিয়েছে, নিজ কন্যাদের প্রতি নিজ পুত্রদের অপেক্ষা কম লক্ষ্য রাখবে না। এমনকি কন্যাদের সাথে স্নেহ-প্রীতি, আদর-সোহাগের এবং মনোযোগিতার সাওয়াব ও পুরস্কার রেখেছে পুত্রদের সাথে স্নেহ-প্রীতি ও মনোযোগিতা অপেক্ষা বেশি। রাসূল (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি কন্যাদের লালন-পালন ও তত্ত্বাবধান করবে, আমি এবং সে জান্নাতে এরূপ কাছাকাছি থাকব, যেমন হাতের মধ্যে শাহাদত ও মধ্যমা আঙ্গুলি।

অনন্তর কন্যা বড় হয়ে পুরুষের জীবন-সঙ্গিনী হওয়ার ক্ষেত্রে তার সম্মান ও গুরুত্বের খেয়াল সমান ও ন্যায়সঙ্গতভাবে রাখার নির্দেশ দিয়েছে। এমনকি সকল দায়-দায়িত্ব, কাজকর্ম ও ব্যয়ভার আরোপ করেছে পুরুষের

ওপর; নারীর উপর কোনও বোঝাই আরোপ করে নি। পৃথক হয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রেও নারীর জন্য সুযোগ রেখেছে। সুতরাং অবস্থা-পরিস্থিতি যদি সে নিজের জন্য বাস্তবিকই অমসৃন এবং বসবাস অনুপযোগী দেখতে পায়, তবে তার জন্য স্বামী থেকে পৃথক হয়ে যাওয়ার পথও খোলা রয়েছে। আবার স্বামীর সঙ্গে মিলেমিশে জীবন যাপন করার সময়ও আপন পিতামাতার সঙ্গে তার সম্পর্ক অটুট-অক্ষুণ্ন রেখেছে। যাতে অকস্মাৎ কখনও যদি তাকে স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন হতে হয়, তবে তার নিজের আসল ঠিকানায় যেমন পিত্রালয় বা ভ্রাতালয়ে ফিরে যেতে কোনও সমস্যা না হয়। স্বামী, পিতা-মাতা ও ভাই-বোনের সম্পত্তির মধ্যে উত্তরাধিকার অংশ তার জন্যও নির্দিষ্ট রেখেছে। পক্ষান্তরে অন্যান্য জাতিগুলোর মধ্যে নারীর এ সম্মান ও মর্যাদার অর্ধেকও পাওয়া যায় না। সেসব জাতি-ধর্মের মধ্যে বিয়ের পূর্বে তাকে পিতা-মাতা ও ভাইদের থেকে হীন-নীচ আর বিয়ের পর আপন স্বামীর দাসী-বাঁদী হয়ে থাকতে হয়। আবার পৃথক হওয়ারও কোনও অধিকার পায় না। বিধবা হলে তো আরও শোচনীয় অবস্থায় গিয়ে পৌঁছায়। অথচ ইসলামে নারী এ ধরনের নীচুতা-হীনতা ও বঞ্চনা-বৈষম্য থেকে মুক্ত করা হয়েছে। তাকে দেওয়া হয়েছে পুরুষের সমান মর্যাদা ও গুরুত্ব। এজন্য তাগিদ করা হয়েছে কঠোরভাবে। সেইসঙ্গে পুরুষ ও নারীর মধ্যে যেসব সৃষ্টিগত পার্থক্য রয়েছে, সে হিসেবে প্রত্যেকের দায়-দায়িত্ব এবং কাজকর্মে পার্থক্য রাখা হয়েছে। কিন্তু যেসব বিষয় ও পথে বিপদ-বিপর্যয় সৃষ্টির আশঙ্কা ছিল, সেসব বিষয় ও পথকে অলঙ্ঘনীয় নিয়ম-শৃঙ্খলার বন্ধনে আবিষ্ট করে দিয়েছে। যাতে মানব সমাজে বিপর্যয় সৃষ্টি না হয়।

পুরুষ ও নারীকে সম্মান ও গুরুত্বের দিক থেকে এক অভিন্ন স্থান দেওয়ার সাথে সাথে আল্লাহ পাক তাদের মধ্যে যে দৈহিক পার্থক্য রেখেছেন, তাতে মানব জীবনের বহুমুখী প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে। মানব জীবনে এমন কিছু অবস্থা-মুহূর্ত রয়েছে, যেখানে পুরুষের গুণাবলী অধিক কার্যকরী হয়, আবার কোনও কোনও ক্ষেত্রে নারীসূলভ বৈশিষ্ট্যগুলো হয় বেশি ফলপ্রসূ। আর দু'জনেরই জীবনের সাফল্য লুকিয়ে থাকে এক পরিবার হয়ে থাকার মধ্যে। পুরুষের জীবন পূর্ণাঙ্গ হয় নারী তার জীবনসঙ্গিনী হওয়ার দ্বারা আর নারীর জীবন পূর্ণাঙ্গ হয় পুরুষ তার জীবনসঙ্গী হওয়ার দ্বারা। তাদের যে কেউ একাকী জীবন কাটায়, তার জীবনে থাকে বিরাট শূন্যতা। যা তাকে জীবনের বাঁকে বাঁকে নানা সময়

নানা স্থানে অস্থির-বিষণ্ন করে তোলে। আর এই সমস্যার সমাধান আছে দু'জনের স্বামী-স্ত্রী হয়ে থাকার মধ্যে। এখানে আছে দুজনার জন্য পরিপূর্ণতার রসদ। এ কথার সত্যতার জন্য যে কোনও নিঃসঙ্গ চিরকুমার জীবন যাপনকারী লোকের অবস্থাগুলো গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করাই যথেষ্ট।

সুতরাং যখন উভয়কে একত্রে থাকতে হবে এবং একে অপরের জীবনকে সুখী-পরিপূর্ণ করতে হবে, তখন অতি জরুরী ছিল, তাদের দু'জনার যোগ্যতা-দক্ষতা ও গুণাবলীতে এমন কিছু পার্থক্য নিবিষ্ট থাকা, যাতে একে অন্যের অভাব মোচন করতে পারে এবং পরস্পরের প্রয়োজনাদী পূর্ণ করতে পারে। সে প্রয়োজনের উদ্দেশ্য নিছক জৈবিক চাহিদা পূরণ কিংবা যৌন-ক্ষুধা নিবারণ নয় বরং একজনের জীবনের শূন্যতাকে অপরজনের যোগ্যতা ও গুণের দ্বারা পূর্ণ করে দেওয়া; পুরুষ যদি ঘরের বাইরের প্রয়োজনাদী পূর্ণ করে, তবে নারী ঘরের ভেতরের চাহিদাগুলো পূর্ণ করে। পুরুষ যদি জীবনের ব্যাপক বিস্তৃত ও বিভিন্ন বিষয়-আসয় দেখে ও সামলায়, তবে একজন নারী ঘরের সুবিধা-অসুবিধাগুলো দেখে, সমস্যাগুলির সমাধান করে। এখানে সেসব শিশুর দেখাশোনা-পরিচর্যাও রয়েছে, যারা স্বয়ং নিজের প্রয়োজন পূর্ণ করতে পারে না। আর এই দেখাশোনা কোনও সাধারণ ব্যাপার নয়। এ পরিচর্যা কৃত্রিম পরিচর্যা নয়। এখানে স্বভাবগত স্নেহ-প্রীতি ও আদর-সোহাগের সাথে লালন-পালন করা; সতর্ক দৃষ্টি রাখা ও আবশ্যক। এ দেখাশোনা ও পরিচর্যা মূলত মাতৃগর্ভ থেকেই শুরু হয়ে যায়। যদ্দরুন একজন নারী ও মাকে নানা ধরনের কষ্ট-যাতনা ভোগ করতে হয়। আর তার জন্মের পর শুরু হয় সার্বক্ষণিক দেখাশুনা, যার ধারাবাহিকতা কয়েক বছর বরং বছরের পর বছর ধরে চলতে থাকে।

আবার শারীরিক শক্তির ক্ষেত্রেও নারী-পুরুষের মধ্যে পার্থক্য রাখা হয়েছে। আর এই পার্থক্য উভয়ের পৃথক পৃথক প্রয়োজন এবং দায়িত্ব-কর্তব্যের ভিত্তিতে রাখা হয়েছে। সুতরাং সন্তানের যে প্রয়োজন মায়ের দ্বারা পূর্ণ হয়, তা বাবার দ্বারা হয় না। আর যে প্রয়োজন বাবার দ্বারা পূরণ হয়, তা মায়ের দ্বারা হয় না। বাবা তার সন্তানের চিন্তা করেন ব্যাপকভিত্তিক আর মা তাদের প্রয়োজন ও চাহিদাগুলো পূরণ করেন ঘরোয়া পরিবেশের মধ্যে রেখে। দু'জন মানুষের সন্তান বানাতে দু'জন ব্যক্তি হিসেবে তাদের একজনকে সিনিয়র বা বড় আর অপরজনকে জুনিয়র বা ছোট হতে হয়। কেননা প্রত্যেক যৌথ ব্যবস্থায়– তা দু'জনের সমন্বয়ে হোক চাই বেশি লোকের, একজনকে অবশ্যই বড় হতে হয়। আর সে অনুপাতেই যোগ্যতা-

দক্ষতা ও গুণাবলিরও পার্থক্য রাখা হয়েছে। কাজেই বীরত্ব, সাহসিকতা ও শক্তির কাজ পুরুষের উপর ন্যাস্ত থাকে। আর পরিবারের সদস্যদের সাথে স্নেহ-প্রীতি ও সহমর্মিতার দায়িত্ব অর্পিত হয় নারীর ওপর। সে হিসেবে শিশুর জন্ম এবং জন্মের পর তার চরম অসহায়ত্ব আর কম বয়স বা শিশুকালে তার প্রয়োজনগুলো পূরণ করা মায়েরই কাজ।

নারী ও পুরুষ একে অন্যের পরিপূরক ও প্রয়োজন হওয়ার কারণে আবশ্যিকভাবে দু'জনের পারস্পরিক বন্ধন ও সম্পর্ক এমন ঘনিষ্ঠ আর নিবিড় হয় যে, তারা একে অন্যের সাথে মিলে একাত্ম হয়ে মানুষের পারিবারিক ও বন্ধুসূলভ জীবনকে সুদৃঢ় করতে পারে। আর এই সম্পর্ক মানববংশ বিস্তারে বিরাট একটি কারণ।

ইসলাম উভয়ের জন্য যে জীবন-বিধান নির্ধারণ করেছে, তা তাদের জীবনব্যবস্থাকে পরিপূর্ণ ও উন্নত করে। কিন্তু কেউ যদি ইসলামের এই প্রজ্ঞাপূর্ণ দিক-নির্দেশনাকে উপেক্ষা করে উভয়পক্ষকে এমন মুক্ত-স্বাধীন করে দেয়, যাতে প্রত্যেকেই কেবল তার ব্যক্তিগত সীমানায় আবদ্ধ থাকে, তবে তার মানবীয় বৈবাহিক প্রয়োজন পূর্ণ হতে পারে না আর না তার তৃপ্তি-সুখের রসদ যোগাড় হতে পারে। কাজেই পাশ্চাত্য সমাজে এ ধরনের চরম দূর্ভোগ আর মারাত্মক অস্থিরতা কি সাধারণ ব্যাপার, যার ফলে আত্মহত্যার ঘটনা এবং নিজের জন্মগত স্বাভাবিক প্রয়োজনাদি পূর্ণ করার জন্য অভদ্রচিত ও অসভ্য ধরনের ঘটনা অহরহ প্রকাশ পাচ্ছে! এসব হচ্ছে, পুরুষ ও নারীকে সম্পূর্ণ সমান আখ্যা দেওয়া এবং প্রত্যেকের জন্য উদাম-অবাধ স্বাধীনতা-স্বাধিকার দেওয়ার কারণে। অথচ খোদ উভয়ের সৃষ্টিগত অবস্থাই তাদের দু'জনার মধ্যকার পার্থক্যকে সুস্পষ্ট করে দেয়। পুরুষ তার দেহ-অবয়বে এবং তার দৈহিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আকৃতিতে নারী থেকে অপেক্ষাকৃত বড়। তার ত্যাগ-তিতিক্ষার যোগ্যতা, কর্মক্ষমতা ও কর্মপরিধি নারীর ত্যাগ-তিতিক্ষা ও কর্মক্ষমতা থেকে বেশি।

কিন্তু ইসলাম এ পার্থক্যকে নারীর কর্মক্ষমতা ও কর্মপরিধির পরিপন্থী বানায় নি বরং এর জন্য প্রয়োজনে কর্মসংস্থান বাড়ানো এবং সম্প্রসারণেরও অনুমতি দিয়ে রেখেছে। কাজেই নারীদেরকে মুসলমানদের কর্মকীর্তিতে বিরাট ভূমিকা রাখতে দেখা গেছে। তারা এতে কৃতিত্বেরও স্বাক্ষর রেখেছেন। সমাজ-সংস্কার আর শিক্ষাদীক্ষার কাজই হোক কিংবা জ্ঞান-গবেষণার জরুরী কাজই হোক, সব কিছুতেই মুসলিম নারীদের সুকীর্তিগুলো ইতিহাসের পাতায় পাতায় যেন শিলালিপি হয়ে আছে। আর যে যে

কর্মক্ষেত্র তাদের জন্য একান্ত নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে, তাতে তো আরও উজ্জল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তদুপরি পুরুষের জীবনের পূর্ণতা দানের যে দায়িত্ব রয়েছে, তাও পূর্ণ করেছেন নোহাৎ সুচারুরূপে।

নারী সম্পর্কিত বিষয় পাশ্চত্য সমাজে ইসলামের প্রতি অবজ্ঞা ও আক্রমণের হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। এটা পাশ্চাত্য চিন্তাবিদ ও গবেষকদের জ্ঞানশূন্যতার ফল। কেননা ইসলাম ও মুসলিম সমাজে নারীদের যে সুখ শান্তি ও গুরুত্ব রয়েছে এবং তাকে যে স্বাধীন, ব্যক্তিগত অধিকার ও একক ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, তারা মোটেও তার ধারণা লাভ করতে পারে নি। অন্যথায় তাদের এই বিদ্রুপ-অবজ্ঞার কোনও অবকাশ ছিল না। হযরত মাওলানা আলী মিয়া সাহেব (রহ.) তার বিভিন্ন ভাষণ-বক্তৃতা ও প্রবন্ধ-নিবন্ধে ইসলামিক সমাজে নারীর মর্যাদা, তার ব্যতিক্রমধর্মী চেষ্টা-সংগ্রাম ও শিক্ষামূলক কর্ম-কীর্তি সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করেছেন। সেগুলোকে আমার স্নেহাস্পদ মৌলভী মুহাম্মদ আযীযুল্লাহ জনাব মুহতারাম মৌলভী সাইয়িদ মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ হাসানী শিক্ষক, নদওয়াতুল উলামা এর তত্ত্বাবধানে ও দিক-নির্দেশনায় যথারীতি একত্রিত করেছেন। তার এ কাজের ফলে ইসলামে নারীর কর্ম-কীর্তি ও মর্যাদা পরিষ্কারভাবে ফুটে ওঠেছে। এভাবে এটা একটি বড় চমৎকার, চিত্তাকর্ষক ও জ্ঞানবৃদ্ধিকারী প্রবন্ধ সমগ্র হয়ে যায়। এতে পাঠকদের জ্ঞানের পরিধিও বৃদ্ধি পাবে আর ভুল ধারণার শিকার এবং "ইসলাম ও নারী" সম্পর্কে অজ্ঞতার আঁধারে নিমজ্জিত লোকদের ভুল ধারণা-ভুল বুঝাবুঝিরও অবসান ঘটবে। আল্লাহর দরবারে মুনাজাত করি– তিনি একে যারপরনাই উপকারী করুন। আমীন।

হযরত মাও. সাইয়িদ মুহাম্মদ রাবে' হাসানী নদভী
নায়েবে নাযেম, নদওয়াতুল উলামা, লাখনৌ
৬ মহররম ১৪২০ হি.

শুরুর কথা

আমার শিরোমণি ও মুরব্বী হযরত মাওলানা সাইয়িদ আবুল হাসান আলী হাসানী নদভী রহ. উম্মতের সেসব আধ্যাত্মিক সংস্কারকের একজন, যাদের অনুগ্রহ-দানের ছোঁয়া পেয়েছে উম্মতের সর্বশ্রেণীর মানুষ। আল্লাহ তা'আলা যে কাজ ইমাম ইবনে তাইমিয়া ও ইবনুল কাইয়িম, ইমাম গায্যালী ও শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলবী রহ. দ্বারা নিয়েছেন এবং আম খাছ নির্বিশেষে উভয়কে তাদের মাধ্যমে হেদায়াতের পুণ্যপথে নিয়োজিত করেছেন, অনুরূপভাবে আমরাও এ যুগে পরিষ্কার অনুভব করছি, হযরত মাওলানা রহ. একদিকে কচিকাচা শিশুদের জন্য আরবী ভাষার পাঠ্য তৈরী করেছেন, উঠতি বয়সের ছেলেদের জন্য লিখেছেন মুখতারাত (নির্বাচিত গল্প), তরুণদের জন্য "পা জা সেরাগে জিন্দেগী" (এই তো জীবনের ঠিকানা) শিরোনামে সম্বোধন করেছেন; জ্ঞানী-গুণী, শিক্ষক-গবেষক, উলামা-চিন্তাবিদ, দার্শনিক ও বিজ্ঞমহলের জন্য রচনা করেছেন "বিশ্ব মানবতার উপর মুসলমানদের উত্থান-পতনের প্রভাব"; ঈমানদারদেরকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যখন ঈমানের সুমিষ্ট বাতাস প্রবাহিত হয়, তখন জীবনের মোড় ঘুরে যায়। তরীকতের মাশাইখদের সেবায় "তারীখে দাওয়াত ও আযীমত" পেশ করে যেভাবে তিনি তাদের দু'আ কুড়িয়েছেন, তেমনি পূর্বসূরীদের উচ্চ সাহস, উঁচু মানসিকতা, বুদ্ধিমত্তা, সুকীর্তির আগ্রহ, দৃঢ়চিত্ততা, ধৈর্য-সহনশীলতা এবং চরম সংকট ও দুরবস্থায় দীনের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত থাকার দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন।

হযরত মাও. অক্সফোর্ড, ক্যামব্রিজ হার্ডওয়ার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়েও সত্যের আহ্বান জানিয়েছেন। আল-আযহার, জামে'আ কাহেরা, জামে'আ ইসলামিয়া মদীনা মুনাওয়ারা, রাবেতা আলমে ইসলামী মক্কা শরীফ, রাবেতা লিল জামে'আ ইসলামিয়া কাহেরা এর সদস্যবৃন্দ এবং আরবদের আত্মসম্ভ্রমবোধ জাগ্রত করেছেন। দীনের মূল্যবোধ ও পূর্বসূরীদের জীবনাদর্শ স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। মোটকথা, প্রবীন বুযুর্গ ও পূর্বসূরীদের জ্ঞান-গবেষণা ও মানবতায় ইসলামিক জীবনধারায় যে বসন্ত এসেছে বারবার, যার ফলে বাগানের প্রতিটি তরুলতা, প্রতিটি পুষ্প-গুল্ম ও

পত্রপল্লব হয়েছে সজীব প্রাণবন্ত আর কোনও প্রান্তই থাকে নি তৃষ্ণাকাতর –হুবহু সেসব বিষয়ই পাওয়া যায় হযরতের বিভিন্ন তত্ত্ববিভত্তিক ভাষণ-বক্তৃতা আর তার অমূল্য প্রবন্ধ-নিবন্ধে।

হযরতের কৃতজ্ঞ শুভাকাঙ্খীগণ এবং তার শিক্ষামূলক ও ধর্মীয় দান-অবদান সম্পর্কে ওয়াকিবহাল লোকদের ধারণা ছিল, হযরত মাওলানা নারীদের এছলাহ-সংশোধন এবং তাদের মধ্যে ঈমানী চেতনা ও মূল্যবোধ জাগ্রত করার জন্য পৃথক কোন কিতাব রচনা করেন নি। অথচ শিশু-কিশোর, তরুণ-যুবক ও বৃদ্ধদের জন্য এবং আলেম-গায়রে আলেম, শিক্ষিত স্বল্পজ্ঞানী নির্বিশেষে সকলের জন্য তার রচিত বই-পুস্তকে আল্লাহ প্রদত্ত অনুগ্রহ-জ্ঞানে হেদায়েতের আলো রয়েছে। তথাপি এ শ্রেণীকে তিনি কিভাবে ভুলতে পারেন, যার সম্পর্কে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন–

فا ستجاب لهم ربهم أنى لا اضيع عمل عا مل منكم من ذكر او انثى بعضكم من بعض-

"তারপর তাদের পালনকর্তা তাদের দু'আ (এই বলে) কবুল করে নিলেন যে, আমি তোমাদের কোনো পরিশ্রমকারীর পরিশ্রমই পণ্ড করি না, সে পুরুষ হোক বা নারী। তোমরা পরস্পর এক। –সূরা আলে ইমরান, আয়াত- ১৯৫

বস্তুত হযরত মাওলানা বিভিন্ন উপলক্ষ্যে নারী জাতির এছলাহ ও সংশোধনের জন্য একাধিক ভাষণ-বক্তৃতা ও বই-পুস্তকে এমন এমন বিষয় আলোচনা করেছেন, যা বিশেষভাবে এ বিষয়ে পর্দা উন্মোচনকারী প্রমাণ হতে পারে। হযরতের বই-পুস্তকে যেভাবে, মূলনীতি ও অবতারণা, তত্ত্ব-উপাত্ত ও ঘটনাবলী থাকে, তদ্রুপ তিনি এমন এমন সীরাত ও জীনবকর্ম উদ্ধৃত করেন, যেসব জীবনকর্ম ব্যাখ্যা হয়ে থাকে খোদায়ী হুকুম-আহকামের, উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে থাকে ইসলামিক কর্মকীর্তির, উন্নত জীবনাদর্শের। সৌভাগ্যক্রমে হযরতের আম্মাজান ছিলেন সেসব মনোনীত ও প্রিয় নারীদের একজন, যাদের শিক্ষা দীক্ষা এবং যাদের ধর্মীয় মূল্যবোধের দৃষ্টান্ত হযরতের জীবনে পাওয়া যেত। ঈমানের সেই শক্তি, আকীদা-বিশ্বাসের দৃঢ়তা এবং দ্বীনের বড়ত্ব মাহাত্ম্যের চিত্র ঐ পুস্তকে বিদ্যমান পাওয়া যায়, যা তিনি (হযরতের আম্মাজান রহ.) লিখেছিলেন নিজের পরম স্নেহের পুত্র আলী মিয়ার নামে। তিনি ছিলেন সেই মা আর

উনি সেই পুত্র যাদের জীবন ছিল আল্লামা ইকবাল রহ. এর নিম্নোক্ত কবিতার বাস্তব চিত্র। তিনি বলেন–

اور اب چرچے ہیں جسکی شوخی گفتار کے

بے بہا موتی ہیں چشم گوہر بار ہیں

আজকে যার কথার চমক চর্চা করি,
অমূল্য মুক্তা কথক প্রতিটি দৃষ্টি তারি।

হযরত তার সহোদরা বোনের জীবনকর্ম, তার মুনাজাতসমূহ এবং ব্যাথাভরা মর্মস্পর্শী ছন্দময়-কাব্যিক দু'আগুলোও বর্ণনা করছেন। যেগুলো পড়ে হৃদয়বান কেউ তার নয়ন-অশ্রু সংবরণ করতে পারবে না, যা মানুষের অন্তর-আত্মায় বিনয়-কোমলতা ও হৃদয়োত্তাপ সৃষ্টি করবে। মোটকথা, হযরত মাওলানা ইসলামের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের একাধিক নারীর প্রসঙ্গ এবং তাদের জীবনালেখ্য বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ করেছেন। খুশির ব্যাপার হল, নারী সম্পর্কে সেসব ওয়ায-নসীহত, ভাষণ-বক্তৃতা ও প্রবন্ধ-নিবন্ধকে স্নেহাস্পদ মৌলভী আযীযুল্লাহ নদভী একত্রে করে দিয়েছেন। কাজেই বিভিন্ন বই-পুস্তকে এবং বিভিন্ন স্থান ও উপলক্ষে হযরতের কলম থেকে নিঃসৃত এসব প্রবন্ধ-নিবন্ধ আজ এক নতুন গ্রন্থের রূপ নিয়েছে।

আমার অনেক সহকর্মী এবং শিক্ষা ও গবেষণামূলক কর্মে নিয়োজিত লোকের এমন কাজও দেখেছি, যেখানে তারা একই বিষয়ে বিভিন্ন বই-পুস্তক থেকে আলোচনা সংগ্রহ করে একত্রিত করে একটি নতুন পুস্তকের রূপদান করেন আর তা কোনো পিএইচ ডি বা ডক্টরেট অথবা তার সমমানের ডিগ্রি লাভের জন্য পেশ করা হয়। আমার কথার উদ্দেশ্য বিশেষ কোনও ব্যক্তি নয়, শুধু এতটুকু দেখানো যে, আজ-কাল এই রচনা পদ্ধতি বিরাট সমাদৃত এবং অতিসাধারণ ব্যাপার।

স্নেহাস্পদ সংকলকের প্রয়াস ধন্যবাদযোগ্য এবং তার পক্ষে সৌভাগ্য শুভ লক্ষণও বটে।

মাও. আব্দুল্লাহ আব্বাস সাহেব নদভী
শিক্ষাসচিব, দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামা লাখনৌ
মহররম ১৪২০ হি.

সূচীপত্র

কে তুমি নারী, কী তোমার মর্যাদা

ইসলামপূর্ব নারী জাতির অবস্থা/২৫
বৌদ্ধ ধর্মমত/২৮
হিন্দুধর্ম/২৯
ভারতীয় সমাজে নারী/৩০
চীন/৩০
ইংল্যাণ্ড/৩০
বর্বর যুগে নারী/৩১
ইসলামে নারীর মর্যাদা/৩১
পাশ্চাত্যের জ্ঞানী ও সুবিচারকদের দৃষ্টিতে নারী/৩৫
নব জন্ম ও মহাবিপ্লব/৩৬
আল্লামা ইকবালের চোখে সম্মানিতা নারী/৩৮
ইকবালের ভাষায় নারী/৪১

মানব সমাজ বরং মানব জীবন নারী-পুরুষের সমন্বয়ে

আল্লাহর রহমত ও ক্ষমায় পূর্ণ সমতা/৫৬
আমলের ফলাফল দুনিয়ায়ও পাবে; পরকালেও/৫৮
নারীরাও ওয়ালী হয়/৫৮
নারী ইসলামের সমাজ ও পরিবার ব্যবস্থা এবং জাতীয় সকীয়তার রক্ষক/৫৯

কুরআনে কারীমে নারীর সম্মান

কুরআনে নারীদের নামে পৃথক একটি সূরা/৬২
কুরআনে কারীম নারীদের উত্তম জীবনের জামিন/৬২
আল্লাহ তা'আলা তার বান্দা-বান্দীদের আলোচনা করেন ভিন্ন ভিন্ন/৬৬
নারীরা মানবীয় গুণে পুরুষের পেছনে নয়/৬৮

ইসলামী সভ্যতা ও নারী

ভূতপূর্ণ চ্যালেঞ্জ/৭১
রোমান ও ইরানীদের প্রভাব/৭১
রোমান সভ্যতার সম্মুখে খ্রিষ্টবাদের আত্মসমর্পণ/৭২
তাতারী ও ইসলামী সভ্যতা/৭৩
ইসলামী সভ্যতার বিজয়/৭৪
প্রথম যুগের মুসলমানদের ঈমান ও ইয়াকীন/৭৭
পাশ্চাত্য সভ্যতার সঙ্গে আমাদের উঠাবসা/৮০
প্রতিরোধের স্থলে আনুগত্য/৮০
ইসলামী সভ্যতা সংরক্ষণে নারীদের ভূমিকা/৮১
নারীদের কাছে আজও সেই প্রত্যাশা/৮২

মুসলিম নারীদের শিক্ষা ও ধর্মীয় কীর্তি

ইলমের ভূবন নারীদের কৃতিত্বে দীপ্তিমান/৮৪
হাদীস শাস্ত্রে নারীদের স্থান/৮৫
সাহিত্যে নারীদের অনুক্রম/৮৬
শিক্ষা জগতে নারীদের কীর্তি/৮৬
ভারতে নারীদের ধর্মীয় কীর্তি/৮৭
মুসলমান থাকার অর্ধেক দায়িত্ব নারীদের/৮৯
আমাদের শিক্ষিতা নারীদের দায়িত্ব/৯০
দেশ তাহলে বিপদের সম্মুখীন/৯১

জিহাদে নারীদের খেদমত

হযরত আসমা বিনতে আবী বক্‌র রাযি. এর বীরত্ব/৯৩
হযরত খানাসা রাযি. এর ধৈর্য-অবিচলতা/৯৪
হযরত ছফিয়া রাযি. এর সাহসী পদক্ষেপ/৯৪
মা তার কলিজার টুকরোকে যখন জিহাদ ও শাহাদাতের প্রেরণা দেন/৯৫
মুসলিম নারীদের সেবা ও আত্মত্যাগ/৯৬

দাম্পত্য জীবন
পুরুষ ও নারীর পারস্পরিক সম্পর্ক

বিবাহ একটি ইবাদত, একটি দায়িত্ব/৯৮
বিয়ের বৃত্তান্ত/১০০
বিয়ে-শাদীতে পূর্বসূরীদের কর্মপদ্ধতি/১০০
বিয়ের সময় সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা ও দাম্পত্য অধিকার বর্ণনা/১০১
বক্তৃতার একটি উপমা/১০১
হযরত ফাতেমা রাযি. এর সঙ্গে হযরত আলী রাযি. এর বিয়ে/১০৫
হযরত আলী ও হযরত ফাতেমা রাযি. এর অর্থনৈতিক অবস্থা/১০৬

পুণ্যাত্মা রমণীগণ এবং বহুবিবাহের কারণ

পুণ্যাত্মা রমণীগণ/১০৯
বহুবিবাহ সম্পর্কে কিছু কথা/১১১

মুসলিম নারীদের সমীপে

ইসলামী সমাজ/১১৬
সেই নিবেদক; সেই নিবেদনপ্রাপ্ত/১১৭
আল্লাহর নাম পরকে করে আপন/১১৮
দাম্পত্য জীবন একটি এবাদত/১১৯
পাশ্চাত্য সভ্যতার পতন শুরু/১২০
সুখান্বেষণ/১২১
প্রয়োজন ও সম্মান/১২১

জীবনের স্বার্থকতা ও প্রকৃত আনন্দ

পবিত্র জীবন কী?/১২৩
জীবনের অস্থিরতাবয়স ও জ্ঞান-বুদ্ধির তফাৎ/১২৪
মন আন্দোলিতকারী ঘোষণা/১২৪
মা কী আর কি হয়ে গেল?/১২৫
মা ও স্ত্রীর পার্থক্য/১২৫

সম্পদ এক আযাব/১২৬
প্রকৃত সুখ-শান্তি/১২৬
একটি উপমা/১২৭
এটা জান্নাত নয় তো কী?/১২৭
আধুনিকা নারী/১২৭
আরাম ও বিলাস সামগ্রী/১২৮
সত্যান্বেষণ/১২৯

নারী স্বাধীনতা
শরঈ এবং গায়রে শরঈ পর্দা

মিশরে নারী স্বাধীনতা আন্দোলন ও তার প্রভাব/১৩০
আমেরিকায় মুসলমান নারীদের পোশাক/১৩২
পাশ্চাত্য সভ্যতা অনুকরণের ফলাফল/১৩৩
ঘরোয়া পারিবারিক জীবনবিমুখতা ও এর মর্মান্তিক পরিণতি/১৩৪
ইসলামী ও অনৈসলামিক পর্দাপ্রথা/১৩৫
কন্যার বাগদানের পর শ্বশুর বাড়ির নারীদের সাথে পর্দা/১৩৬
পর্দাহীনতার প্রতিরোধ/১৩৬
নারীদের প্রতি/১৩৮
একটি সূক্ষ্ম বিষয়/১৩৯
নবুওয়াতে মুহাম্মাদীর দান/১৩৯

অভ্যাস-চরিত্র, প্রথা-প্রচলন ও তার সংশোধন

বর্তমান যুগের বিবাহের জটিল-কুটিল প্রথা/১৪৫
রঙ্গ নাচ ও গান বাদ্যের প্রচলন/১৪৫
ভারতীয় মুসলমানদের বিয়ে-শাদীর স্থানীয় কিছু রীতি-নীতি/১৪৬
বিয়ে পড়ানোর রীতি-নীতি/১৪৭
একটি মূর্খতার সংশোধন/১৪৮
কনে বিদায়/১৪৯
বিধবার দ্বিতীয় বিয়ে এবং ভারতীয় মুসলমানদের ভিন্ন আচরণ/১৫০
বিধবা বিবাহ/১৫১

গায়রুল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা এবং প্রয়োজনাদি পূরণের প্রত্যাশা/১৫৫
বসন্তরোগ/১৫৫
কাফিরদের উৎসব দিনের সম্মান প্রদর্শন এবং তাদের অভ্যাস রীতির অনুকরণ/১৫৬
পীর ও বিবিদের উদ্দেশ্যে রোযা রাখা/১৫৬

নারীর জীবন-যাপন

আমাদের ইসলাম আল্লাহর অনুগ্রহ-দান/১৫৯
পাশ্চাত্য সভ্যতার দর্শন "খাও-দাও ফুর্তি কর"/১৬০
দুনিয়াতে থাক তুমি বিভূঁই-পথিকের মত/১৬১
মুসলমান যেন তার আসল নিবাস না ভুলে/১৬২
কবরের ভাবনাই আসল ভাবনা/১৬৩
হযরত ইবরাহীম আ. এর ঘটনা/১৬৪
হযরত ইবরাহীম আ. এর শিক্ষা স্মরণ রাখুন/১৬৪
বাদশাকে পেলে তো সবই পেলাম/১৬৬
রাণী, আগে মুরগী পালুন!/১৬৮
সকল কাজের উৎসশক্তি আল্লাহর সাথে সুসম্পর্ক/১৬৯
মায়ের দায়িত্ব ও অধিকার সংরক্ষণ/১৭১
মা ও প্রতিপালনকারী নারীর দায়িত্ব-কর্তব্য/১৭২
কন্যাদের লালন-পালনে প্রতিযোগিতা ও সমান অধিকার দান/১৭৫
মুসলিম সমাজে নারীদের সম্মান এবং শিশুর লালন-পালনে তাদের হাত/১৭৬
জ্ঞান অর্জন নারী-পুরুষ সকলের উপর ফরয/১৭৬
ঘরের পরিবেশ স্ত্রী-কন্যাদের হাতেগড়া/১৭৭
দু'টি উপদেশ/১৭৯
প্রথমতদ্বিতীয়তমুসলিম উম্মাহর মায়েদের প্রতি একটি পয়গাম/১৮০

ওয়ালীআল্লাহদের মা

সুলতানুল মাশাইখ হযরত খাজা নিযামুদ্দীন আউলিয়া রহ./১৮৬
হযরত সাইয়িদ আহমদ শহীদ রায়বেরলী রহ./১৮৭
হযরত মাওলানা ফযলুর রহমান গঞ্জেমুরাদাবাদী রহ./১৮৮

হযরত মাওলানা ইলিয়াছ সাহেব কান্ধেলবী রহ./১৮৮
আমার মুহতারামা আম্মাজান (খাইরুন নিসা রহ.)/১৯০
শিক্ষা ও অধ্যায়ন/১৯১
কুরআন হিফয/১৯৩
আম্মাজানের রমাযান উদ্‌যাপন/১৯৪
নিঃস্বতা ও অসহায়ত্ব, দু'আ ও মুনাজাতের আকুলতা/১৯৪
বিবাহ/২০০
অশেষ কল্যাণের বারিধারা/২০৪
ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতার জীবন, আমলের নিয়মানুবর্তিতা/২০৬
জীবনসঙ্গীর বিচ্ছেদ বিরহ এবং আত্মনিবেদনের জীবন/২০৮
জীবনের ব্রত/২১০
রচনাবলী/২১১
আমার সাথে আম্মাজানের আচরণ এবং শিক্ষাদীক্ষার ব্যবস্থা/২১১
প্রথমত.দ্বিতীয়তদীক্ষামূলক চিঠিপত্র/২১৪
আমার দীর্ঘ সফর, আম্মাজানের ত্যাগ-তিতিক্ষা/২২৫
দাওয়াত ও তাবলীগের আগ্রহ/২২৭
বাইয়াত ও শ্রদ্ধাবোধ/২২৮
রাত্রিজাগরণ, দু'আ-দরূদ ইত্যাদির ব্যাপকতা/২২৮
বার্ধক্য ও দুর্বলতায় তার সেবা-শুশ্রূষা/২২৯
ইসলামের বিজয় আর দ্বীন প্রসারের তীব্র বাসনা/২৩০
সুন্নাত পরিপালন ও দুনিয়া-বিমুখতা/২৩১
প্রিয় আমল/২৩১
আমার ভূপাল সফর, আম্মাজানের প্রতিক্রিয়া/২৩২
মৃত্যু রোগ এবং একটি পুণ্যময় স্বপ্ন/২৩৩
অন্তিম যাত্রা/২৩৩
আমার বোন মরহুমা আমাতুল্লাহ তাসনীম সাহেবা/২৩৪

"যে লোক কোনও সৎকর্ম করে এবং বিশ্বাসী হয়, পুরুষ হোক বা নারী, তবে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের প্রাপ্য তিল পরিমাণও নষ্ট হবে না।"

(সূরা নিসা- ১২৪)

"হে মানব! আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিত হও। নিশ্চয় আল্লাহর কাছে সেই সর্বাদিক সম্ভ্রান্ত, যে সর্বাধিক পরহেযগার। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সবকিছুর খবর রাখেন।

(সূরা হুজুরাত-১৩)

কে তুমি নারী? কী তোমার মর্যাদা?

ইসলামপূর্ব নারী জাতির অবস্থা

প্রথমে আমি এখানে ভূমিকাস্বরূপ কিছু কথা বলতে চাই। নারীজাতির কল্যাণে ইসলামের গৃহীত পদক্ষেপগুলো বুঝার জন্য তা জরুরী। এখানে বিদগ্ধ আরব পণ্ডিৎ অধ্যাপক আব্বাস মাহমূদ আল-আক্কাদ বিরচিত المرأة فى القران (কুরআনে নারী) গ্রন্থ থেকে কয়েকটি উদ্বৃতি উপস্থাপন করব। এ বিষয়ে তা গভীর গবেষণামূলক পর্যবেক্ষণ সমতূল্য। বিচক্ষণ এ লেখক ইসলামপূর্ব যুগে ধর্ম ও সমাজগুলোতে নারীর অবস্থান সম্পর্কে আলোচনা করত লিখেন–

"ভারতে মনুশাস্ত্র" পিতা, স্বামী কিংবা উভয়েই মারা গেলে পুত্র ছাড়া নারীর কোনও স্বতন্ত্র অধিকার আছে বলে স্বীকার করত না। তাদের সকলের মৃত্যুর পর তার স্বামীর কোনও নিকটাত্মীয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়া জরুরী ছিল। সে কোনও অবস্থায়ই নিজের ব্যাপারে স্বেচ্ছাধীন হতে পারত না। জীবন-জীবিকার ব্যাপারে তার অধিকার হরণ অপেক্ষা বেশি কঠোরতা ছিল স্বামী থেকে পৃথক জীবন যাপনের অস্বীকৃতির সময়। সে-মতে স্বামীর মৃত্যুর দিন স্ত্রীর মরে যাওয়া এবং তার চিতায় দগ্ধ হওয়া ছিল অনিবার্য। এই সনাতন প্রথা বাহ্মণী সভ্যতার প্রাচীন যুগ থেকে খ্রিষ্ট সতের শতক পর্যন্ত চালু থাকে। এর ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলোর অপছন্দ বিরোধিতা সত্ত্বেও বিলুপ্ত হয়ে যায়।

হামুরাবী দর্শন (যার কারণে বাবেল শহর প্রসিদ্ধ হয়েছে) নারীকে মনে করত গৃহপালিত পশু তার চোখে নারীর মর্যাদা কি তা অনুমিত হয় এ থেকেই যে, তার দৃষ্টিতে কেউ যদি কারও কন্যাকে হত্যা করত, তবে ঘাতকের নিজের কন্যাকে উক্ত নিহত কন্যার বদলে সমর্পন করতে হত। নিহত কন্যার ওলী-ওয়ারেশ যেন তাকে হত্যা করে অথবা দাসী বানিয়ে রাখে কিংবা ক্ষমা করে দেয়। তবে অধিকাংশ শাস্ত্রীয় বিধান পালনার্থে তাকে হত্যাই করা হত।

প্রাচীন গ্রিক সমাজে নারী সর্বপ্রকার অধিকার ও স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত ছিল। তাকে এমন এমন বড় ঘরে থাকতে হত, যা রাস্তা থেকে দূরে গণাকয়েক জানালা বিশিষ্ট হত আর প্রবেশ পথে নিয়োজিত থাকত প্রহরী। স্ত্রী ও গৃহিনী নারীদের প্রতি অমনোযোগিতার কারণে প্রাচীন গ্রিক শহরগুলোতে এমন সব আসর ব্যাপাক হয়ে গিয়েছিল, যেখানে গায়িকা নর্তকী ও রূপসী নারীদের দ্বারা মনোরঞ্জন করা হত। সভ্য-সুন্দর উৎসব অনুষ্ঠানে নারীদের পুরষের সঙ্গে যাওয়ার অনুমতি খুব কমই ছিল। এভাবে দার্শনিক মহলে উৎসব-অনুষ্ঠানগুলো নারীদের উপস্থিতি শূন্য দেখা যেত আর পেশাদার নারী কিংবা সাধারণ বাঁদীদের মতো খ্যাতি ও সম্মান কোনও ভদ্র-সম্ভ্রন্ত নারী পায় নি।

এ্যারেষ্টটল স্পার্টাবাসীর (SPARTA) প্রতি অভিযোগ করতেন, তারা নিজ বংশের নারীদের সঙ্গে নম্র আচরণ করে। তারা এদেরকে তালাকের ক্ষমতা এবং স্বাধীনতার অধিকার দিয়ে রেখেছে। যদ্দরুন এরা উঁচু মর্যাদার হয়ে গেছে। তিনি স্পার্টার পতন ও ধ্বংস-লাঞ্ছনাকে নারীদের অযথা স্বাধীনতারই পরিণতি মনে করেন।

নারীদের সাথে প্রাচীন রোমানদের আচরণ ছিল সনাতন হিন্দুদেরই মতো। যেখানে তারা পিতা, স্বামী ও পুত্রদের অধিনস্থ থাকত। রোমান সভ্যতার উন্নতির যুগে তাদের ধারণা ছিল, "নারীর শৃঙ্খল না কাটা যায় আর না কাঁধ থেকে জোঁয়াল নামানো যায়।" সুতরাং ক্যাটুর উক্তি ছিল "Nunguam Exvitur Servitus Mulie Brio"

রোমান নারী সেসব বন্ধন থেকে মুক্ত হয়েছে সে সময়, যখন বিদ্রোহ ও অবাধ্যতা করে রোমান দাসরা মুক্ত হয়েছে আর নারীকে দাসী বানিয়ে রাখা অসম্ভব হয়ে পড়েছে।

অধ্যাপক আককাদ প্রাচীন মিসরীয় সভ্যতায় নারীদের কিছু অধিকার ও ন্যায্যতা উল্লেখ করার পর লিখেন–

"ইসলাম আসার পূর্বে মিসরীয় সভ্যতা এবং তার আইন-কানুন বিলীন হয়ে গিয়েছিল আর মধ্যপ্রাচ্যে সেকালে রোমান সভ্যতার পতন এবং তার বিলাসিতা ও ভোগবাদিতার বিষক্রিয়ায় ইহজীবনের প্রতি চরম ঘৃণার সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। এমনকি জীবন সংসার ও সন্তান-সন্ততির প্রতি অনীহা-বিতৃষ্ণা সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। বৈরাগ্য প্রবনতা দেহ ও নারীকে অপবিত্র ধরে নিয়েছিল। নারীকে আখ্যা দেওয়া হত পাপের প্রতীক। [নারীর প্রতি] নিরাসক্তদের জন্যে তার থেকে দূরে থাকাই শ্রেয় মনে করা হত।

এটা মধ্যযুগের সেই প্রবনতা ও মানসিকতারই প্রভাব ছিল যে পনের খ্রিষ্ট শতক পর্যন্ত কোনও কোনও ভাগব্যাপ্রকৃতির আলেম-পণ্ডিৎ নারীর স্বভাব সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করছিলেন এবং মাকৌন (MACON) সম্মেলনে তারা প্রশ্ন রাখছিলেন, সে কি নিষ্প্রাণ জড়দেহ নাকি প্রাণসম্পন্ন একটি দেহ। যার সঙ্গে মুক্তি কিংবা ধ্বংস সম্পৃক্ত হয়ে থাকে? অধিকাংশের ধারণা সে মুক্তিযোগ্য প্রাণশূন্য। এতে হযরত ঈসা (আ.) এর জননী কুমারী মাতা মরিয়ম (আ.) ছাড়া অপর কেউ ব্যতিক্রমভূক্ত নয়।

রোমান যুগের এই মানসিকতা পরবর্তিকালের মিসরীয় সভ্যতাকে প্রভাবিত করে। মিসরীয়দের উপর রোমানদের জুলুম-অত্যাচারের তীব্রতা তাদের বৈরাগ্য, দুনিয়া বিমুখতা ও সন্যাসবাদের কারণ হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং অনেক সাধকই সন্যাসবাদকে আল্লাহর নৈকট্য লাভের মাধ্যম আর শয়তানের প্রবঞ্চনা থেকে (যাতে নারী সবার উপরে) বাঁচার উপায় বা রক্ষাকবচ বলে জানত।

অনেক পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক অভিযোগ করেন, ইসলাম তার শরী'আতে পূর্বের শরী'আতগুলো বিশেষত তার মতবাদ থেকে বেশ কিছু মূলনীতি সংগ্রহ করেছে। এ দাবীর ভ্রান্ততা তাওরাত ও কুরআনিক শরীআতের মধ্যে নারীদের স্থান ও মর্যাদার পারস্পরিক তুলনার দ্বারাই উত্তমরূপে প্রমাণিত হয়ে যায়।

সুতরাং হযরত মূসা (আ.) এর প্রতি সম্পৃক্ত কিতাবাদির শিক্ষা অনুযায়ী কন্যা পিতার মেরাছ থেকে খারেজ হয়ে যায়, যদি তার পুত্র সন্তান বিদ্যমান থাকে।

এটা সেই দানের মতো, যা পিতা তার জীবদ্দশায় গ্রহণ করেন, যাতে মৃত্যুর পর শরঈ ওয়াজিব বিষয়ের মতো মেরাছ ওয়াজিব না হয়।

মিরাছ সম্পর্কে স্পষ্ট বিধান হল, যতক্ষণ পর্যন্ত পুত্র সন্তান বিদ্যমান থাকবে, কন্যা তা থেকে বঞ্চিত হবে আর যে কন্যা মেরাছ পাবে, অন্য কোনও গোত্রে তার বিয়ের অনুমতি থাকবে না। তার জন্যে অন্য কোনও গোত্রে মেরাছ স্থানান্তির করারও অনুমতি হবে না। এ বিধান তাওরাত গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ্য আছে।

এবার আমরা সেই পুণ্যভূমির প্রতি মনোনিবেশ করছি, যেখানে কুরআনে কারীমের দাওয়াত শুরু হয়েছিল অর্থাৎ আরব উপদ্বীপ। কিন্তু আপনাদের সেখানেও সাম্য-ন্যায়, ইনসাফ-একরাম আর বিশেষ

সম্মানজনক কোনো আচরণ করা হত বলেও আশা রাখা অনুচিত, বরং এই আরব উপদ্বীপের কোথাও কোথাও নারীদের সঙ্গে দুরাচার পৃথিবীর যে কোনও দেশ থেকে বেশি ছিল। আবার কোথাও কোথাও তার সঙ্গে সদাচারণ করা হত এবং স্বামীর ঘরে তার সম্মান ছিল। তবে এ কারণে যে, সে কোনও প্রভাবশালী নেতার কন্যা কিংবা কোনও প্রিয় ব্যক্তিত্বের মা। কিন্তু তার এ সম্মান নিছক তার নারীত্ব এবং নারী হিসেবে তার যথেষ্ট প্রাপ্য অধিকার রয়েছে বলেই করা হত –মোটেও সে আশা করা যায় না। কেননা তার পিতা, স্বামী, ভাই ও পুত্রগণ নিজের সম্পত্তি কিংবা মালিকানাধীন বস্তুসামগ্রীর মতো তার তত্ত্বাবধান ও নিরাপত্তা বিধান করত। কারণ, মানুষের জন্য তার আত্মীয়ের অসম্মান করা, মানির মানহানী করা বিরাট দোষণীয় ছিল। যেভাবে দোষণীয় ছিল তার নিরাপত্তা আশ্রিত কিংবা কোনও নিষিদ্ধ-সংরক্ষিত বস্তুর উপর হাত বাড়ানো। এতে তার ঘোড়া, জীবজন্তু, কূপ এবং চারণভূমিও অর্ন্তভূক্ত ছিল। সে নারী সহায়-সম্পত্তি ও গবাদি পশুর সঙ্গে মেরাছ হিসেবে বণ্টন হয়ে যেত। মানুষ লজ্জায় নিজের কন্যাকে শৈশবেই জীবন্ত কবরস্থ করে ফেলত। তার জন্য খরচ করাকে নিজের উপর বোঝা মনে করত। অথচ নিজের মালিকানাধীন বাদী কিংবা উপকারী জীবন্তুর জন্য খরচ করাকে বোঝা মনে করা হত না। আর যে তাকে একান্ত বাঁচিয়েই রাখত এবং শৈশবে জীবন ভিক্ষে দিত, তাদের দৃষ্টিতে এর মূল্য ছিল মেরাছ বা পরিত্যক্ত সম্পক্তির মতো, যা পিতা থেকে পুত্রদের নিকট হাতবদল হত। ঋণ কিংবা সুদ পরিশোধে তাকে বিক্রয় করা এবং বন্ধক রাখাও যেত। সে এই পরিণতি থেকে তখনই রক্ষা পেত, যখন সে কোনও অভিজাত বংশের নারী হত, যার নৈকট্য ও আত্মীয়তাকে সম্মানজনক মনে করা হত।

বৌদ্ধ ধর্মমত

বৌদ্ধ ধর্মে নারী সম্পর্কে চিন্তাধারার একটি দৃষ্টান্ত "ধর্ম ও চরিত্রের জ্ঞান-বিচিত্রা" প্রবন্ধকার জনৈক চিন্তাবিদ চুল্লাভগ্যা (CHULLAVAGGA) এর উক্তি দ্বারা পেশ করেছেন। ওলডেন-বার্গ (OLDENBERG) তার "BUDDHA" (বৌদ্ধ) বইয়ে (১৯০৬ খ্রিঃ প্রকাশিত; পৃষ্ঠা– ১৬৯) তা উদ্ধৃত করেছেন। তিনি বলেন, "পানির নিচে মৎস্যকুলের দুর্বোধ্য স্বভাবগুলোর মতো নারীর স্বভাবও দুর্বোধ্য; তার কাছে চোরের মতো বিভিন্ন বর্শা ও যুদ্ধাস্ত্র রয়েছে। আর সত্যের লেশ মাত্র নেই তার মধ্যে।"

হিন্দুধর্ম

উপরিউক্ত বিশ্বেকোষ রচয়িতা বা এনসাই ক্লোপেডিয়ার প্রবন্ধকার নারী জাতি সম্পর্কে হিন্দুদের চিন্তাধারা প্রসঙ্গে লিখেন, "ব্রাক্ষ্মণ মতাদর্শে বিয়ে-শাদীর গুরুত্ব অনেক। প্রত্যেক ব্যক্তিকেই বিয়ে করতে হবে। কিন্তু মনু শাস্ত্রের বিধান মতে স্বামী হল স্ত্রীর মাথার মুকুট। তার স্বামীর অসন্তোষজনক কোনও কাজ না-করা কর্তব্য। এমনকি স্বামী যদি পরনারীর সাথে সম্পর্ক রাখে কিংবা মারা যায়, তখনও সে কোনো ভিন্ন পুরুষের নাম নিজ মুখে উচ্চারণ করবে না। সে যদি দ্বিতীয় বিবাহ করে, তবে সে স্বর্গে যেতে পারবে না, যেখানে তার প্রথম স্বামী থাকবে। স্ত্রী অকৃতজ্ঞ হলে তাকে চরম শাস্তি দেওয়া উচিত। নারী কখনও স্বাধীন হতে পারে না। সে মেরাছ বা উত্তরাধিকসত্ব পেতে পারে না। স্বামী মারা গেলে তাকে নিজের সবচেয়ে বড় পুত্রের অধীনে বাকী জীবন কাটাতে হবে। স্বামী তার নিজ স্ত্রীকে লাঠী দ্বারাও প্রহার করতে পারে।

"ইউনিভার্সেল হিষ্ট্রেরী অফ দ্যি ওয়ার্ল্ড গ্রন্থে "RAY STRACHEY' ভারত সম্পর্কে লিখেন–

রাগ বেদে (যাতে মানুষের আদীপুরুষের বৃত্তান্ত রয়েছে) নারীদেরকে নীচু ও ঘৃণিত স্থান দেওয়া হয়েছে। পরবর্তীকালে মনে করা হত, সে আত্মিকভাবে অগ্রহণযোগ্য বরং প্রায় নিষ্প্রাণ আর মৃত্যুর পর পুরুষের পুণ ছাড়া তার স্থায়িত্ব হতে পারে না। তার সকল স্বপ্ন-স্বাধ ও আশা-আকাঙ্ক্ষা হত্যাকারী ধর্মের সাথে প্রথা-প্রচলনের বেড়িগুলো (যা ক্রমশ তৈরী হতে থাকে) নারীদের পক্ষে কোনও কীর্তিমান ব্যক্তিত্ব জন্ম দান অসম্ভব করে দিয়েছিল। নারীদেরকে আকৃতি দানকারী মনুশাস্ত্র তাদেরকে নিজের ঘর বিছানা, অলঙ্কারপ্রীতি, হীন আকাঙ্ক্ষা, ক্রোধ, বেঈমানী এবং ঘৃণ্য বিশেষণ দান করেছে। নারীরা এতই নিকৃষ্ট যেমন মিথ্যা। এটা ছিল চিরন্তন বাস্তবতা। নারীরা স্বভাবতঃ পুরুষদের কে পৃথিবীতে বিপথে নিক্ষেপ করে। এজন্য বুদ্ধিমান লোক নারীদের স্পর্শে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকেন না।

বাল্য বিবাহের রীতি, বিধবাদের প্রতি ঘৃণ্য আর পর্দা প্রথা এমন এক সমাজের উপযোগী, যেখানে নারীদের গুরুত্ব ও মর্যাদা একটি সন্তান প্রজননকারী জীব অপেক্ষো বেশি নয়। সম্ভবত নবজাতক কন্যাদের মৃত্যু এমন এক পৃথিবীতে তার জন্য রহমত ও মঙ্গলজনক, যেখানে অভিযুক্ত, পাপের উৎস, প্রতারক, স্বর্গের পথের কাটা প্রতিবন্ধক এবং নরকের দ্বার মনে করা হয়।

ভারতীয় সমাজে নারী

ব্রাহ্মা-যুগ ও সভ্যতায় নারীদের সেই সম্মান ছিল না, যা ছিল বেদীয় যুগে। মনুশাস্ত্রে (ডাঃ লী বান এর উক্তি মতে) নারীকে সব সময় দুর্বল ও অকৃতজ্ঞ মনে করা হয়েছে। সর্বদা তার আলোচনা হয়েছে তুচ্ছতার সাথে।

স্বামী মারা গেলে স্ত্রী যেন বেঁচে থেকেও মরে যেত। করা হত জীবন্ত প্রোথিত। কখনও দ্বিতীয় বিয়ে করতে পারত না। তার ভাগ্যে ভর্ৎসনা, তিরস্কার, অভিশম্পাত আর লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ছাড়া কিছুই জুটত না। বিধবা হওয়ার পর নিজের মৃত স্বামীর গৃহদাসী কিংবা দেবালয়ের পরিচারিকা হয়েই থাকতে হত তাকে। অধিকাংশ বিধবা নারী আপন স্বামীর সাথে চিতায় সতিদাহ হয়ে যেত। ডাঃ লী বান লিখেন, বিধবাদেরকে আপন স্বামীর লাশের সাথে পোড়ানোর বর্ণনা মুনশাস্ত্রে নেই। কিন্তু মনে হয়, এ প্রথা ভারতে ব্যাপক হয়ে গিয়েছিল। কেননা গ্রিক ঐতিহাসিকগণ এর উল্লেখ করেছেন।

মোটকথা, এই সবুজ-শ্যামল সুজলা-সুফলা দেশ –যা প্রাকৃতিক সম্পদে ছিল সমৃদ্ধ –সেই দেশ সত্য-সঠিক আসমানী ধর্মসমূহের শিক্ষা থেকে যুগ যুগ ধরে বঞ্চিত থাকা এবং ধর্মের নির্ভরযোগ্য উৎসগুলো হারিয়ে যাওয়ার কারণে যৌক্তিকতা ও নানা বিকৃতির শিকার এবং কত কত রুসম-রেওয়াজের পূজারী হয়ে গিয়েছিল তখনকার পৃথিবীতে মুর্খতা, কল্পনা পূজা, নিম্নশ্রেণীর মূর্তিপূজা, প্রবৃত্তির তাড়না এবং শ্রেণীগত বৈষম্য-অবিচারে ছিল অগ্রদূত। পৃথিবীর চারিত্রিক ও আত্মিক পথপ্রদর্শনের পরিবর্তে খোদ অন্তর্দ্বন্দ্ব, অভ্যন্তরীণ বিক্ষিপ্ততা ও চারিত্রিক কলুষতায় ছিল জর্জরিত।

চীন

মিস্টার রে ষ্ট্র্যাচী চীনে নারীদের অবস্থান সম্পর্কে লিখেন, "দূর প্রাচ্যে তথা চীনের অবস্থাসমূহ তদপেক্ষা ভাল ছিল না। ছোট্ট মেয়েদের কেটে ফেলার প্রচলিত কু-প্রথার উদ্দেশ্যে ছিল, তাদেরকে অসহায় দুর্বল করে রাখা। এ প্রথা যদিও অভিজাত ধনাঢ্য শ্রেণীর মাঝে প্রচলিত ছিল, তদুপরি এর দ্বারা আসমানী রাজত্বের যুগে নারীদের অবস্থা সম্পর্কে জানা যায়।

ইংল্যাণ্ড

উক্ত লেখক ইংল্যাণ্ডে নারীদের অবস্থান সম্পর্কে লিখেন, সেখানে তাকে সব ধরনের নাগরিক অধিকার থেকে রাখা হয়েছিল বঞ্চিত। শিক্ষার পথ তার জন্য ছিল অবরুদ্ধ। কেবল নিম্নমানের মজুরী খাঁটা ছাড়া সে কোনও

কাজ করতে পারত না। আর বিয়ের সময় তাকে নিজের সকল ধন-সম্পদের মালিকানা থেকে হতে হত রিক্তহস্ত। অকুণ্ঠ বলা যায়, মধ্যযুগ থেকে উনিশ খ্রিষ্ট শতক পর্যন্ত নারীকে যে সম্মান দেওয়া হয়েছিল, তদপেক্ষা কোনও ভাল কিছুর আশা করা যেত না।

বর্বর যুগে নারী

বর্বর যুগে সমাজে নারীর সাথে অবিচার ও দুর্ব্যবহারকে সাধারণত বৈধ জ্ঞান করা হত। তার সমূহ অধিকারকে করা হত পদদলিত। তার ধন-সম্পদকে পুরুষ নিজের মনে করত। সে মেরাছ এবং উত্তরাধিকার সত্ত্বে কোনও ভাগ পেত না। স্বামী মারা গেলে কিংবা তালাক দেওয়ার পর তার জন্য নিজের পছন্দ মতো দ্বিতীয় বিয়ে করার অনুমতি ছিল না। অন্যান্য আসবাবপত্র এবং জীবজন্তুর মতো সেও মেরাছ হিসেবে বণ্টন হত। পুরুষ তো নিজের পাওনাগুলো পুরোপুরি উসূল করে নিত। কিন্তু নারী তার ন্যায্য অধিকারও হাতে পেত না। খাবারের অনেক জিনিস পুরুষদের জন্যেই নির্দিষ্ট ছিল আর নারীরা সেসব থেকে ছিল বঞ্চিত।

কন্যাদের প্রতি ঘৃণ্য এতই বেড়ে গিয়েছিল যে, তাদেরকে জীবন্ত প্রোথিত করার প্রচলনও ছিল। হাইদাস ইবনে আদী উল্লেখ করেছেন, জীবিত কবরস্থ করার রীতি আরবের সব গোত্রে চালু ছিল। এর উপর আমল করত একজন আর ছাড়ত দশজন। এ ধারাবাহিকতা তখন পর্যন্ত চালু থাকে, যাবৎ না ইসলাম এসেছে। কেউ কেউ লজ্জা-শরমে আবার কেউ খরচ ও দারিদ্র্যের ভয়ে সন্তান হত্যা করত। আরবের কোনও কোনও নেতা অভিজাত ধনাঢ্য ব্যক্তি এহেন অবস্থায় শিশুদেরকে খরিদ করে নিত। প্রাণে বাঁচাত তাদের। ছা'ছা ইবনে নাজিয়াহ বলেন, ইসলাম আসার পূর্বে আমি জীবন্ত কবরস্থ হতে যাওয়া তিন মেয়েকে মুক্তিপণ দিয়ে প্রাণে বাঁচিয়েছি। মাঝেমধ্যে পিতার কোনও দীর্ঘ ব্যস্ত সফরের কারণে শিশুকন্যা সেয়ানা (বোধসম্পন্ন) হয়ে যেত; সময়মতো দাফন করার সুযোগ হত না। তখনও বর্বর পিতা ধোঁকা দিয়ে তাকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে নিয়ে জীবন্ত কবরস্থ করে চলে আসত। ইসলাম গ্রহণের পর অনেক আরব লোক এ ধরনের মর্মন্তুদ ও হৃদয়স্পর্শী বহু ঘটনাই বর্ণনা করেছেন।

ইসলামে নারীর মর্যাদা

ইসলাম নারী জাতিকে যে সম্মান দিয়েছে এবং নারী জীবনে বরং পৃথিবীর সামাজিক জীবনে যে মহা বিপ্লব সৃষ্টি করেছে, তা পড়া লেখা করা শিক্ষিতা

নারীগণের নিশ্চয় জানা আছে। (আমি এখানে সংক্ষেপে তার বর্ণনা দিচ্ছি।) পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্ম ও আইনের তুলনা যদি ইসলামের এই নতুন স্বতন্ত্র ও বিশেষ কর্মকাণ্ড ও নীতিমালা (Role) এর সাথে করা হয়, যা ইসলাম নারীর সম্মান প্রদান, মানব সমাজে তাকে যথাযোগ্য মর্যাদা দান নিষ্ঠুর আইন-কানুন, শোষণমূলক প্রথা-প্রচলন এবং পুরুষের আত্মকেন্দ্রিকতা ও অহমিকা থেকে তাকে পরিত্রাণ দেওয়ার ক্ষেত্রে বাস্তবায়ন করেছে, তাহলে চোখ খুলে যাবে। একজন শিক্ষিত ও বাস্তবপ্রিয় মানুষকে অকুণ্ঠ স্বীকৃতি ও সম্মানে মস্তকাবনত করতে হবে। কুরআনে কারীমের প্রতি সামান্য দৃষ্টিদানও নারী সম্পর্কে বর্বর জাহেলী দৃষ্টিভঙ্গি আর কুরআনিক ইসলামিক দৃষ্টিকোনের পার্থক্য বুঝার জন্য যথেষ্ট। আপনারা জানেন, দীন-ধর্মে, দীনের আহকাম ও মাসায়েল, ফরযসমূহে, এবাদত-বন্দেগীতে আকীদা-বিশ্বাস ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে ন্যূনতম আমাদের যে উম্মতের সম্পর্ক রয়েছে, যে ধর্মের সাথে সম্পর্ক রয়েছে, তাতে নারী জাতিকে বঞ্চিত রাখা হয়নি। মোটেও উপেক্ষা করা হয়নি তাদেরকে বরং এতে তারা পুরোপুরি অংশীদার। কেননা তাদের জন্য স্বতন্ত্র আহকাম ও মাসায়েল এবং নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাতসহ অন্যান্য ধর্মীয় মাসায়েল ও এবাদত-বন্দেগীতে তারা সমান অংশীদার। এভাবে তারা ধর্ম-শিক্ষা, ইসলামের খেদমত, কল্যাণ ও তাকওয়ায় সাহায্য-সহযোগীতা এবং সুষ্ঠু নিষ্কলুষ সমাজ গঠনে তারা অংশ নিতে পারে পুরোদমে।

কুরআনে কারীম আমল কবুল হওয়া, মুক্তি ও সৌভাগ্য লাভ আর পরকালীন সাফল্য লাভের বর্ণনায় সবসময় পুরুষের পাশাপাশি নারীদের কথাও উল্লেখ করেছে। যেমন, পবিত্র কুরআনের সূরা নিসা– ১২৪ আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে-

ومن يعمل من الصلحت من ذكر او انثى وهو مؤمن فأ لئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا

"যে লোক কোনও সৎকর্ম করে এবং বিশ্বাসী হয়, পুরুষ হোক বা নারী, তবে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের প্রাপ্য তিল পরিমাণও নষ্ট হবে না।

পৃথিবীর অনেক ধর্ম এমন আছে, যেখানে কোনও কোনও কাজ পুরুষের সাথে নির্দিষ্ট; তাতে নারীদের কোনও ভাগ নেই, নারীরা হাত পর্যন্ত লাগাতে পারে না তাতে। তাদের সে কাজের কাছে যাওয়া কিংবা তাতে তার ছায়া পড়াও সে কাজ বরবাদ করে দেয়।

পৃথিবীর বড় একটি ধর্ম খ্রিস্টবাদ, যার অনুসারী সম্ভবতঃ বিশ্বে সবচেয়ে বেশি। খ্রিস্টবাদ ইউরোপের বুকে ব্যাপকভাবে পত্র-প্রল্লবিত থাকা সত্ত্বেও খ্রিস্টধর্মে নারীদেরকে বহু ধরনের অধিকার ও বিষয় থেকে বঞ্চিত রাখা হয়েছে।

মধ্যযুগে একটা সময় এমন ছিল, যখন নারী কোনও জিনিসেরই মালিক হতে পারত না, পেত না তারা নিজের অধিকারগুলো। তারা কোনও ভূ-সম্পত্তির মালিক হবে, এ ছিল অসম্ভব। অনেক পুঁজা-অর্চনা, আরাধনা-উপাসনা, এবাদত-বন্দেগী ও ফরয কাজও তাদের জন্য অবৈধ-নাজায়েয ছিল। মানুষ নারীদের স্পর্শ-ছায়া থেকে ও পলায়ন করত। অনেক নারী ও কন্যাকে পাদ্রী-ঠাকুর বানিয়ে গীর্জা-মন্দিরে বসিয়ে দেওয়া হত। তাদের মায়েরা কাঁদত অঝোরে। ছটফট করত নিভৃতকোণে আর যখন তারা কন্যাকে খুঁজতে আসত, পাদ্রী তখন তাদের ছায়া থেকে পলায়ন করত, কদাচ যেন তাদের ছায়া না পড়ে যায়।

এটা তো কুরআনে কারীমের অলৌকিকতা; এতে আল্লাহ পাক সববিষয়ে নারীদের বর্ণনা পৃথক পৃথকভাবে করেছেন। যদি একসঙ্গে বলে দেওয়া হত, তবে হয়তো মেধা-মনন পুরোপুরিভাবে কাজ করত না আর আল্লাহ যে সম্মানের বর্ণনা দিয়েছেন, তার প্রতি সকলের মন-মানসিকতা ধাবিত হত না কিন্তু আল্লাহ তা'আলা এক একটি অংশে এক একটি শাখায় পুরুষের সঙ্গে নারীদেরও উল্লেখ করেছেন। যেমনি সাহস যোগানো, উৎসাহ দান আর সম্মান বৃদ্ধির জন্য, তেমনি অনেক মাসয়ালা ও বিষয়ে তাদের এরূপ চিন্ত ভাবনা দূর করার জন্যও যে, হয়তো এতে নারীদের আছে; তাতে নেই। এজন্যে আল্লাহ তা'আলা নারীদের বর্ণনা পৃথকভাবে করেছেন।

কুরআনে কারীম কেবল এবাদত-বন্দেগী, অনুগত্য এবং ধর্মীয় ফরয কার্যাবলি সম্পর্কেই আর নামায রোযার ক্ষেত্রেই পুরুষ ও নারীর সমতা-অংশীদারিত্বের কথাই বলে না বরং তার (কুরআনিক) শিক্ষার আলোকে সুযোগ্য পুরুষ, আলেম-বিদ্যান, সাহসী ও দৃঢ়চিত্ত পুরুষ এব কীর্তিমান পুরুষের সাথে সাথে চারিত্রিক উৎকর্ষতা, "আমর বিল মারুফ; নাহী আনিল মুনকার" (সংকাজের আদেশ; অসংকাজের নিষেধ) অর্থাৎ ইসলামিক সমাজ, আচার-অনুষ্ঠানের দেখাশোনা ও পথ প্রদর্শন, তাকে বিপথে চলা থেকে বাঁধাদান এবং সঠিক-সত্য পথে চালিত হওয়ার ব্যাপারে পুরুষদের সঙ্গে নারীগণও দায়িত্ব-কর্তব্যে অংশীদার। আল্লাহ তা'আলা ঈমানদার পুরুষ এবং ঈমানদার নারীকে একটি ঐক্যবদ্ধ, কল্যাণ ও তাকওয়ার (আল্লাহভীতির)

কাজে পরস্পর সাহায্যকারী দলের একটি ফ্রন্ট (FRONT) রূপে দেখতে চায়। তিনি এরশাদ করেন–

والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلوة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله ان الله عزيزحكيم

"আর ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারী একে অপরের সহায়ক। তারা ভাল কথার শিক্ষা দেয় এবং মন্দ থেকে বিরত রাখে, নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তার রাসূলের নির্দেশ অনুযায়ী জীবন যাপন করে, এদেরই উপর আল্লাহ তা'আলা দয়া করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী, সুকৌশলী।" (সূরা তাওবা–৭২)

মানবতার সম্মান এবং শ্রেষ্ঠত্বের উচ্চস্তরে পৌছার উপায় ও পূর্ণাঙ্গ মানদণ্ড তিনি নিছক তাকওয়া ও আল্লাহভীতিকে সাব্যস্ত করেন; জাত-বংশ, বর্ণ-গোষ্ঠী ও রক্তকে নয়। ইরশাদ হচ্ছে,

يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر او أنثى وجعلنا كم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن اكرمكم عند الله اتقكم إن الله عليم خبيرا

"হে মানব! আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিত হও। নিশ্চয় আল্লাহর কাছে সেই সর্বাদিক সম্ভ্রান্ত , যে সর্বাধিক পরহেযগার। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সবকিছুর খবর রাখেন। (সূরা হুজুরাত–১৩)

কথাগুলো নারীদের মধ্যে সাহসিকতা, আত্মবিশ্বাস ও আত্মসম্মানবোধ সৃষ্টি এবং আধুনিক মানসিকতার সংশোধনে তাদের নীচুতাবোধ (INFERIORITY COMPLEX) থেকে দূরে রাখার জন্য খুবই যথেষ্ট।

সেসব শিক্ষাদীক্ষরই সুফলে রাসূলে কারীম (সা.) এর যুগের পর থেকে বর্তমান যুগ পর্যন্ত বিখ্যাত কীর্তিমান মুসলিম নারীদের মধ্যে শিক্ষিকা-অধ্যাপিকা, তরবিয়ত ও দীক্ষাদানকারীনী, জিহাদ ও সেবা শুশ্রূষাকারিণী, কবি-সাহিত্যিক, লেখক-গবেষক, হাফেযে কুরআন, হাদীসের রাবী (হাদীস বর্ণনাকারী) আবেদা-যাহেদা, সাধক-আল্লাহওয়ালা এবং সমাজে সম্মানী ও সম্ভ্রান্ত নারীদের এক বিশাল জামাত দৃষ্টিগোচর হয়। যাদের কাছ থেকে

শত-সহস্র মানুষ ইলম অর্জন করেছে। দীক্ষা লাভ করেছেন আল্লাহপ্রেমিকগণ– যারা ছিলেন কষ্টিপাথর ও আদর্শ ব্যক্তিত্ব।

যেসব অধিকার ইসলাম মুসলিম নারীদেরকে দিয়েছে, তন্মধ্যে কয়েকটি হল, মালিকানা ও উত্তরাধিকার সত্ত্বের অধিকার, বেচাকেনার অধিকার, একান্ত প্রয়োজনে স্বামী থেকে পৃথক হওয়ার (খুলা তালাকের) অধিকার, বাগদান খতম করার অধিকার (যদি সে এতে সম্মত না হয়), দু' ঈদ, জুমুআ ও জামাতের নামাযগুলোতে অংশগ্রহণের অধিকার কিতাবাদিতে বিদ্যমান পাওয়া যায়।

পাশ্চাত্যের জ্ঞানী ও সুবিচারকদের দৃষ্টিতে নারী

একাধিক ইনসাফবাদী পাশ্চাত্য জ্ঞানী এবং সামাজিক ও সভ্যতার ইতিহাস বিশেষজ্ঞ কুরআন ও শরীঅতের সেসব শিক্ষাদীক্ষার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করেছেন, যেগুলো নারীর মর্যাদা ও অধিকার সম্পর্কিত। আমরা এখানে মাত্র দু'তিনটি স্বীকারোক্তি উদ্ধৃত করেই শেষ করব। তন্মধ্যে একটি স্বকারোক্তি জনৈক পাশ্চাত্য জ্ঞানীর। তিনি ছিলেন ভারতের একটি শুদ্ধি ও সংস্কার আন্দোলনের নেতা এবং দক্ষিণ ভারতের একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান (থিয়াসুফিক্যাল সোসাইটি) এর প্রধান। তিনি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামেও অংশ নিয়েছিলেন। কোনও নারীর সাক্ষ্য-স্বীকারোক্তি মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার আরেকটি কারণ হল, তিনি নারীদের বিষয়ে সচেতন হোন এবং তার পক্ষ থেকে প্রতিউত্তর দানের আগ্রহ রাখেন। মিসেস এ্যানি বিসেন্ট (Mrs. Annie Besant) বলেন,

"আপনি এমন কিছু লোক পাবেন, যারা ইসলামের বিরুদ্ধে সমালোচনা করে বলে যে, ইসলাম নির্দিষ্ট সংখ্যক বিবাহের বৈধতা দেয়। কিন্তু আপনাকে আমার সেই সমালোচনাটি বলা হয় না, যা আমি লণ্ডনে একটি হলে ভাষণ দানকালে করেছিলাম। আমি সেখানে শ্রোতাদের বলেছিলাম, "এক স্বামীর সাথে অবাধে অসংখ্য বাজারী নারীর উপস্থিতি কপটতা (Hypocrisy) এবং নির্দিষ্ট সংখ্যক বিবাহ অপেক্ষা অধিক লাঞ্ছনাকর।" স্বভাবতই মানুষ এ ধরনের ভাষণ-বক্তৃতাগুলোকে খারাপ মনে করে। কিন্তু তা বলা জরুরী। কেননা আমাদের স্মরণ রাখতে হবে, নারীদের সম্পর্কে ইসলামের আইন-কানুনগুলো এই বর্তমান যুগেও ইংল্যাণ্ডে গ্রহণ করা হচ্ছে। পৃথিবীর ইতিহাসে এটা ছিল সর্বাধিক ন্যায়সঙ্গত ও ইনসাফপূর্ণ আইন। ধন-সম্পত্তি, উত্তরাধিকারসত্ত্ব এবং তালাক ইত্যাদি বিষয়ের

অধিকারে সে ছিল পাশ্চাত্য থেকে অগ্রসর, নারী অধিকারগুলো সংরক্ষণকারী। সে পাশ্চাত্য জগতে নারীর সেই স্বাদের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করত না, যাকে তার রক্ষকগণ কেবল এই বলে পথ-প্রান্তরে ছুঁড়ে মারত যে, তার দ্বারা তাদের মন ভরে গেছে, ফুরিয়ে গেছে তার প্রয়োজন। আর এর পরে সে তার কোনও সাহায্য করত না।"

মিষ্টার N.L. COULSEN লিখেন, "নিঃসন্দেহে নারীর সম্মানের ব্যাপারে বিশেষত বিবাহিতা নারীদের ক্ষেত্রে কুরআনের আইন-কানুন সর্বোন্নত। বিবাহ ও তালাক সম্পর্কিত আইন অনেক আছে। যার সাধারণ উদ্দেশ্য নারীদের মান-মর্যাদার উন্নয়ন। আর এটা আরবদের আইন-কানুনে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের বহিঃপ্রকাশ। তাকে দেওয়া হয়েছে আইনগত সম্মান, যা তার পূর্বে ছিল না। তালাকের বিধানে কুরআন সবচেয়ে বড় যে পরিবর্তন এনেছে, তা হল এতে ইদ্দতের অন্তর্ভুক্তি।"

ধর্ম ও চরিত্রের বিশ্বকোষ প্রবন্ধকার লিখেন, "ইসলামের মহান নবী সা. নিশ্চিতভাবে নারীর সম্মান তদপেক্ষা অনেক উঁচু করেছেন, যা তার জন্য প্রাচীন আরবে ছিল। বিশেষত নারী তার মৃত স্বামীর পরিত্যক্ত জন্তু হয়ে থাকে নি বরং স্বয়ং হয়ে গেছে পরিত্যক্ত সম্পত্তির হকদার। একজন স্বাধীন ব্যক্তির মতো তাকে দ্বিতীয়বার বিয়েতে বাধ্য করা যেত না। তালাকের সময় স্বামীর উপর আবশ্যক হয়ে যায় তাকে সেসব সম্পদ দিয়ে দেওয়া, বিয়ের সময় সে যা পেয়েছিল। তা ছাড়া অভিজাত শ্রেণীর নারীগণ জ্ঞান-বিজ্ঞান ও কাব্যচর্চায় আগ্রহী হয়ে উঠে। কেউ কেউ তো শিক্ষিকা-অধ্যাপিকার মর্যাদায়ও ভূষিত হন। সাধারণ নারীরা নিজ ঘরের রাণীরূপে আপন স্বামীর সুখে-দুঃখে অংশীদার হতে থাকে। তখন করা হত মায়ের সম্মান।"

নব জন্ম ও মহাবিপ্লব

কুরআনের আয়াত ও নববী শিক্ষার আলোকে নারীর সম্মান সম্পর্কিত এ দৃষ্টিভঙ্গি যেন মানব পৃথিবীতে নারী জাতির নতুন জন্ম ছিল। কেননা আমি পূর্বেই বলে এসেছি, প্রাচীন পৃথিবীতে নারী ও গৃহপালিত পশু কিংবা নিষ্প্রাণ জড়বস্তুরে মধ্যে কোনও পার্থক্য ছিল না। তাকে জীবন্ত প্রোথিত করা হত। কখনো বন্ধক রাখা হত কিংবা তাকে মনে করা হত কোনও রঙ্গ-মহলের কাঠের পতুল। এহেন পরিস্থিতিতে এই বৈপ্লবিক শিক্ষা এক পুণ্যময় সুযোগ হয়ে দেখা দেয় সভ্যতা ও চরিত্র, পারিবারিক ও দাম্পত্য জীবনে। কমবেশি সকল দেশ ও সমাজই তাকে জানিয়েছে সাদর সম্ভাষণ।

বিশেষত সেসব দেশ যেখানে ইসলাম প্রবেশ করেছে বিজয়বেশে কিংবা তার শাসন ও পরিচালনার সুযোগ হয়েছে অথবা যেখানে ইসলাম পৌঁছেছে একটি সংস্কারমূলক আহবান ও কার্যকরী আদর্শরূপে। ইসলামের এই মানবিক উপহারের মূল্য-মর্যদা একদম সুস্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হয়েছে সেসব রাষ্ট্রে, যেখানে বিধবা নারীরা নিজে নিজেকে তার প্রয়াত স্বামীর চিতায় আত্মাহুতি দিত। সমাজ তাকে স্বামীর মৃত্যুর পর না বাঁচার অধিকার দিত আর না সে স্বয়ং নিজেকে এর যোগ্য মনে করত।

মুসলিম বাদশাগণ তাদের যুগে বেশ কিছু ভারতীয় প্রথা-প্রচলন, বিশেষত "সতীদাহ" প্রথাকে এমনভাবে সংস্কার করেছে, যাতে ধর্মীয় আকীদা-বিশ্বাস এবং ভারতীয় প্রথা-সংস্কৃতির না কোনও ক্ষতি হয়েছে আর না তাদের অসম্মান হয়েছে। এ প্রসঙ্গে বিখ্যাত ফরাসী পর্যটক ও চিকিৎসক ডা. বর্ন্যার (BERNIER) যিনি সম্রাট শাহজাহানের যুগে ভারত ভ্রমণ করেছিলেন, তিনি লিখেন–

আজকাল "সতীদাহ" প্রথা পূর্বের তুলনায় অনেকটা বিলুপ্ত প্রায়। কেননা মুসলমান, যারা এদেশের শাসক– এই হিংস্র পশুসূলভ প্রথা নির্মুল করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে যাচ্ছে। যদিও এর নিষিদ্ধতা সম্পর্কে কোনও আইন প্রনয়ণ করা হয় নি, কিন্তু তাদের কৌশল (রাষ্ট্র পরিচালনা বা দেশ শাসন) এর একটি অংশ হল, তারা হিন্দুদের বিশেষ সংস্কৃতিগুলোতে, যার সংখ্যা মুসলসানদের অপেক্ষা বহুগুণ বেশি হস্তক্ষেপ করা উচিত মনে করে না বরং তাদের ধর্মীয় সংস্কৃতি পালনে তাদেরকে স্বাধীনতা দেয়। কিন্তু এতদসত্ত্বে "সতীদাহ" প্রথাকে কিছু জটিলতা বেঁধে রুখতে থাকে। এমনকি কোনও নারীকে জীবন্ত দাহ্য করার অনুমোদন তার প্রাদেশিক শাসক আদৌ দেয় না– যাবৎ না তার নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস হয়ে যায় যে, তারা এ ইচ্ছা থেকে কখনও নিবৃত হরে না। প্রাদেশিক শাসক তর্ক-বিতর্কের মাধ্যমে তাকে বুঝায়। নানামুখী প্রতিশ্রুতি ও ধমকি প্রদান করে। যদি তার বুঝানো এবং কৌশল ফলপ্রসু না-হয়, তাহলে কখনও কখনও তাকে নিজের অন্দর মহলেও পাঠিয়ে দেয়। যাতে বেগমরাও তাকে সাধ্যমত বুঝিয়ে দেয়।

কিন্তু এতসব চেষ্টা-তদবীর সত্ত্বেও "সতীদাহ" এখনও বেশ আছে। বিশেষত সেসব রাজাদের অঞ্চলগুলো এবং রাজ্যসমূহে, যেখানে কোনও মুসলমান প্রাদেশিক গভর্ণর নিযুক্ত নেই।

আল্লামা ইকবালের চোখে সম্মানিতা নারী

হালের (এ রচনার সময়ের কথা) বিখ্যাত কবি ও দার্শনিক ডক্টর মুহাম্মাদ ইকবাল এমন এক সময় শিক্ষাদীক্ষা লাভ করেছেন, যখন নারীজাতি স্বাধীনতা ও উন্নতির অনেক উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। পশ্চিমা বিশ্ব পুরুষ ও নারীর সমতা এবং নারী স্বাধীনতা ও পর্দাহীনতার বাঁশি এতই তোড়জোরে ফুকেছিল যে, এর উল্টো কোনও শ্লোগান শোনা ছিল অসম্ভব। আল্লামা ইকবাল তার শিক্ষা জীবনের বিরাট অংশ কাটিয়েছেন ইউরোপে। তার বাকী জীবন কেটেছে এমন এক পঙ্কিল পরিবেশে, যা নারী স্বাধীনতা এবং পাশ্চাত্যের অনুকরণের সম্ভবত সবচেয়ে বড় কেন্দ্র ছিল। এতদসত্ত্বেও মুসলিম নারীদের সম্পর্কে তার শ্রদ্ধা-বিশ্বাস ও চিন্তাধারায় কোনও প্রকার টানাপোড়েন-দ্বিধা সৃষ্টি হয় নি বরং পশ্চিমা বিশ্বের জীবনের বিক্ষিপ্ততা-অস্থিরতা আর সেখানকার মানবতা ধ্বংসের ঘটনাগুলো দেখে তার এই বিশ্বাস আরও শক্তিশালী হয়ে গেছে যে, মুসলিম নারীদের জন্য ভিন্ন জীবন ব্যবস্থা রয়েছে। তাকে পাশ্চাত্য নারীর অনুকরণ থেকে পূর্ণ সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। তার মতে জীবনে তখন পর্যন্ত দৃঢ়তা এবং নিয়ম-শৃঙ্খলা আসতে পারে না, যাবৎ না নারীর মধ্যে প্রকৃত নারীত্ব, পুতঃপবিত্রতা ও মাতৃসূলভ স্নেহ-প্রীতি সৃষ্টি হবে। যে জাতি এ তথ্য-রহস্য সম্পর্কে অনবগত, তাদের জীবন ব্যবস্থা সর্বদা ওলোট-পালট এবং টলটলায়মান থাকবে। সুতরাং তিনি বলেন–

جہاں را محکمی از امہات است
نہاد شاں امین ممکنات است

اگر ایں نکتہ را قومے نداند
نظام کارو بارش بے ثبابت است

“পৃথিবীর সুরক্ষা হয় মায়েদের দ্বারা, তাদের বংশভিত্তির নিরাপত্তা হয় সম্ভব। যদি এ তত্ত্ব কোনও জাতি না-জানে, তাদের কর্মব্যবস্থা হয় টলটলায়মান।”

তিনি নিজের সকল উন্নতি-সমৃদ্ধি, জাগরণ, সচেতনতা, ঈমানী চেতনা, দরদ ও মনোত্তাপকে আপন মায়ের দীক্ষা এবং তার পবিত্র গর্ভের সুফল মনে করেন। তিনি বলেন, আমার মধ্যে ঈমান ও প্রেমের যে এক অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিদ্যমান, ইলম ও জ্ঞানের সঙ্গে যার কোনও বিরোধ নেই বরং আছে তীব্র

আকর্ষণ, তা আমার পুণ্যবতী মায়ের সুদৃষ্টির বরকত। আমি যা কিছু পেয়েছি, সবই তার কোল ও শিক্ষায় পেয়েছি। মাদ্‌রাসা ও শিক্ষালয় (যেখানে ইকবাল বড় বড় বই-কিতাব পড়েছেন এবং বিদগ্ধ জ্ঞানী আলেম হয়ে বেরিয়েছেন) না বাস্তাবদর্শী দৃষ্টি দিয়েছে আর না দান করেছেন দরদী প্রাণ ও অন্তর্জ্বালা। তিনি স্বয়ং বলেন, এ সম্পদ তো কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পাওয়া যায় না। সেখানে কিস্যা-কাহিনী ছাড়া আর কিছু নেই। এ অমূল্য সম্পদ তো আল্লাহ পাক কোনও ঈমানদার মাকে নসীব করলে তার শিক্ষাদীক্ষার কোলে পাওয়া যায়।

مراد او ایں خرد پرور جنونے
نگاہ مادر پاک اندرونے

ز مکتب چشم و دل نتواں گرفتن
کہ مکتب ، نیست جز سحر و فسونے

"তার অভীষ্ট এই বিজ্ঞতা পূজারী উন্মত্ততা, পুণ্যাত্মা মায়েরই সুদৃষ্টি; বিদ্যালয় থেকে অন্তর্চক্ষু ও মনোত্তাপ পাওয়া যায় না। কারণ, বিদ্যালয় তো যাদু ও উপাখ্যান ছাড়া কিছু নয়।"

তিনি মুসলিম কন্যাদের উদ্দেশ্য বলেন, পাশ্চ্যাত্য বিশ্ব যুবকদেরকে প্রভাবিত এবং নিজের প্রতি আকৃষ্ট করার যে পদ্ধতি শিখিয়েছে, তা একজন মুসলিম নারী-কন্যার জন্যে মোটেও শোভা পায় না। এই ভেল্কি ও যাদুতা আর এই মনচুরি ও প্রেমপ্রীতি কোনো মুসলমানের জন্য উপযুক্ত নয়। অনন্তর তিনি মুসলিম নারী-কন্যাদের সম্ভোধন করে আরও বলেন– তোমাদের ভোগ-বিলাস ও চাকচিক্যের প্রয়োজন নেই। যা আজ পাশ্চত্যের অনুকরণ-অনুসরণ মুসলিম দেশগুলোতে ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। তোমাদের মনপ্রাণ এমন চাকচিক্য ও সাজসজ্জায় লাগানো উচিত নয়, যা প্রসাধনী ও পাউডারের বদান্যতা। তোমাদের সৌন্দর্য আর তোমাদের সম্মান তো তোমাদের পবিত্র দৃষ্টিতেই, কুমতলব যার তাপদাহ বহন করতে পারে না এবং যা নারীদের সবচেয়ে বড় সৌন্দর্য ও ভূষণ।

بہل اے دخترک ایں دلبری ہا – مسلماں را نہ زیبد کافری ہا
منہ دل بر جمال غازہ پرورد – بیاموز از نگہ غارت گری ہا

"তিনি বলেন, সৌন্দর্য ও মনজয়ের জন্য পর্দাহীনতা শর্ত নয়। আধুনিক যুগের কাছে কিছু নেই। এ জন্য পর্দাহীনতাকে নিজের আদর্শ

বানিয়েছে। সে কেবল চাকচিক্য ও রংঢংয়ের মধ্যে নিজের প্রদর্শনী করেছে। দেখো, আল্লাহর নূর ও খোদায়ী সৌন্দর্য কত পর্দাবরণে আচ্ছাদিত। তবু গোটা বিশ্বজগত তার দ্বারা আলোকিত ও দ্বীপ্তিমাণ, মুসলিম নারীকে নিজের মধ্যে এমন গুণাবলি, যোগ্যতা এবং সৌন্দর্য-সৌকর্য সৃষ্টি করা উচিত, যাতে তারা খাঁটি পর্দায় থেকে বিশ্ব মানবতাকেও যারপরনাই উপকৃত করতে পারে।"

ضمیر عصر حاضر بے نقاب است
کشادش در نموے رنگ وآب است

جہا نتا بی زنور حق بیاموز
کہ اوباصد تجلی درجات است

তার বিশ্বাস হচ্ছে, মুসলিম নারীদের মধ্যে যদি সঠিক ইসলামিক গুণাবলি বিদ্যমান থাকে, তবে সে হবে মানবতার ত্রাতা এবং মুরব্বী। আল্লাহ পাক তার রক্ষণাবেক্ষ করবেন। বিশ্বমানবতা তার মুখাপেক্ষী থাকবে সবসময়। কত প্রজন্ম আসবে যাবে, কত জাতির উত্থান-পতন হবে, কত সভ্যতা-সংস্কৃতি পত্র-পল্লবিত হবে আবার হবে নিষ্প্রাণ খরকুটো, কত রাজ্য আবাদ ও বিরান হবে; কিন্তু মুসলিম নারী মানবতার এমন একটি বৃক্ষ, যার কখনও খয় নেই; কখনও নেই হেমন্তকাল। সে সর্বদা একই তত্ত্বকথা বলে। সে মুসলিম নারীদেরকে বলে, তোমার উপযুক্ত স্থান, জীবনের হৈ-হল্লোড় আর রঙ-তামাশা নয়। তুমি যদি পুরুষের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে খাওয়া-পরা ও আয়-রোজগারে তৎপরতা দেখাও, তবে জাতির সাথে অকৃজ্ঞতা-ঘাতকতা আর নিজের প্রতি অবিচার করা হবে। তোমার দায়িত্ব ও সৌভাগ্য তো হল, তুমি নবী (সা.) এর কলিজার টুকরা হযরত ফাতেমা বাতুল রাযি. এর মতো স্বামীর ঘর-সংসার আবাদ করবে। একেই বানাবে নিজের মনোযোগ্য ও পছন্দের কেন্দ্রবিন্দু। সেখানে বসে এমন সুসন্তান লালন-পালন করবে, যে মুসলমানদের সমস্যা সমাধান করবে। জটিলতায় সহজতা আনবে। জাতির জন্য হবে নিবেদিত প্রাণ। আজ ইসলামের জন্য বিরাট প্রয়োজন হাসান-হুসাইন রাযি. এর মত সুপুত্র। আর এই অমূল্য রত্ন মুসলিম মায়েদের দ্বারাই পাওয়া যায়।

اگر پندے درویشے پزیری — ہزار امت بیرو تونہ میری
بتولے باش وپنہاں شوازیں عصر — کہ در آغوش شبیرے بگیری

আল্লামা ইকবালের বিশ্বাস হল, মুসলিম উম্মাহর দিন বদলে এবং নতুন যুগের সূচনায় মুসলমান নারীগণও বিরাট ভূমিকা রাখতে পারে। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে এমন ঈমানী শক্তি, এমন দরদী মন, এমন অন্তর্ভেদী সুর, এমন পুতঃস্বভাব দান করেছেন, যা আজও মুসলমানদের মেধা-মননে সেই ঈমানী চেতনা, ঈমানী আগ্নশিখা প্রজ্জ্বলিত করতে পারে। তাদেরকে ইসলামের ইতিহাসের এই জ্বালাময়ী ঘটনা ভুলে না বরং সে চায় প্রত্যেক মুসলমান নারী একে স্মরণ রাখুক। ঘটনা হল, একবার এক পুণ্যাত্ম নারীর কুরআন তিলাওয়াত তার যুগের কঠোরতর মানুষের মনে আন্দোলন সৃষ্টি করে দিয়েছিল, ইসলামের জ্যোতির্ময় আলোআভা ও ঈমানের উষ্ণতায় ভরে দিয়েছিল কুরআন অস্বীকারকারীদেরকে, প্রতিফলন মুসলিম উম্মাহকে দান করেছে হযরত উমর রাযি এর মত খাঁটি ঈমানদার, দৃঢ়চিত্ত ও বিশ্ববিজেতা। যার দ্বারা শুরু হয়েছে ইসলামের উন্নতি ও শক্তির এক নতুন যুগ; সূচিত হয়েছে এক নব অধ্যায়। প্রশান্ত হয়েছে রাসূলে কারীম (সা.) এর নয়নযুগল। একথা জ্ঞানীজনে অবগত আছেন আর শিক্ষিতজনে পড়েছেন– হযরত উমর রাযি. যখন তরবারী হাতে ইসলামের যবনিকাপাত ঘটাতে বের হলেন এবং প্রথমে আপন সহোদর ফাতেমা বিনতে খত্তাবের ঘরে গেলেন। যাতে নিজ ঘর থেকে এ কাজের সূচনা করতে পারেন, আপন ভাই-বোনকে ইসলাম গ্রহণের শাস্তি দিতে পারেন। তখন তার বোনের কুরআন তিলাওয়াতের অমীয় সুর-তরঙ্গ তার মনকে মোমের মত বিগলিত করে দেয়। ইসলাম তার আত্মায় স্থান করে নেয়। আল্লামা ইকবাল চাইতেন, মুসলিম নারীগণ চিনুক এই মনোত্তাপ ও অন্তর্জ্বালা আর বশীকরণ ও প্রভাবশক্তি। এর দ্বারা পুনরায় বিশ্বজাহানে বিপ্লব সৃষ্টি করুক। মুসলিম নারীদের সম্বোধন করে তিনি বলেন, আল্লাহর জন্য আমাদের হতাশার সন্ধ্যাকে পুনঃআশার উষায় বদলে দাও। জ্ঞানী-বিচক্ষণদের পড়ে শোনাও কুরআনে কারীম। তুমি তো জান, তোমার কুরআন তিলাওয়াতের উত্তাপ বদলে দিয়েছে হযরত উমর রাযি. এর ভাগ্যলিপি। আর তারপর পৃথিবীর ভাগ্যরবি যেভাবে বদলে গিয়েছে, সেকথা জানে গোটা বিশ্ব। একথাই বলছে তাঁর এই ছন্দ–

ز شام مایروں آور سحر را – بہ قران بازخواں اہل نظر را

تومی دانی کہ سوز قرات تو – دگرگوں کرد تقدیر عمر را

ইকবালের ভাষায় নারী

আধুনিক উর্দু কবিত্বে সম্ভবত আল্লামা হালী ও আল্লামা ইকবাল (রহ.)-ই এমন দু'জন কবি, যাদের গজল-কবিতায় জাতিগত অপবিত্রতা, নগ্নতা ও

অগভীরতা পাওয়া যায় না বরং এর বিপরীত নারীর মর্যাদা এবং তার সামাজিক অবস্থান বহাল করায় তাদের দু'জনের বিরাট ভূমিকাই পরিলক্ষিত হয়।

আল্লামা ইকবাল নারীজাতির জন্য সে-ই জীবন পদ্ধতিই পছন্দ করতেন, যা ইসলামের সূচনাকালে পাওয়া যেত। যেখানে নারীগণ প্রচলিত বোরকা ছাড়াও লজ্জা-শরম এবং স্বতীত্ব-পবিত্রতা ও নিরাপত্তার অনুভূতিতে আজ থেকে বহুগুণে অগ্রসর ছিলেন। আবার শরীআত নির্দেশিত পর্দার যত্ন নেওয়ার সাথে সাথে জীবনের সকল কাজকর্মে অংশগ্রহণ করতেন।

১৯১২ খ্রিষ্টাব্দে তুরাব্‌লস্‌ যুদ্ধে যখন এর একটি বাস্তব নমুনা তার দৃষ্টিগোচর হল অর্থাৎ এক আরব দূহিতা ফাতেমা বিনতে আব্দুল্লাহ গাজীদেরকে পানি পরিবেশন করতে করতে শহীদ হলেন, তখন তিনি তার গভীর শোক প্রকাশ করেন। তাই দেখুন, নিচের শোঁকগাথায়।

فاطمہ! تو آبروئے امت محروم ہے
ذرہ ذرہ تیری مشت خاک کا معصوم ہے

یہ سعادت حور صحرائی تری قسمت میں تھی
غازیان دیں کی سقائی تری قسمت میں تھی

یہ جہاد اللہ کے رستے میں بے تیغ و سفر
ہے جسارت آفریں شوق شہادت کس قدر

یہ کلی بھی اس غلستان خزاں منظر میں تھی
ایسی چنگاری بھی یارب اپنی خاکستر میں تھی

اپنے صحرا میں بہت آہوا بھی پوشیدہ ہیں
بجلیاں برسے ہوئے بادل میں بھی خوابیدہ ہیں

فاطمہ! گو شبنم افشاں آنکھ تیرے غم میں ہے
نغمہ! عشرت بھی اپنے نالئہ ماتم میں ہے

رقص تیری خاک کا کتنا نشاط انگیز ہے
ذرہ ذرہ زندگی کے سوز سے لبریز ہے

ہے کوئی ہنگامہ تیری تربت خاموش ہے
پل رہی ہے ایک قوم تازہ اس آغوش میں

তরজমা–

১। ফাতেমা তুমি মরহুম উম্মতের সম্মান! তোমার মুষ্ঠি মাটির (দেহকাদায়) অণুকণাও নিষ্পাপ।

২। এ সৌভাগ্য মরুদূহিতা ছিল তোমার ললাটে। দীনের মুজাহিদ-গাজীদের পানি পরিবেশন ছিল তোমারই ভাগ্যে লিখা।

৩। ঢাল-তলোয়ার বিনে আল্লাহর পথে এ জিহাদ, কত নির্ভীকতা! শাহাদতের কি যে আকুলতা!

৪। এই পুষ্পকলিও ছিল সেই হৈমন্তী বাগানে। এমন অগ্নিস্ফুলিঙ্গও ছিল হে প্রভূ তোমার ভস্ম-ছাইয়ে।

৫। এখনও অনেক হরিণ তোমার মরুদ্যানে আছে লুকিয়ে। বিদ্যুৎ চমকানো মেঘের আড়ালেও আছে ঘুমিয়ে।

৬। ফাতেমা! নয়ন যেন শিশির ঝড়ায় সিক্ত তোমার বিরহ শোকে! খুশিও যেন তার মৃত্যশোকে বিলাপ রত।

৭। তোমার মাটির উচ্ছলতা কত আনন্দদায়ক। জীবনের অণুকণা মর্মপীড়ায় ভরা।

৮। তোমার নীরব সমাধিতে আজ কি জনতার ঢল! লালিত হচ্ছে এ কোলে এক সতেজ জাতি।

ভারতীয় শিক্ষাবিদ এবং এমন সব গ্রন্থকারের উপর তার বিরাট অভিযোগ ছিল, যারা নারী নামের অপব্যবহার করে সাহিত্যের পবিত্রতা-পরিচ্ছন্নতা, বিশালতা ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্যকে আহত করে। তিনি তার একটি কবিতায় বলেন,

چشم آدم سے چھپاتے ہیں مقامات بلند
کرتے ہیں روح کو خوابیدہ بدن کو بیدار

ہند کے شاعر و صورت گر و افسانہ نویس
آہ بیچاروں کے اعصاب پہ عورت ہے سوار

১। "দৃষ্টি লুকায় মানুষ হতে, স্থান করে উচুঁ; আত্মাকে নিদ্রিত আর দেহকে সজাগ-জাগ্রত।

২। ভারতের কবি, শিল্পী ও ঔপন্যাসিক– আক্ষেপ! এই অসহায়দের রন্ধ্রে রন্ধ্রে মিশে আছে নারী।

তিনি "জাতির কন্যাদের" প্রতি সম্বোধন করে বলেন, মুসলিম নারীদের জন্য মনচুরি, প্রেম-প্রীতি এবং ফ্যাশন বা রূপচর্চা করা এক হিসেবে কুফরী বরং তাদের তো নিজের ব্যক্তিত্ব, মাধুর্য, বৈপ্লবিক স্বভাব- চরিত্র ও পুতঃদৃষ্টির মাধ্যমে বাতিলের আশা-আকাঙ্ক্ষার গুঁড়েবালি দেওয়া উচিত।

بہل اے دختر ایں دلبری ہا
مسلماں را نہ زیبد کافری ہا

منہ دل بر جمال غازہ پرور
بیاموز از نگہ غارت گری ہا

তিনি বলেন, মুসলিম নারীদের পূর্ণ পর্দাপালনের সাথে সাথে সমাজ ও জীবনে এরূপভাবে থাকা উচিত, যাতে তার সুপ্রভাব পড়ে সমাজের ওপর। তার রশ্মিকিরণে গোটা বিশ্ব এমনভাবে আলোকিত থাকে, যেভাবে মহান সত্তা আল্লাহ পাকের জ্যোতি পর্দা থাকা সত্ত্বেও বিচ্ছুরিত হয় বিশ্বচরাচরে।

ضمیر عصر حاضر بے نقاب ست
کشادش در نمود رنگ آب ست

جہاں تابی ز نور حق بیاموز
کہ اوباصد تجلی در حجاب ست

তিনি পৃথিবীর সকল কাজকর্মের মূল আখ্যাদেন মায়েদের সত্তাকে। তিনি বলেন, তাদের সত্তা সকল শক্তির রক্ষাকবচ। বৈপ্লবিক অন্তর-আত্মার ধারক। যে জাতি মায়েদের সম্মান ও মূল্যায়ণ করে না, তাদের জীবন ব্যবস্থা সুশৃংখল হতে পারে না।

جہاں را محکمی از امہات است
نہاد شاں امین ممکنات ست

اگر ایں نکتہ را قومے نداند
نظام کار و بارش بے ثبات ست

তিনি নিজের সকল যোগ্যতা-দক্ষতা আর কর্মকীর্তিগুলোকে আপন মায়ের অনুগ্রহদান ও কল্যাণ দৃষ্টি আখ্যা দেন। বলেন, শিষ্টাচার ও চারিত্রিক দীক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে নয়, মায়ের কোল থেকে হাসিল হয়।

مراد او این خرد پرور جنونے
نگاه مادر پاک اندرونے

زمکتب چشم ودل نتواں گرفن
کہ مکتب نیست جزسحر و فسونے

তিনি জাতির ইতিহাস এবং অতীত-বর্তমানকে তাদের মায়েদের অবদান আখ্যা দেন। বলেন, মায়েদের ললাটে যা কিছু লেখা থাকে, তাই জুটে জাতির ভাগ্যে।

خنک آں ملتے کزوار داتش
قیامت ہابہ بلد کائنا تش

چہ پیش آید چہ پیش افتاد اورا
تواں دیداز جبین امہا تش

তিনি জাতির কন্যা-বোনদের আহবান জানান যে, তোমরা জাতির ভাগ্য-নির্মাণে কাজ করো। জাতির যন্ত্রণাময় সন্ধ্যাকে সুখ-বসন্তের সকালে বদলে দাও। সুতরাং তোমরা ঘরে ঘরে কুরআনের শিক্ষা ও কল্যাণের ধারাকে ব্যাপক সম্প্রসারিত করো। যেমন, হযরত উমর রাযি. এর সহোদরা বোন কুরআন পাঠের মাধ্যমে তার ভাগ্যরবি চমকে দিয়েছেন। নিজের মধুময় স্বরের দহন-জ্বালায় তার কঠিন মনকে করে দিয়েছিল বিগতিল।

زشام ماپروں آور سحررا مابروں آور سحررا
بہ قرآں باز خواں اہل نظررا

تومی دانی کہ سوز قرآت تو
دگر گوں کرد تقدیر عمر را

আল্লামা ইকবাল সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে মায়ের কেন্দ্রীয়তার প্রবক্তা। তিনি মনে করেন, অভিজাত পরিবার ব্যবস্থায় মাতৃত্বের অনুভূতি মৌলিকতার পর্যায়ে। আর তারই অবদানে মানব জাতির উদ্যান হতে থাকে শস্য-শ্যামল। তার ভাবনা হল, যেভাবে ঘরের বাইরের জীবনে পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে, তদ্রুপ ঘরের ভেতরকার জীবন ও কাজকর্মে রয়েছে নারীর

বিশেষত মায়ের গুরুত্ব। কেননা নতুন প্রজন্মের লালন-পালন ও দেখাশোনার দায়িত্ব তারই। মানুষের প্রথম বিদ্যালয় হয় মাতৃকোল। মা যতখানি নম্র-ভদ্র, সভ্য-সুশৃংখল ও উঁচু মানসিকতার অধিকারী হবে, শিশুর উপরেও এসবের ততখানি প্রভাব পড়বে। গড়ে উঠবে একটি উত্তম ও গৌরবময় প্রজন্ম।

وہ فیضان نظر تہا یاکہ مکتب کی کرامت تہی
سکہا ئے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی

"সে কি ছিল অবদান দৃষ্টির না যাদু বিদ্যালয়ের!
শেখাল কে ইসমাঈলেরে পুত্রের শিষ্টাচার!

আল্লামা ইকবালের দৃষ্টিতে নারীর সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্ব তার মাতৃত্বের কারণে। যে জাতির এই মাতৃত্বের অধিকার, সম্মান ও শিষ্টাচার রক্ষা করে না, তাদের শৃংখলা-ব্যবস্থা হয় ভঙ্গুর, অমূলক, ভিত্তিহীন। তছনছ হয়ে যায় বংশীয় নিরাপত্তা ও সুখ-শান্তি। বিলীন হয়ে যায় বংশের লোকদের পারস্পরিক একতা ও আস্থা-বিশ্বাস। মুছে যায় ছোট বড়োর পার্থক্য। অবশেষে উন্নত চরিত্র ও উঁচু গুণাবলীর অপমৃত্যু ঘটে। আল্লামা ইকবালের ধারণামতে পশ্চিমা বিশ্বের চারিত্রিক দীনতা ও মহামারী দেখা দেওয়ার কারণ, সেখানে মাতৃত্বের সম্মান প্রদর্শন এবং শ্রেণীগত ও জাতীয় পবিত্রতা নিঃশেষ হয়ে গেছে।

তিনি নারী স্বাধীনতা আন্দোলনের সমর্থন করেন না। কারণ, এর পরিণতি নারী জাতির আরেক ধরনের গোলামী। এতে তাদের সমস্যাগুলো সমাধান নয়; আরও জটিলতর হয়ে যাবে। মানব সভ্যতার সবচেয়ে গুরুতর ক্ষতি হবে, নিংশেষ হয়ে যাবে মাতৃত্বের আগ্রহ-অনুভূতি। মায়ের মমতার বন্ধন হয়ে পড়বে দুর্বল নড়বড়ে। কাজেই তিনি বলেন, যে জ্ঞান-বিদ্যার কারণে নারী তার আসল বৈশিষ্টগুলো হারিয়ে বসে, তা মূলত জ্ঞান নয়; একধরনের মূর্খতা বরং সাক্ষাত মৃত্যু। আর পাশ্চাত্য সভ্যতা জাতিগুলোকে এ মৃত্যুরই আহবান করছে।

تہذیب فرنگی ہے اگر مرگ امومت
ہے حضرت انساں کے لئے اسکا ثمر موت

جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن
کہتے ہیں اسی علم کو ارباب نظر موت

بیگانہ رہے دین سے اگر مدرسئہ زن
ہے عشق و محبت کے لئے علم و ہنر موت

علم اوبار اومت بر نتافت
بر سر شاخش یکے اختر نتافت

ایں گل از بستان مانار ستہ بہ
داغش از دامان ملت شستہ بہ

পাশ্চাত্য সভ্যতা যদি হয় মাতৃত্বের মরণ,
তার পরিণতি মানবতার অপমৃত্যু ।
যে জ্ঞানের প্রভাবে নারী হয় নষ্টা নারী,
বিজ্ঞজনে বলেন, সেই জ্ঞান মৃত্যু উপম ।
বালিকা বিদ্যালয় যদি দীন সম্পর্কে থাকে অজ্ঞ-অপরিচিত,
প্রেম-প্রীতির জন্য জ্ঞান-বিদ্যা যেন মৃত্যু তূল্য ।
এ পুষ্প আহরিত নিষিদ্ধ বাগান থেকে ।
এর দাগ জাতির আঁচল থেকে ধুয়ে মুছে ফেলাই শ্রেয় ।

ইকবালের চিন্তাধারায় নারী স্বাধীনতা আর পুরুষ স্বাধীনতা দুটিরই কোনও অর্থ নেই বরং পুরুষ ও নারীর সম্পর্ক, পারস্পরিক আত্মনিবেদন, ত্যাগ-তিতিক্ষা ও সাহায্য-সহায়তা একে অন্যের জন্য জরুরী । দু'জন মিলে জীবনের সুখ-দুঃখ, কষ্ট-ক্লেশ ভাগ করে জীবনকে এগিয়ে নিতে হবে । একে অন্যের সহযোগী না-হওয়ার কারণে জীবনের কাজকর্ম অসম্পূর্ণ থাকে । ফিঁকে হয়ে যায় তার উজ্জ্বলতা । অবশেষে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এ মানব জাতি ।

مرد و زن وابستئہ یک دیگر اند = کائنات شوق را صورت گراند
زن نگہ دارندئہ نار حیات = فطرت او لوح اسرار حیات
آتش مارا بجان خود زند = جوہر او خاک را آدم کند
در ضمیرش ممکنات زندگی = ازتب و تابش ثبات زندگی
ارج ما ازار جمندی ہائے او = باہمہ از نقشبندی ہائے او

ইকবাল বলেন, নারী যদি শিক্ষা-সভ্যতা, জ্ঞান ও শিষ্টাচারের বড় কোনো খেদমত আঞ্জাম না দেয়, তথাপি তার স্নেহ-মমতাই অতি মূল্যবান ।

যার স্নেহ পরশে বিশ্ববিখ্যাত মানুষ উন্নতির শীর্ষে আরোহন করে। পৃথিবীর এমন কোনো মানুষ নেই, যে তার অনুগ্রহ দান নয়।

وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ
اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز دروں

شرف میں بڑہکر ثریاسے مشت خاک اسکی
کہ ہر شرف ہے اسی درج کا در مکنوں

مکالمات فلاطوں نہ لکہ سکی لیکن
اسی کے شعلے سے ٹوٹا شرار افلاطوں!

১। জগতের এত রূপ-রং নারীর বিদ্যমানতায়; তারই কারণে সেসবে জীবনের জ্বলন।
২। তার মাটি মর্যাদায় সুরাইয়া তারকা অপেক্ষাও উর্ধ্বে; কারণ, সব সম্মান তো ঐ মঞ্জুষার মধ্যে লুকায়িত।
৩। দার্শনিক আফলাতুন প্রবন্ধ-নিবন্ধ লিখতে পারে নি। কিন্তু তারই অগ্নিস্ফুলিঙ্গে ভেঙ্গেছে আফলাতুনের কুকীর্তির রাজ।

নারী স্বাধীনতা আন্দোলনের দ্বারা যেভাবে পুরুষ ও নারীর সম্পর্কচ্ছেদ হয়েছে এবং এর যে ঘৃণ্য পরিণতি দেখা দিয়েছে, ইকবালের দৃষ্টিতে এর দায়ভার পাশ্চাত্য সভ্যতার। তিনি "মরদে ফিরিঙ্গ" (পাশ্চাত্যের মানুষ) শিরোনামে বলেন–

ہزار بار حکیموں نے اسکو سلجہایا
مگر یہ مسئلہ زن رہا وہیں کا وہیں

قصور زن کا نہیں ہے کچہ اس خرابی میں
گواہ اسکی شرافت پہ ہیں مہ وپروین

فساد کا ہے فرنگی معاشرت میں ظہور
کہ مرد سادہ ہے بیچارہ زن شناس نہیں

کوئی پوچہے حکیم یوپ سے
ہند و یوناں ہیں جسکے حلقہ بگوش

کیا یہی ہے معاشرت کا کمال
مرد بیکار و زن تہی آغوش

১। শাসকবর্গ সহস্রবার একে ঠিক করেছেন; কিন্তু নারীর এই সমস্যা রয়ে গেছে যেই সেই।
২। এই অনিষ্টের অপরাধভার নারীর নয়; তার ভদ্রতা-সম্ভ্রমের সাক্ষী চন্দ্র ও প্রাতঃবায়ূ।
৩। পাশ্চাত্য সমাজে বিপর্যয় সুস্পষ্ট। কেননা পুরুষ শূন্য; সে অসহায় চেনে না নারীকে।
৪। ইউরোপের বিজ্ঞজনকে কেউ জিজ্ঞাসা করুন, যার অনুকরণপ্রিয় ভারত মহাদেশ ও গ্রিক।
৫। এটাই কী সমাজের চরম উন্নতি, পরম যোগ্যতা; পুরুষ বেকার আর নারী রিক্তবন্ধন শূন্যকোল।

ইকবাল পর্দার সমর্থনে বলেন, পর্দা নারীর জন্য বাধা নয়। সে পর্দায় থেকে সকল জায়েয কাজকর্মে অংশ নিতে পারে। পালন করে যেতে পারে নিজের দায়িত-কর্তব্যগুলো। কারণ, জগৎস্বামী মহান সৃষ্টিকর্তা অন্তরালে থেকেই বিশ্বভূবনের কাজকর্ম পরিচালনা করেন। তার মহান সত্তা যেন পবিত্র পর্দাবৃত। কিন্তু তার গুণাবলি ও রহমতের ছায়া জল-স্থল সর্বত্র বিস্তৃত। মাওলানা আলী যথার্থই বলেছেন–

بے حجابی یہ کہ ہر شے سے ہے جلوہ آشکار
اس پر پردہ یہ کہ، صورت آج تک نہ دیدہ ہے

"বেপর্দা হল, প্রত্যেক জিনিসের দ্যুতি প্রকাশিত হওয়া
আর পর্দা হল, আজও যে রূপ-দৃশ্য অদেখা।"

আল্লামা ইকবাল নারীদের উদ্দেশ্যে বলেন –

جہاں تابی ز نور حق بیاموز
کہ او باصد تجلی در حجاب است

তিনি পর্দা প্রথার বিরোধীদের জবাবে বলেন, পর্দা শরীরের আবরণ। কিন্তু এ নারীর উন্নতি-অগ্রগতি, উঁচু গুণাবলি এবং প্রচ্ছন্ন সম্ভাবনার জন্য কিভাবে অন্তরায় বলা যেতে পারে। মূল প্রশ্ন চেহারা বা মুখের উপর পর্দা থাকা বা না-থাকা নয় বরং মূল কথা হল, ব্যক্তিত্ব ও প্রকৃত সত্তার উপর যেন পর্দা না-পড়ে। মানুষের আত্মমর্যাদা জাগ্রত ও প্রকাশিত হয়।

بہت رنگ بدلے سپہر بریں نے
خدایا یہ دنیا جہاں تھی وہیں ہے

تفاوت نہ دیکھا زن و شو میں میں نے
وہ خلوت نشیں ہے یہ جلوت نشیں ہے

ابھی تک ہے پردے میں اولاد آدم
کسی کی خودی آشکارا نہیں ہے

পর্দার গুরুত্ব ও সমর্থনে ইকবাল “খিলওয়াত” (নির্জনতা) শিরোনামে একটি কবিতা রচনা করেছেন। যার মর্মার্থ হল, পর্দার কারণে নারীর একাগ্র হয়ে নিজের যোগ্যতাগুলোকে সন্তান প্রতিপালনে নিয়োজিত করা এবং নিজের ব্যক্তি সত্তার সম্ভাবনাগুলোকে বুঝার সযোগ হয়। সেইসঙ্গে সামাজিক কলুষতা থেকে দূরে থেকে নিজের ঘর-সংসার ও পরিবার বিনির্মাণের উপাদান সহজলভ্য হয়। ঘরের শান্তি-সুখের নির্মল পরিবেশে জীবনের প্রয়োজনাদী, সমস্যাবলি ও সামাজিক বিষয়গুলো নিয়ে চিন্তা-ভাবনা ও উপলব্ধির অবকাশ পায়। এভাবে সে নিজের এবং অন্যের জন্য উত্তম কাজকর্ম করতে পারে।

رسوا کیا اس دور کو جلوت کی ہوس نے
روشن ہے نگہ آئینہ دل ہے مکدر

بڑھ جاتا ہے جب ذوق نظر اپنی حدوں سے
ہو جاتے ہیں افکار پراگندہ و ابتر

آغوش صدف جسکے نصیبوں میں نہیں ہے
وہ قطرۂ نیساں کبھی بنتا نہیں گوہر

خلوت میں خودی ہوتی ہے خود گیر و لیکن
خلوت نہیں اب دیر و حرم میں بھی میسر

বড় একটি সামাজিক প্রশ্ন হল, নারী-পুরুষের সম্পর্কে শ্রেষ্ঠত্ব বা কর্তৃত্ব থাকবে কার? কারণন, পৃথিবীতে যে কোনও সম্পর্কের মধ্যেই কোনও

একপক্ষ অবশ্যই শ্রেষ্ঠত্ব বা কর্তার আসনে সমাসীন থাকে। এটা এমন এক বিশ্বজনীন বাস্তবতা, যেখানে প্রতিটি বস্তু এবং প্রত্যেক মানুষ একে অন্যের মুখাপেক্ষী। প্রত্যেকেই একে অন্যের পরিপূরক। বিশেষত পুরুষ ও নারীর পারস্পরিক সম্পর্কে কয়েকটি বিষয়ে নারীর উপর পুরুষের অগ্রাধিকার রয়েছে। আর তাও কোনও বংশীয় ও শ্রেণীগত পার্থক্য বা বৈষম্যের কারণে নয় বরং খোদ নারীর সৃষ্টিগত শারীরিক পার্থক্য আর জন্মগত স্বভাব-প্রকৃতির দিক বিচারে তার সকল অধিকার ও কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রেখে। তত্ত্বাবধান, দেখাশোনা ও ব্যবস্থাপনা এমন জিনিস নয়, যা পুরুষ ও নারী উভয়ের কাঁধে ন্যাস্ত করা যায় কিংবা কেবল নারীকে সোপর্দ করা যাবে। আল্লামা ইকবাল রহ. পাশ্চাত্য বিশ্বের নামসর্বস্ব "নারী স্বাধীনতা" র' ভ্রুক্ষেপ না করে নারীদের সম্পর্কে ইসলামী শিক্ষামালার জোরাল ওকালতী করেছেন। তিনি "নারীর নিরাপত্তা" শিরোনামে লিখেছেন–

اک زندہ حقیقت میرے سینے میں ہے مستور
کیا سمجھے گا وہ جسکی رگوں میں ہے لہو سرد

نے پردہ نہ تعلیم، نئی ہوکہ پرانی
نسوانیت زن کا نگہبان ہے فقط مرد

جس قوم نے اس زندہ حقیقت کو نہ پایا
اس قوم کا خورشید بہت جلد ہو ازرد

১। এক জীবন্ত বাস্তবতা মোর বক্ষে লুকায়িত ; বুঝবে কি সে তা, যার ধমনীতে রক্ত শীতল হিমায়িত।
২। নারীত্ব পর্দায়, নয় শিক্ষায়, অধুনা হোক কিংবা প্রাচীন; নারীর রক্ষক কেবল পুরুষ।
৩। এ জীবন্ত বাস্তবতা পায় নি যে জাতি, অতি শীঘ্র হবে ধূলিমলিন সে জাতির ভাগ্যরবি।

এ কবিতাখানা বস্তুত হাদীস রাসূল (সা.) لن يفلح قوم ولوا عليهم إمرأة -এর অমূল্য ব্যাখ্যা। তিনি তার অপর একটি কবিতায় বলেন–

جوہر مرد عیاں ہوتا ہے منت غیر
غیر کے ہاتھ میں ہے جو ہر عورت کی نمود

راز ہے اس کے تپ غم کا یہی نکتئہ شوق
آتشیں لذت تخلیق سے ہے اس کا وجود

کہلتے جاتے ہیں اسی آگ سے اسرار حیات
گرم اسی آگ سے معرکئہ بود و نبود

میں بہی مظلموں مئی نسواں سے ہوں غمناک بہت
نہیں ممکن مگر اس عقیدئہ شکل کی کشود

১। পুরুষের রত্ন-পৌরুষ প্রতিভাত হয় তার ক্লেশমুক্ত শ্রমে; নারীর রত্নমানিক গুণের বিকাশ পরের হাতে।

২। তার দুঃখ-তাপের রহস্য তো এই প্রেমের তত্ত্ব, সৃষ্টিশীলতার স্বাদের অগ্নিতে যার অস্তিত্ব।

৩। এ আগুনেই তো খুলে যায় জীবনের জটিল রহস্য। থাকা না-থাকার রণাঙ্গন উত্তপ্ত হয় এ আগুনেই।

৪। আমিও ব্যথিত নিদারুণ নির্যাতিতা নারীদের লাগি, সম্ভব নয় তবে এই প্রকৃতির আকীদার মূলোৎপাটন।

আল্লামা ইকবাল "জান্নাত মায়েদের পদতলে" এ হাদীসখানারও উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি মাতৃত্বকে বলেছেন রহমত। একে উপমা দিয়েছেন নবুওয়াতের সঙ্গে। মায়ের স্নেহ-মমতাকে তিনি নবী সা. এর স্নেহের কাছাকাছি বলেন। কেননা এর দ্বারাও জাতির জীবন-চরিত গঠিত হয়। অস্তিত্ব লাভ করে একটি গৌরবময় জাতি।

آں یکے شمع شبستان حرم = حافظ جمعیت خیر الامم
سیرت فرزندہا از امہات = جوہر صدق و صفا از امہات
آنکئہ نازد برو جودش کائنات = ذکر او فر مود باطیب و صلوۃ
گفت آں مقصود حرف کن فکاں = زیر پائے امہات آمد جناں
نیک اگر بینی امومت رحمت ست = زانکہ اورا بانبوبت نسبت ست
شفقت او شفقت پیغمبرا ست = سیرت اقوام را صورت گر است
از امومت پختہ تعمیر ما = در خط سیمائے او تقدیر ما
آب بند کل جمعیت توئی = حافظ سرمائیہ ملت توئی
ہوشیار از دست بردروزگار = گیر فرزندان خود را در کنار

অবশেষে বলতে চাই, আল্লামা ইকবাল রহ. হযরত ফাতেমা রাযি.কে মুসলিম উম্মাহর মায়েদের জন্য আদর্শ রমণী জ্ঞান করতেন। জায়গায় জায়গায় তাকে অনুসরণের তাগিদ করেছেন। আহা! কিভাবে তিনি যাতা পিষেও কুরআন পড়তে থাকতেন। গৃহস্থলীর কাজকর্মে এবং মশক (বর্তমানে যেমন কলসি) বহনেও ধৈর্য ধারণ করতেন। ইকবালের ভাবনামতে এই পরিপক্ক চরিত্রের কারণেই তার কোলে লালিত-পালিত হন হযরত হাসান-হুসাইন রাযি.।

مزرع تسلیم را حاصل بتول = مادراں را اسوہ کامل بتول

آں ادب پروردئہ صبر و رضا = آسیا گرداں ولب قرآں سرا

فطرت تو جذبہ ہا دار و بلند = چشم ہوش از اسوئہ زہرا مبند

تاحسینے شاخ تو بار آرد = موسم پیشیں بہ گلزار آورد!

তিনি মুসলিম নারীদেরকে অসিয়ত করে বলেন–

اگر بندے ز درویشے پزیری = ہزار امت بمیرد تو نہ میری

"তুমি যদি এক দরবেশের উপদেশ গ্রহণ করো, তবে আমাকে নয় হাজার উম্মত তুমি জন্ম দেবে।"

আল্লাহ পাক তোমাকে বহুমুখী সুযোগ দিয়েছেন। জাতির সেবা ও খেদমতের এমন সুযোগ দিয়েছেন, যা অপরাপর অনেক শ্রেণীকেই দেননি। আল্লামা ইকবাল বলেন, ঘরে অবস্থান নাও এবং এক শাব্বীর (হযরত হুসাইন রাযি. এর উপাধি) কে লালন-পালন করো।

بتول باش وپنہاں شو ازیں عصر

کہ در آغوش شبیرے بگیری

হুসাইন রাযি. এর মত দৃঢ়চিত্ত, অবিচল, দুর্দম-দুর্জয় মুজাহিদ তৈরী করো। আরও বলেন, যাতা ঘুরানো আর আল্লাহর নাম নেওয়া অর্থাৎ হাতে যাতা ঘুরানো হবে আর মুখে থাকবে আল্লাহর যিকির –এটাই মুসলিম নারীদের বৈশিষ্ট্য। ঘরে তার জীবন যেমনই হোক, অভাবের জীবন হোক চাই স্বচ্ছলতার, সেবার জীবন হোক চাই মেহনত-পরিশ্রমের কিংবা সাদাসিধে জীবনই হোক, কিন্তু সর্বাবস্থায় হাসি-খুশি ও সন্তুষ্ট-পরিতৃপ্ত এবং আল্লাহর নাম নিতে থাক। জাতির সেবায়, বংশ-গোত্রের সেবায় এবং নিজের ঘর-সংসারে ও একে উন্নতি দানে অন্তর-আত্মায় মগ্ন থাক। মহান

আল্লাহর কাছে মুনাজাত করি, আল্লাহ্ পাক যেন মুসলিম পরিবার, মুসলমান ঘরগুলোতে এমন এমন কন্যা তৈরী করে দেন, যারা হবে উত্তম ও আদর্শ মা, আদর্শ বোন ও আদর্শ কন্যা। জাতির সেবক, আল্লাহ্কে স্মরণকারী, কৃতজ্ঞ, খাঁটি ঈমানদার, পুণ্যবান, সৎকর্মশীলা, অল্পেতুষ্ট ও পুতঃপবিত্র। এসবই মহান আল্লহ মুসলমান নারীদের প্রশংসায় বলেছেন এবং আরও অনেক শব্দ ব্যবহার করেছেন। ঈমানদার নারীকে কানিতাত (অল্পে তুষ্ট) বলেছেন, সালিহাত (সৎকর্মশীলা) বলেছেন। তাইয়িবাত (পুতঃপবিত্র) বলেছেন। আরও বলেছেন, الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات (পবিত্র নারীগণ পবিত্র পুরুষের জন্য আর পবিত্র পুরুষ পবিত্র নারীদের জন্য) এগুলো কুরআনিক শব্দ। আল্লাহ্পাক আপনাদেরকে এর যোগ্য বানান। প্রকৃত অর্থেই আপনারা এ অভীষ্ট লক্ষ্য হন।

মানব সমাজ বরং মানব জীবন নারী-পুরুষের সমন্বয়ে

আল্লাহর রহমত পুরুষ-নারী উভয়ের উপর ব্যাপৃত।

فا ستجاب لهم ربهم أنى لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او أنثى بعضكم من بعض-

"তাদের দু'আকে তাদের প্রতিপালক কবুল করে নিয়েছেন। কারণ, আমি তোমাদের মধ্য থেকে কোনও আমলকারীর (চাই) পুরুষ হোক বা নারী, নষ্ট হতে দেই না। তোমরা পরস্পরে একে অন্যের অংশ। (সূরা আলে ইমরান–১৯৫)

আল্লাহ তা'আলা প্রথমে ঈমানদারগণের দু'আসমূহের বর্ণনা দিয়েছেন। সেসব ঈমানদার মন খুলে খুব দু'আ করেছে। সাধারণ দু'আ ছিল না। ছিল নিতান্তই মুমিনসূলভ দু'আ। পুরুষচিত দু'আ। এখানে "পুরুষচিত" শব্দটি আমি জেনে-বুঝেই ব্যবহার করেছি।

ربنا إننا سمعنا مناديا ينادى للايمان آن آمنوا بربكم فامنا

একটি পুরুষচিত দু'আ।

ربنا فاغفرلنا ذنوبنا وكفرعنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار- ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد

এরূপই উচ্চ সাহসিকতার দু'আ ছিল। তারা আরও একটি কথা বলেছিল, مناديا ينادى للايمان আমরা এক আহ্বানকারীকে, তোমার এক প্রার্থণাকারীকে পার্থনা করতে শুনেছি, امنوا بربكم –আপন প্রতিপালকের উপর ঈমান আনো। فامنا তারপর আমরা ঈমান এনেছি। وكفرعنا سيئاتنا –আমাদের গুনাহসমূহকে মাফ করো; আমাদের পাপগুলো ক্ষমা করো।

বলা বাহুল্য, এসব দু'আতে আমাদের মন পুরুষদের প্রতিই ঝুঁকে হয়ে যাবে। আহ্বানকারী ও গ্রহণকারী পুরুষ। আর আমি বলি, সামনে সামনে

অবস্থানকারী এবং তাকে পুরুষচিত লাব্বাইক (আমি হাজির আছি) উক্তিকারী পুরুষ ছিল –তবে এটাও সঠিক। কিন্তু মহান আল্লাহ তা'আলা যখন প্রতিদান এবং দু'আসমূহ কবুলের আলোচনা করেন, তখন পুরুষদের (তথা পংলিঙ্গের শব্দের) সাথে করেন। অথচ সেখানে কোনও পার্শ্বইঙ্গিত ও নিদর্শন নেই, বিশেষভাবে নারীদের কথা উল্লেখ করেন, আরেক জাতি, দুর্বল কোমল জাতির কথাও উল্লেখ করেন, فاستجاب لهم ربهم দু'আ প্রার্থণাকারী পুরুষ এবং বলেন, আল্লাহ তা'আলা তাদের দু'আ কবুল করেছেন।

এখানে যদি কোন কবি-সাহিত্যিক হতেন, কোন প্রবন্ধকার-কলামিষ্ট হতেন, কোন দার্শনিক কিংবা কোন অভিজ্ঞ মনোস্তাত্ত্বিক হতেন, বড় কোন নারী স্বাধীনতাকামী ও আন্দোলনকারী নেতা হতেন, তাহলে আমি নিশ্চিত যে, তিনি এখানে নারীদের কথা ভুলে যেতেন। কি সুযোগ ছিল! কি আলোচনা ছিল? সকল দু'আই পুরুষরা করেছে এবং সকল কাজেই পুরুষরাই অগ্রগামী ছিল। কিন্তু মহান আল্লাহ তা'আলার রহমত দেখুন! তিনি পুরুষ-নারী উভয় জাতিরই সৃষ্টিকর্তা। উভয়ের প্রতি তার একই রকম রহমতের দৃষ্টি। তিনি রাব্বুল আলামীন– উভয় জগতের সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা ও রক্ষাকর্তা। فا ستجاب لهم ربهم أنى لا اضيع عمل عامل منكم তাদের প্রতিপালক তাদের দু'আ কবুল করেছেন এবং জবাব দিয়েছেন, কোন আমলকারীর আমল আমি নিষ্ফল করি না। এখানে عامل (আমেল-কর্মকারী) শব্দটি পুংলিঙ্গ। এপর্যন্ত একান্ত পুরুষের আলোচনা ছিল। لا اضيع عمل عامل منكم আমি তোমাদের মধ্য থেকে কোন আমলকারীর আমলকে, কোন পরিশ্রমকারী শ্রমিকের শ্রমকে, কোন প্রচেষ্টাকারীর চেষ্টাকে, কোনও কুরবানীদাতা-আত্মত্যাগীর কুরবানী ও আত্মত্যাগকে আমি নিষ্ফল-পণ্ড করি না। من ذكر او أنثى এখানে এসে পরিষ্কারভাবে নারীদের কথা উল্লেখ করেছেন এবং তাদের সম্মান ও মর্যাদা দান করেছেন। সে আমলকারী, সেই দু'আকারী পুরুষ হোক চাই নারী।

আল্লাহর রহমত ও ক্ষমায় পূর্ণ সমতা

আমি পূর্ণ দৃঢ়তা ও জোর গলায় বলছি, অন্য কোনো জিনিসে সমতা থাক চাই না থাক আবার কিছু ক্ষেত্রে সমতা, ইসলামী শরী'অত দ্বারা সংরক্ষণ এবং মানবিক স্বভাব-প্রকৃতি চেনার উপর নির্ভরশীল অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা কাজ নেওয়া হয়। কিন্তু একটি জিনিস নিঃসঙ্কোচেই বলা যায়, আল্লাহর রহমত ও তার দয়া-ক্ষমার মধ্যে পরিপূর্ণ সমতা রয়েছে। এখানে কোনও

সংরক্ষণ নেই। কোনও প্রকার পার্থক্য নেই। কোনও ধরনের রিজারভিশন নেই। আর তার প্রমাণ আয়াতে কারীমা فا ستجاب لهم ربهم –এর আশপাশ ও পার্শ্ব-ইঙ্গিত পুরোপুরি লক্ষ্য করুন, চোখ খুলে যাবে। কুরআনিক অলৌকিকতা পেরিয়ে মানুষ রহমতে ইয়াযদানী বা শুধু খোদার রহমতের প্রবক্তা হয়ে যাবে। কেউ নেচে উঠবে আনন্দে। কারও উপর উন্মত্তার অবস্থা ছেয়ে যাবে আর বিশেষ করে আমি আমার প্রিয় বোনদের বলছি– যদি তাদের উপর উন্মত্ততার অবস্থা ছেয়ে যায়, যদি কোনও বড় কৃতজ্ঞতার মুহূর্তে আত্মবিস্মৃতির অবস্থা প্রকাশিত হয়ে যায় এবং তার শরীরের সূক্ষ্ম লোম থেকে শোকর ও কৃতজ্ঞতার তাড়না বের হয় বরং উপচে পড়ে, তথাপি সম্পূর্ণ ঠিক ও যথাযথ আছে। এখানে কোনও অবকাশ ছিল না। পুরুষগণ (আল্লাহপাক তাদের ক্ষমা করুন) নিজের দু'আগুলোতে তাদের বোনদের কথা উল্লেখ করে নি। নিজের মায়ের কথাও বলে নি। অথচ মা তো মা-ই। তারা দু'আ করেছিল একান্ত নিজের জন্য। সকল যমীর (সর্বনাম) এখানে পুংলিঙ্গের। কিন্তু ওই রাব্বুল আলামীনের রাব্বুল আলামীনী দেখুন, তার রহমাতুল লিল আলামীনী দেখুন। লক্ষ্য করুন! তিনি কেমন সৃষ্টিকর্তা, কেমন পালনকর্তা, উভয় জাহানের প্রতি কেমন রহমতকারী এবং অপার দয়ালু দাতা! তিনি ঘোষণা করলেন, فا ستجاب لهم ربهم أنى لا اضيع عمل عا مل منكم من ذكر او أنثى

আর তারপর দয়া-ভালবাসা জাগাচ্ছেন بعضكم من بعض তোমরা ভুলে গেলে কেন অর্থাৎ যেন সতর্ক করা হল সেসব দৃ'আকারী পুরুষদেরকে– তোমরা তোমাদের শরীরের এত বড় অংশকে, মানবজীবনে এতবড় এক শক্তিকে তোমরা কেন ভুলে গিয়েছিলে? কেন তোমরা আপন জীবনের অবিচ্ছেদ্য ও অনিবার্য অংশকে ভুলে গিয়েছিলে? তোমরা তো ভুলে গেলে ঠিক; কিন্তু আমি ভুলি নি। তোমরা শতাধিকবার ভুলে যাও, হাজারবার ভুলে যাও। কিন্তু আমি ভুলে যাওয়ার নই। فى كتاب لا يضل ربى ولا ينسى বলে যখন হযরত মূসা আ. জবাব দিলেন, তখন তার মহান প্রতিপালক ঘোষণা দিলেন, أنى لا اضيع عمل عامل منكم আমি তোমাদের কোনও আমলকারীর আমল (কোন শ্রমিকের শ্রম) পণ্ডকারী নই। পার্শ্ব-ইঙ্গিত ছাড়া পরিষ্কার বলেন, من ذكر او أنثى চাই সে আমলকারী পুরুষ হোক বা নারী। কি বিস্ময়ের কথা! তোমরা হয়েছোই তো একে অপর থেকে। তোমরা একে অন্যের থেকে অমুখাপেক্ষী ও প্রয়োজনমুক্ত

নও। মানবসমাজ কিংবা মানবজীবন গঠিতই হয়েছে এই দুই শক্তির সমন্বয়ে; সম্ভবই নয় এতদুভয়ের বিচ্ছিন্নতা ও পৃথকীকরণ।

আমলের ফলাফল দুনিয়ায়ও পাবে; পরকালেও

আমার মন যখন উক্ত আয়াতে কারীমার প্রতি নিবদ্ধ হয়েছে, তখন মর্ম ও বিষয়বস্তুর বিশাল এক ভাণ্ডার সম্মুখে এসে গেছে, لا اضيع এর ব্যাপকতা ও এর অসীমতা দেখুন! তিনি এখানে لا اضيع عمل عامل منكم বলেছেন অর্থাৎ আমি তোমাদের কোনও আমলকারীর আমলকে নিষ্ফল-পণ্ড করব না। এখানে আরবী اضاعت শব্দ ব্যবহার হয়েছে অর্থাৎ এই চেষ্টা-শ্রমের ফলাফল এই দুনিয়াতেও প্রকাশ পাবে এবং পরকালেও প্রকাশ পাবে। এ আয়াত দুনিয়া-আখেরাত (ইহজগত ও পরকাল) উভয়ের উপর পরিব্যাপ্ত। আয়াত একথা বলছে না যে, নারীরা ইবাদত-বন্দেগী করে তো দুনিয়ায় কোনও ফল পাবে না, মেহনত করবে আমলের জন্য আর আমল হাসিল হবে না, মেহনত করবে তরবিয়াত-আত্মশুদ্ধি ও লালন-পালনে আর তার সুফল লাভ হবে না; শ্রম দিবে জীবনকে আনন্দময়, সুখকর, অর্থবহ ও চমকপ্রদ করতে আর তার ফলাফল বের হবে না; সকল প্রতিদান পরকালের জন্য জমা করে রাখা হবে– বিষয়টি এরূপ হবে না বরং যে ক্ষেত্রে, যে ময়দানে তোমরা মেহনত করবে ও শ্রম দিবে, তাতে তোমরা সেই মেহনত ও শ্রমের ফলাফল দেখতে পাবে।

নারীরাও ওয়ালী হয়

বেলায়েত বা ওয়ালী হওয়ার ক্ষেত্রে পূর্ণ ঠিকাদারী পুরুষদের হওয়াই খুব স্বাভাবিক ছিল। কারণ, বেলায়েতের ময়দান, আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্যতার ময়দান বিরাট বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত আর পুরুষদের সাথে এর কিছুটা মিল আছে। মুজাহাদা করা, শ্রম-সাধনা করা, জিহাদ করা, সারারাত বিনিদ্র নামায পড়া, রোযা রাখা –এসব পুরুষদের জন্য সহজ। নারীদের অনেক জাতিগত বৈশিষ্ট্যও আছে, নারীসুলভ আচরণ আছে, অনেক ধরনের গৃহস্থলীর কাজ ও পারিবারিক দায়িত্ব আছে। সন্তান লালন-পালনের ব্যাপার আছে। কোনও বাচ্চাকে নিজের সাথে শোয়াতে হয়। বাচ্চাকে মধুর ঘুম পাড়াতে হয়। শিশুর রোগ-ব্যাধির সেবা-শুশ্রূষা করতে হয়। তার পক্ষে এত ইবাদত-বন্দেগী করা সম্ভব কোথায়, যতখানি সম্ভব পুরুষের জন্যে! সে মসজিদ থেকে আস্‌ল আর ঘুমিয়ে পড়ল কিংবা মসজিদেও গিয়ে শুয়ে পড়ল, সারারাত ইবাদত করবে। বেলায়েতের ক্ষেত্রে হতে পারত, আমরা

পুরুষ-ওয়ালী-আল্লাহ সম্পর্কে অবগত হতাম আর কোন নারীর নামও (এমন ওয়ালীয়া) শুনতে পেতাম না। যদি আমাদের মনীব আব্দুল কাদির জিলানীর উচ্চধ্বনি, তার ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা, মহান আল্লাহর দরবারে এবং সাধারণ মানুষ ও সৃষ্টিজীবের কাছে তার গ্রহণযোগ্যতা তার বেলায়েতের যে খ্যাতি বিশ্বজুড়ে রয়েছে, যেখানে পূর্বের উম্মতগুলোর মধ্য থেকে কোন ওয়ালী-আল্লাহর নাম সংরক্ষিত নেই। অধিকন্তু যদি আব্দুল কাদির জিলানী (রহ.) এর শতভাগ খ্যাতি অর্জন হয়ে থাকে, তবে আমি বলব এবং এতে বেয়াদবীও মনে করি না যে, পঁচিশ ভাগ খ্যাতি হযরত রাবেয়া বসরিয়া (রহ.) এরও অর্জিত হয়েছে। আর আপনারা এ প্রান্ত থেকে ওপ্রান্তে চলে যান। দেখবেন, হযরত আব্দুল কাদির জিলানীকে তারা শিশু বাচ্চা মনে করে। এটা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়। কবির ভাষায়–

ابن سعادت بزور بازو نیست – تنه بخشد خدائ بخشده

পৃথিবীর কোনায় কোনায় গিয়ে দেখুন! যেখানে চারজন মুসলমান বাস করেন, সেখানে সাইয়্যিদুনা আব্দুল কাদির জিলানী (রহ.) এর নাম কোনোভাবে চাই তার উপর শরঈ দৃষ্টিকোণ থেকে কোনো কড়াকড়ি ও বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হোক এবং তার সম্পর্কে সমালোচনাই করা হোক, তবু বিভিন্ন নামে তাকে পৃথিবীতে স্মরণ করা হয়। আমি বলি, দ্বিতীয় নম্বরে, রাবেয়া বসরিয়ারও এই একই অবস্থা। প্রত্যেক লেখাপড়া জানা শিক্ষিত ব্যক্তি অন্তত রাবেয়া বসরিয়া সম্পর্কে তো অবশ্যই জানেন। এটা ইবাদত, রিয়াযাত ও শ্রম সাধনার ব্যাপার।

নারী ইসলামের সমাজ ও পরিবার ব্যবস্থা এবং জাতীয় সকীয়তার রক্ষক

সম্মানিত রমণী ও প্রিয় বোনেরা! ইসলামী সূচনালগ্ন থেকে ইসলামকে একটি কার্যকরী ব্যবস্থার মতো পৃথিবীতে সফল প্রমাণিত করা এবং এর বাস্তবিক প্রদর্শণী (Demonstration) দেখাতে নারীদের যে ভূমিকা ছিল, তা ভুলা বা মুছে দেওয়া যাবে না। কোনো ধর্ম, কোনো ব্যবস্থা বিশেষ করে কোনও সমাজ (Society) তখন পর্যন্ত সফল হতে পারে না এবং বেশিদিন টিকে থাকতে পারে না, যে পর্যন্ত না নারীজাতি তাদের সাথে পুরোপুরিভাবে নিজের একাগ্রতা ও একাত্মতা প্রকাশ করবে। সাথে সাথে নিজের কৃতজ্ঞতা, দায়িত্ববোধ ও সম্পৃক্ততার প্রমাণ দিবে। এটা কেবল ইসলামের ইতিহাসের নয় বরং গোটা পৃথিবীর তাবৎ ইতিহাসের এক বিরাট জিজ্ঞাসা যে, ইসলামী

সমাজ এতদিন পর্যন্ত আপন বৈশিষ্ট্যাবলী ও স্বমহিমায় কিভাবে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে? অথচ এর সংঘাত রয়েছে পৃথিবীর বিভিন্ন সভ্যতা, চরম উন্নত সভ্যতা-সংস্কৃতি এবং চরম উন্নত ও ব্যাপৃত আইন-কানুন (রোমান আইন, পেট্রিয়ট আইন ও হিন্দু আইন) এর সঙ্গে। আরবদের সীমাবদ্ধ জীবন এবং ইসলামের সাদাসিধে নির্মলতা কিভাবে সেসব জটিল-কুটিল, সেসব উন্নত ও সূক্ষ্ম স্পর্শকাতর আইনগুলো এবং এমন সমাজ ব্যবস্থার (ঝড়পরধষ ঃুংঃবস) সঙ্গে লড়াই করেছে, যার উপর কয়েক শতাব্দী নয় রবং হাজার হাজার বছরের মেধা-শ্রম ব্যয় হয়েছে। এর জবাব হচ্ছে, এই কঠিন ও জটিল স্পর্শকাতর কাজে আমাদের বোনেরা পুরোপুরিভাবে কো-অপারেশন করেছে এবং সাহায্য-সহায়তা করেছে। উমারা ও শাসকবর্গ, সুলতান ও বাদশাগণ, ইসলামী সৈন্যবাহিনীর কমাণ্ডারগণ ইসলামী সমাজ, ইসলামী স্বকীয়তা এবং ইসলামী সভ্যতা-সংস্কৃতির সংরক্ষণ করতে পারত না– যদি না আল্লাহভীরু সম্ভ্রান্ত, পুণ্যাত্মা, অটল ঈমানের অধিকারিণী নারীগণ ইসলামী সভ্যতা-সংস্কৃতি ও ইসলামী স্বকীয়তা রক্ষায় এবং এর স্থায়ীত্বের জন্য পুরুষদের পাশাপাশি পূর্ণ সহযোগিতা (Co-operation) করত, তারা যদি ইসলামের পরিবার ব্যবস্থা ও ইসলামিক পারিবারিক আইন (পার্সনাল 'ল') প্রতিষ্ঠা এবং এভাবে ইসলামিক পরিবার গঠনে, যা ইসলামী শিক্ষা দীক্ষার আলোয় সাফল্যের স্বর্ণশিখরে আরোহন করে এবং যেখানে পবিত্রতা, নির্মলতা, প্রেম-ভালবাসা ও শান্তি-নিরাপত্তার পরিবেশ হবে, তাতে পুরুষদের হাত শক্ত না করত; যদি আল্লাহর সম্মানিতা, সৎ ও নেককার ইসলামী স্বকীয়তার রক্ষক বান্দিরা তাদের সম্মানিত-সম্ভ্রান্ত পুরুষদের সাহায্য না করত এবং তাদেরকে আশ্রয় ও শক্তি না যোগাত, তা হলে মুসলমানদের পক্ষে নিজেদের ইসলামী স্বকীয়তা, বৈশিষ্ট্য ও ইসলামী সভ্যতা-সংস্কৃতি নিয়ে টিকে থাকা কঠিন ছিল।

তাদের পেছনে বড় বড় শক্তিশালী শাসনযন্ত্র এবং অতিউত্তম ও উন্নত সভ্যতা-সংস্কৃতিই থাকত, অত্যন্ত প্রশস্ত গভীর শিক্ষা ব্যবস্থা থাকত এবং ধন-সম্পদের ভাণ্ডার সমূহই থাকত না কেন– তদুপরি ইসলামী সমাজ আপন বৈশিষ্ট্যাবলী ও মহিমা নিয়ে, আত্মনির্ভরতা, উঁচু মূল্যবোধ ও উৎকৃষ্টতার অনুভূতি নিয়ে অটুট-কায়েম থাকতে পারত না। যতক্ষণ পর্যন্ত না বোনেরা তার ভাইদের, আপন পিতামাতা এবং ইসলামী সমাজের পথপ্রদর্শক দিশারীদের হাত শক্ত না করত এবং তাদের সঙ্গ না দিত। পূর্ণ সহায়তা না করত, সেসব নারীর কেবল ইসলমী স্বকীয়তা রক্ষায়ই নয় বরং ইসলামী অস্তি ত্বের স্থায়ীত্বেও বিরাট ভূমিকা রয়েছে। তাদের কারণে মুসলমান আপন

পৃথিবীতে আপন বৈষিষ্ট্যাবলীসহ টিকে রয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রে (যেখানকার সভ্যতা-সংস্কৃতি, আইন-কানুন, সমাজ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল) মুসলমান আপন মহিমা ও স্বকীয় জীবন-পদ্ধতিসহ বর্তমান আছে। তাদের কৃতিত্ব, তাদের আত্মত্যাগ, কুরবানী ও ঈমানী চেতনার ফলে এই দ্বীন-ধর্ম তার সভ্যতা-সংস্কৃতি, তার সামাজিকতা, নৈতিকতা, চরিত্র, তার মর্যাদা-মহিমা, চিন্তাধারা (ঠধষঁবং্ রফবধং) ও আদর্শসহ আমাদের পর্যন্ত সঠিক ও নিরাপদভাবে পৌঁছে গেছে। এটি এক ঐতিহাসিক বাস্তবতা, যা আমি অতি সংক্ষেপে আপনাদের সামনে বর্ণনা করেছি।

তা'মীরে হায়াত / ২৫ এপ্রিল, ১৯৮৬ খ্রিঃ

কুরআনে কারীমে নারীর সম্মান

কুরআনে নারীদের নামে পৃথক একটি সূরা

আমার প্রিয় বোনেরা! এর চেয়ে বড় পাওয়া আর কি হতে পারে? স্বয়ং কুরআন মাজীদের বড় সূরাগুলোর মধ্যে একটি সূরার নামই নারীদের নামে রাখা হয়েছে, 'সূরা নিসা'। কোনও হিন্দু ধর্মজ্ঞানী কি বলতে পারবেন– তার ধর্মে এবং তার কোনও পবিত্র গ্রন্থে নারীদের উপর কেউ লিখেছে কিংবা এই শিরোনামে আলোচনা হয়েছে? কিন্তু যেখানে আছে একটি সূরা বাকারাহ, সূরা আলে ইমরান আর তারপর কুরআনে কারীমের সকল সূরা, সেখানে সূরা নিসাও রয়েছে এবং প্রথমদিন থেকে আজ পর্যন্ত এ নামেই চলে আসছে। এ সূরাটি নারীদের সম্পর্কে উন্নতি ও দ্বীনী জ্ঞানার্জন, ধর্মীয় উন্নতি ও তাতে স্বকীয়তা সৃষ্টি, আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি অর্জন ও তার দরবারে উচ্চ মর্যাদা লাভ এবং আল্লাহর প্রিয় বান্দা-বান্দী হওয়ার পুরোপুরি যোগ্যতা, পুরোপুরি সম্ভাবনা ও অবকাশ প্রথম শতক থেকে নিয়ে এখন পর্যন্ত বিদ্যমান এবং আজও তেমনি হতে পারে।

কুরআনে কারীম নারীদের উত্তম জীবনের জামিন

অনুরূপভাবে কুরআনে কারীম পবিত্র ও উত্তম জীবনের নানা ক্ষেত্রে উপায়-উপকরণ প্রদানের ব্যাপারেও পুরুষদের সাথে নারীদেরকে স্মরণ রেখেছে বরং তার নিশ্চয়তা প্রদান করে এবং তার অঙ্গীকার করে। 'হায়াতে তাইয়্যিবাহ' (পবিত্র জীবন) কথাটি অত্যন্ত সুদূর প্রসারী ও স্বয়ংসম্পূর্ণ বাক্য। যাতে আদর্শ ও সফল জীবনের মর্মার্থ এবং সম্মান ও আত্মপ্রশান্তির অপর্যাপ্ত অর্থ অন্তর্নিহিত রয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে–

من عمل صالحا من ذكر او أنثى وهومؤمن. فلنحيينه حيوة طيبة. ولنجزينهم اجرهم باحسن ماكانوا يعملون

"নেক আমল (সৎকর্ম) যেই করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, যদি সে ঈমানদার হয়, তাহলে অবশ্যই আমি তাকে এ পবিত্র জীবন দান করব।

আর আমি তাদেরকে তাদের সৎকর্মগুলোর বিনিময়ে উত্তম প্রতিদান দান করব।" (সূরা নাহ্‌ল– ৯৭)

من عمل صالحا আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতে অনেক বড় একটি সুসংবাদ শুনিয়েছেন। যে ভাল কাজ করবে আর এর মৌলিক শর্ত হচ্ছে, তা আল্লাহর হুকুম মোতাবেক হওয়া, কাজটি আল্লাহর মান্শা ও নির্দেশনা অনুযায়ী হওয়া। তাঁর রাসূল (সাঃ) এর প্রত্যাশা ও হুকুম মোতাবেক হওয়া। ধর্মীয় বিধান অনুযায়ী হওয়া। সর্বোপরি সর্বশেষ আসমানী কিতাব কুরআন মাজীদ অনুযায়ী হওয়া। তা হলে আমি তাকে উত্তম ও পবিত্র জীবন দান করব। এখানে দুনিয়াবী বা পার্থিব জীবনও এসে যায়। কাজেই ভাবা যাবে না যে, এতে কেবল পরকালীন সুসংবাদই দেওয়া হয়েছে। حيوة طيبة যারা আরবী জানেন, তারা বুঝেন– এখানে নাকেরা (অনির্দিষ্টতা জ্ঞাপক) শব্দ আনা হয়েছে; সুনির্দিষ্ট الحيوة الطيبة পর্যন্ত বলা হয় নি। فلنحيينه حيوة طيبة তথা আমরা তাকে সব ধরনের উত্তম জীবন দান করব। মানুষের সকল প্রচেষ্টা এজন্যই হচ্ছে– এই দৌড়-ঝাপ, এই চেষ্টা-শ্রম, এই রাত্রিজাগরণ, এই কিতাবাদি ও বই-পত্রের উপর শ্রম-সাধনা, প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত পড়া-পড়ানো, তারপর সেখান থেকে ডিগ্রি অর্জন, কারও ইঞ্জিনিয়ারিং-এর পথ ধরা, কারও সাহিত্য-নিবন্ধের পথ অবলম্বন, সবকিছুর মৌলিক ও আসল লক্ষ্য-উদ্দেশ্য একটিই অর্থাৎ উত্তম জীবন লাভ করা।

আর কী? মানুষ চায় বড় অঙ্কের বেতন, থাকার জন্য বিরাট বড় বিলাস ভবন, আরোহনের জন্য উন্নত মানের মোটরযান, উড়োজাহাজ ভ্রমণ, আবার রাজনৈতিক অঙ্গনে এলে প্রধানমন্ত্রী বা সংসদ সদস্য হয়ে যাওয়া। এসব এজন্যই করা হয়, যেন আমরা সুখ-শান্তি ও আরামের জীবন যাপন করতে পারি। একে সুখ বলি। সুখ একটি ব্যাপক শব্দ এবং বিরাট প্রশস্ত। আমরা যেন সুখী হই; দুখী না হই। আমরা সুখের জীবন যাপন করতে পারি। আল্লাহ তা'আলা এর নিশ্চয়তা দিয়ে ইরশাদ করছেন– এর একমাত্র পথ হল, নেক আমল করো, যদি আমার হুকুম মোতাবেক আমল হয়, فلنحيينه তাগিদের লামসহ বলেছেন। আরবীতে যখন কেউ বলতে চায়, 'অবশ্যই এরূপ হবে, অবশ্যই এরূপ করব', তখন একে - لنذهبن - لنعملن لنفعلن ওজনে ব্যবহার করা হয়। একথা আল্লাহ পাক বলছেন. এটা আল্লাহর কথা। খোদায়ী নির্দেশ। এতে সন্দেহের কী অবকাশ থাকতে

পারে? তবু আমাদেরকে নিশ্চয়তা দেওয়ার জন্য, নারী-পুরুষদেরকে আস্বস্ত করার জন্য বলেছেন, 'আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব।' আর কী চাই? পৃথিবীতে আর কিসের জন্য এই দৌড়-ঝাপ হচ্ছে? কি জন্য নিজের স্বাস্থ্য ও সুস্থতাকে বিপদের সম্মুখীন কর হচ্ছে? কেন এত দ্বন্দ্ব-সংঘাত আর যুদ্ধ-বিগ্রহ? সবই উত্তম জীবন যাপনের জন্য।

কাজেই এখন উত্তম জীবনের অর্থ কেউ ধরে নিয়েছে, বড় অঙ্কের বেতন-ভাতা। অথচ ভাল বেতনে উত্তম জীবন যাপন করা আদৌ নিশ্চিত নয়। এমন লক্ষ লক্ষ উদাহরণ দেওয়া যাবে যে, ভাল বেতন পাচ্ছে ঠিক; কিন্তু জীবন যাত্রা ভালো নয় বা স্বাস্থ্য খারাপ অথবা পরস্পর বিরাট অমিল রয়েছে কিংবা মনের প্রশান্তি নেই, কোনো ভয় আছে অথবা বিপদ আশঙ্কা রয়েছে অথবা এমন কোনো রোগ-ব্যাধি হয়ে গেছে, কোনো সমস্যা হয়ে গেছে কিছু একটা হয়ে গেছে, সন্দেহ হচ্ছে অথবা স্বাস্থ্য এত খারাপ হয়ে গেছে যে, ভাল বেতন, বিলাস ভবন, উন্নত মোটরযান সবই আছে, সন্তান-সন্ততি আছে, কিন্তু জীবনে তৃপ্তি আসছে না। নেয়ামত, যাকে জীবনের নেয়ামত বলা হয়, তা অর্জিত হচ্ছে না, তাহলে এটা বিরাট চিন্তার বিষয়। আল্লাহ পাক বলেন, যে ব্যক্তি আমার হুকুম-আহকাম মেনে চলবে, আমার শরী'আতের উপর আমল করবে, আমার রাসূল (সা.) এর আদেশ-নিষেধ মেনে চলবে; দেখবে না রূসম-রেওয়াজে কি হয় আর না দেখবে, কোন্ জিনিস বিরাট গৌরবের বলে ভাবা হয়? কিসের উপর অনেক প্রশংসা করা হয়, কি কাজে সম্মান পাওয়া যায়? কিভাবে সম্মান লাভ হয়? কেউ এসবের চিন্তা করবে না। শুধু বলবে- আল্লাহ ও তার রাসূল (সাঃ) এর হুকুম এটা। বিয়ে-শাদী কিভাবে হওয়া উচিত? ছেলেমেয়েদের কিভাবে লালন-পালন করা উচিত? ঘরে কিভাবে জীবন-যাপন করা উচিত? নামাযগুলোর পাবন্দী (অনুশীলন) থাকবে। পর্দা-পুশিদা থাকবে। লজ্জা-শরম থাকবে। একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে। বড়কে বড় মনে করা হবে। ছোটদেরকে স্নেহ করা হবে। দম্ভ-অহঙ্কার থাকবে না। বড়ত্ব থাকবে না। অপব্যয়-সীমালঙ্ঘন থাকবে না। নাজায়েয রূসম-রেওয়াজ থাকবে না এবং অন্যকে খুশি করার জন্য আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করা খুব সহজ মনে করা হবে না।

এখন আল্লাহ তা'আলা বলেন, যদি এসব না হয়, তা হলে আমি তাকে অবশ্যই উত্তম জীবন দান করব অর্থাৎ দুনিয়াতেও। আর এর হাজার হাজার নয়; লাখ লাখ দৃষ্টান্ত রয়েছে। আপনি হাদীস পড়লে দেখতে পাবেন- যেসব ঘরে এবং যেসব পরিবারে শরী'আতের আনুগত্য করা হয়েছে,

যথানিয়মে শরীআত পরিপালন করা হয়েছে, আল্লাহ ও তার রাসূলের হুকুমের উপর আমল করা হয়েছে এবং ইসলামী জীবনের যে আদর্শ, নমুনা ও দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে, ইসলামী জীবনের যে রূপরেখা রয়েছে, তার অনুসরণ করা হয়েছে। রূসম-রেওয়াজ দেখা হয় নি বরং দেখা হয়েছে, আল্লাহ ও তার রাসূলের হুকুম কি? যেসব লোক, বংশ-গোষ্ঠী, ভাই-বোন এবং যেসব দেশ ও সমাজ-সোসাইটি এর উপর আমল করেছে, তাকে আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতেই জান্নাতের স্বাদ আস্বাদন করিয়েছেন। এতে কোনও সংশয় নেই। আমি এতটুকু অত্যুক্তি করছি না। দুনিয়াতেই তারা জান্নাতী জীবনের স্বাদ পেয়েছেন। সুতরাং তাদের মনে হত, আমরা জান্নাতে আছি। যুগটাই হৃদ্যতা ও ভালবাসার। একে অন্যের হক আদায় করে পারস্পরিক অধিকার রক্ষা করে। এখানে কারও অধিকার হরণ বা হক নষ্ট হয় না। কাউকে তুচ্ছ বা হেয় দৃষ্টিতে দেখা হয় না। কোন অহেতুক কথা বলা হয় না বা বাড়তি কোনো অবৈধ হারাম আয় নেই। কেবল আল্লাহর উপর ভরসা ও তার নাম স্মরণসহ নামায আদায় ও হালাল জীবিকা ভক্ষণ করা হয়। হারামের টাকা তো ভাল হারামের পাই-পয়সাও ঘরে আসে না। যেসব ঘরে এর পাবন্দি করা হয়েছে, এসবের যত্ন নেওয়া হয়েছে– তাদের ঘর জান্নাতেরই প্রতিচ্ছবি। তাদের ঘরের সামনে রাজপ্রসাদ এবং আলীশান অট্টালিকাও কিছুই নয় বরং এগুলোকে সেসবের বিপরীতে একটি জেলখানাই মনে হয়। বাইর থেকে দেখতে কি চমৎকার আলীশান ভবন। বড় বড় উঁচু উঁচু প্রাচীর, কারুকার্য, কত কি! কিন্তু ভেতরে জাহান্নামের ক্ষীপ্র দাবানল। স্বামী-স্ত্রীতে প্রেম-ভালবাসা নেই। মা-ছেলেতে হৃদ্যতা নেই। না আছে মায়ের মধ্যে সেই স্নেহ-মমতা, না সন্তানের মধ্যে সেই সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধ, না কোনও দুর্বলের উপর দয়া হয়, না কোনও গরীব-দুঃখীকে সাহায্য করা হয়, এখানে খাওয়া-পরা ছাড়া, দম্ভ-অহংকার ছাড়া এবং লৌকিকতার প্রদর্শনী ছাড়া আর কোন কাজই নেই।

সুতরাং ভাই-বোনেরা! আপনারা এসবের প্রতি যত্নবান থাকুন। আল্লাহ তা'আলা এই সুযোগ দিয়েছেন, নারী-পুরুষ উভয়েই চেষ্টা-সাধনা করে শরী'আত অনুযায়ী জীবন যাপন করে, আল্লাহর আনুগত্য করে এবং তার রাসূল (সাঃ) এর শরী'আত মেনে চলে যেন প্রত্যেকেই প্রভূত উন্নতি লাভ করতে পারেন। আর উন্নতিও কেমন! রূহানী ও আত্মিক উন্নতি; একথা আমি খুব ভেবে-চিন্তেই বলছি। কারণ, আমি লেখালেখি করার মানুষ। আমি যা কিছু লিখি, তার আলোচনা-পর্যালোচনা হয়। তার বিচার-বিশ্লেষণ করা হয়।

এর উপর প্রশ্ন করা হয়– এটা কিভাবে লিখে দিলেন? এজন্য আমি যেনতেন কথা বলতে পারি না। (তামীরে হায়াত, অক্টোবর ১৯৯৬ খ্রিঃ)

আল্লাহ তা'আলা তার বান্দা-বান্দীদের আলোচনা করেন ভিন্ন ভিন্ন

উত্তম ঘটনাবলী, নেক আমল ও দ্বীনের অতি গুরুত্বপূর্ণ শাখাগুলো উল্লেখ করার সময় কুরআনে কারীম কেবল পুরুষের সাথে নারীদের আলোচনা এবং এতটুকু ইঙ্গিতই করে না যে, নেক আমল, উন্নত চরিত্র ও গুণাবলীতে পুরুষ-নারীর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই বরং কুরআনে কারীম তাদের এক একটি গুণকে আলাদাভাবে বর্ণনা করে। যখন পুরুষের কোনও গুণের উল্লেখ করে, তখন নারীকেও সে গুণে গুণান্বিত করে এবং স্বতন্ত্রভাবে তাদের আলোচনা করে। যদিও এর জন্য দীর্ঘ বর্ণনা পদ্ধতি অবলম্বন করতে হোক না কেন।

এর রহস্য হল, সেসব গুণ-বৈশিষ্ট্যে শক্তি ও যোগ্যতার অধিকারী পুরুষদের উপর নারীদেরকে অনুমান করতে সেই মানবীয় বিবেক-বুদ্ধি উৎসাহী হয় না, যা অনৈসলামিক ধর্ম-দর্শন এবং প্রাচীন সমাজ-সভ্যতার ছায়ায় প্রতিপালিত হয়েছে। এ ধরনের বিবেক-বুদ্ধি সব সময় পুরুষ ও নারীদের মধ্যে পার্থক্যের বিশাল প্রাচীর দাঁড় করিয়েছে। তাদেরকে অনেক বৈশিষ্ট্য ও গুণে পুরুষদের সাথে শরীক হওয়া থেকেও পৃথক রেখেছে। তা হলে কিভাবে তাদের মধ্যে তাদের প্রতিযোগিতা ও লড়াইকে পছন্দ হবে। আপনার আমার সাথে এই আয়াতে কারীমা তিলাওয়াত করুন :

ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقنتين والقنتت
والصدقين والصدقت والصبرين والصبرات والخاشعين والخشعت
والمتصدقين والمتصدقت والصائمين والصائمات والحفظين فروجهم
والحفظت والذكرين الله كثيرا والذاكرات اعدالله لهم مغفرة واجرا عظيما

'নিশ্চয় মুসলমান পুরুষ, মুসলমান নারী, ঈমানদার পুরুষ, ঈমানদার নারী, অনুগত পুরুষ, অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ, সত্যবাদী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ, ধৈর্যশীল নারী, বিনীত পুরুষ, বিনীত নারী, দানশীল পুরুষ, দানশীল নারী, রোযা পালনকারী পুরুষ, রোযা পালনকারী নারী, যৌনাঙ্গ হেফাজতকারী পুরুষ, যৌনাঙ্গ হেফাযতকারী নারী, আল্লাহর অধিক যিকিরকারী পুরুষ ও যিকিরকারী নারী তাদের জন্য আল্লাহ প্রস্তুত রেখেছেন ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।' (সূরা আহযাব-৩৫)

ভাই! যদি আল্লাহ পাকের ব্যাপার না-হত, তবে আমি বলতাম, আল্লাহর বিরাট মজা লাগছিল, তাই প্রত্যেকের আলাদা আলাদা আলোচনা করেছেন। কোনও পিতাকে জিজ্ঞাসা করুন, যার চার-পাঁচজন পুত্র রয়েছে। তার মন চাইবে প্রত্যেকের নাম নিয়ে কিছু বলতে! প্রত্যেকের উপরই তার স্নেহ হবে। আল্লাহ পাকের সত্তা অনেক বড়। মানবীয় গুণাবলী তার সাথে সম্পৃক্ত করা যায় না। কিন্তু একে মানবীয় শিষ্টাচার ও নীতি অনুযায়ী অন্য পন্থায়ও ব্যক্ত করা যেত। وغيره বা 'ইত্যাদি' শব্দ তো তখন পর্যন্ত আবিষ্কারই হয় নি। তবে মুসলমান পুরুষ ও নারী, ঈমানদার পুরুষ ও নারী এবং এভাবে অন্যান্য সকল বৈশিষ্ট্যে ও গুণে অংশীদার পুরুষ ও নারী বলা যেত। কিন্তু এক একজনকে আলাদা আলাদা বর্ণনা করা হয়েছে। যাতে কেউ ভাবতে না পারে, ইসলাম আর ঈমানে তো পুরুষ ও নারী অংশীদার হতে পারে; আনুগত্য-আদেশ পালনেও তা সম্ভব। কিন্তু সত্যবাদীতায় তা মুশকিল। এখানে নারীরা মিথ্যা বলে ফেলে। কখনও নিজের দুর্বলতা গোপনের জন্য, কখনও নিজের খাবারের ত্রুটি ঢাকার জন্য, কখনও নিজ সন্তানের বদঅভ্যাস পর্দাবৃত করার জন্য, কখনও শুয়ে-ঘুমিয়ে পড়ার দুর্বলতার জন্য। মোটকথা, নারীরা সত্যবাদিতায় পুরুষের মতো হতে পারে না। এটা পুরুষচিত কাজ, বীরত্বের কাজ। والسبقين والسبقات (অগ্রগামী পুরুষ ও অগ্রগামী নারী) এটাতো ঠিক। কিন্তু والصابرات الصابرين (ধৈর্যশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীল নারী) এর ব্যাপারটি! তারা কবে ধৈর্যধারণ করতে পারে? সবসময়ই দেখা যায়, সর্বপ্রথম তাদের উপরই দুঃখ-ব্যথার প্রভাব পড়ে। সর্বপ্রথম তাদের মুখ থেকেই আহাজারী বের হয়। অনেক সময় তো ঈমান নিয়েই শঙ্কা সৃষ্টি হয়। কখনও কখনও হয় সন্তানের দুশ্চিন্তা। আল্লাহ হেফাযত করুন। কখনো প্রিয়জনদের চিন্তা-পেরেশানী সর্বপ্রথম নারীদের উপরই পড়ে।

আল্লাহ তা'আলা মানুষের স্বভাব-প্রকৃতি সম্পর্কে অবগত ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা মনের চোর সম্পর্কে জানতেন, আমরা আমাদের বোনদের সম্পর্কে কু-ধারণা করব। কিন্তু তা চলবে না। ধৈর্য-স্থৈর্য্য আর সহনশীলতায়ও নারীরা কোনো অবস্থায়ই পুরুষদের চেয়ে পিছিয়ে নয়। "والخشعينوالخشعت" এবার ধন-সম্পদের ব্যাপারে আসুন। এখানে নারীরা পুরুষের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে। হাতেমের নাম হয়তো সবাই শুনেছেন; হাতেমাহ নাম কেউ শোনেন নি। কাজেই দান-সদকায় নারীরা কি দেবে! তারা সঞ্চয়কারী। পুঞ্জিভূত করাই তাদের কাজ, তারা হয় সৌখিন-বিলাসপ্রিয়। অনেক গৃহিনী আছে, কিছু কিছু বাঁচিয়ে জমা করে। তাই আল্লাহ

বলেন– والمتصدقين والمتصدقت ভাল কথা কিন্তু রোযাদার হওয়া তো কঠিন ব্যাপার! আল্লাহ বলেন–

والصائمين والصائمات والحافظين والحافظت والذاكرين والذاكرات

أعدالله لهم مغفرة واجرا عظيما-

এত দীর্ঘ আমলের তালিকা কেন বর্ণনা করা হল? যাতে বুঝা হয়ে যায়, আল্লাহ পাক যেভাবে তার বান্দাদের উপর দয়া-অনুগ্রহ করেন, তদ্রুপ তার বান্দীদের উপরও করেন। তার সিফাতে রুবূবিয়্যাত, প্রতিপালনের গুণ এবং রহমত ও দয়ার গুণ পুরুষ ও নারীর সাথে একই আচরণ করে এবং তাদের উভয়ের উপর পরিব্যাপ্ত।

নারীরা মানবীয় গুণে পুরুষের পেছনে নয়

উপরিউক্ত আয়াত থেকে আরও শিক্ষা পাওয়া যায়, স্ত্রীগণ, অভিজাত কন্যা ও নারীগণ মনে করেন– প্রত্যেক ময়দানে, মানবিক গুণাবলীতে, উন্নত চরিত্রে, ফাযায়েলে আমলে তারা পুরুষদের পিছনে নয়। তারা পুরুষদের সমান পুরস্কার ও প্রতিদান পাবেন। তাদের জাতিসত্তা এর পরিপন্থী নয়। তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্যেও বিপরীত নয়। তাদের জাতিগত বৈশিষ্ট্যাবলী ক্ষত-বিক্ষতকারী নয়।

আল-হাম্‌দুলিল্লাহ! কুরআনে কারীম হিফয করার প্রচলন তো অনেক। আমার জানামতে কোনো কোনো ঘরে দু'-চারজন নারী হাফেযে-কুরআনও রয়েছে। আমার প্রিয়জনদের মধ্যে অনেক ঘরেই পিতাও হাফেয ছিলেন; মাতাও হাফেযাহ ছিলেন। আমারও বিরাট সৌভাগ্য, আমার মা-ও হাফেযাহ ছিলেন। তা ছাড়া কুরআন-হাদীস সম্পর্কেও জ্ঞান রাখবেন। সেকালে বুযুর্গ ও বড়রা যে পাঠ্যসূচি তৈরি করেছিলেন, তা যদিও উর্দুতে ছিল, কিন্তু অত্যন্ত স্বয়ংসম্পূর্ণ ও উপকারী ছিল। আর উর্দূতে রচিত 'বেহেশতী যেওর' -কে আল্লাহ পাক এমনই গ্রহণযোগ্যতা দান করেছেন, খুব কম কিতাবেরই তেমন গ্রহণযোগ্যতা লাভ হয়েছে। এই 'বেহেশতী যেওর' স্বয়ং একটি বিরাট বড় ও পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থাগার, হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষ এর দ্বারা উপকৃত হয়েছে এবং হচ্ছে। এ ছাড়া মানুষের চিকিৎসা সংক্রান্ত বই-পুস্তকও পড়ানো হত। আমিও যে যুগে বুঝতে শিখেছি, তখন চমৎকার এক প্রচলন ছিল আর এখানে দক্ষিণ ভারতেও যদি তা চালু হয়, তাহলে বিরাট সুপ্রভাব পড়বে। যখন কোনও প্রভাবময় অবস্থা হত অথবা আগ্রহ-

উত্তেজনাকর উদ্ভব হত কিংবা উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার মুহূর্ত হত আর বহু সংখ্যক নারীরা সমবেত হত অথবা এমন কোন ঘটনা গঠত, যাতে মন-মানসে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হত, তখন অনতিবিলম্বে 'ফতূহুশ্ শাম' পড়া হত। 'ফুতহুশ্ শাম' মূলত একটি আরবী পুস্তক। আমাদেরই বংশের একজন বুযুর্গ সাইয়িদ আব্দুর রায্যাক সাহেব কালামী পঁচিশ হাজার শ্লোকে 'ছমছামুল ইসলাম' নামে এর অনুবাদ করেছেন।

মজার কথা হল, তা একটি হিন্দু প্রেস 'নওল কিশোর' প্রেসে ছাপা হয়। এর পরিচিতি বের হলে জানা যায়, কান্ধেলার বুযুর্গ খান্দানগুলোতেও এর প্রচলন ছিল এবং 'ছম্ছামুল ইসলাম' পড়া হত। আজ যেন সেটি মুসলিম রাজা-বাদশা ও তাদের রাজ্যজয়ের ইতিহাস। এতে খাঁটি ইসলামী যুদ্ধ, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ, যেখানে ছাহাবায়ে কিরাম ও ছাহাবিয়াহগণ শরীক ছিলেন, সেগুলোকে বিরাট প্রভাবময় ভঙ্গিতে ও ছন্দাকারে এবং অত্যন্ত সাবলীল ও আবেগের সাথে আমার ঘরের কোনও নন্দিনী যেমন আমার খালা, যিনি হাফেযে কুরআন ছিলেন অথবা আমার মরহুম সহোদরা বোন পড়ে শোনাতেন। তখন এক নৈসর্গিক পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে যেত। সকলেই ভুলে যেত নিজের দুঃখ-শোক। কোনও কাজ বা টাকা-পয়সা নিতে মায়ের কাছে অথবা সহোদরা বোনের কাছে এলে দেখতাম, তিনি কাঁদছেন। তখন কি বলব বুঝে উঠতে পারতাম না। আমি বিরাট প্রভাবিত হয়ে বসে পড়তাম। প্রথম প্রথম কয়েকটি শহরের নাম যেমন দিমাশ্ক, হালব, হিম্ছ, ইয়ারমূকের নাম, বাবে তাওমাহর নাম শিখেছিলাম এ কিতাব থেকেই। আর যখন হিমসে আমার সম্মানে সেখানকার 'ইখওয়ানুল মুসলিমীন' এর কেন্দ্রীয় অফিসে বড় একটি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়, তখন আমি তাদেরকে বলেছিলাম– আপনারা কি জানেন, আমরা ইসলামী চেতনা কোত্থেকে লাভ করি? আমরা ইসলামী চেতনা পাই ফুতূহুশ্ শাম থেকে। এরপর আমি কিছুটা বিস্তারিতভাবে হাল্ব ও হিমছের সমাবেশগুলোতে শুনিয়েছি।

আমাদের এখানে রীতি ছিল, মেয়েরা যখন সমবেত হত, তখন জিহাদের যেসব ঘটনা সংঘটিত হয়েছে, যুদ্ধ-বিগ্রহ হয়েছে, সেগুলোকে আরবী থেকে উর্দূ কবিতায় আমাদের এক বুযুর্গ অনুবাদ করেছেন। তিনি ভারতীয় মুসলমানদেরকে ভারতের জাতীয়তাবোধের কাছে সমর্পন করেননি, নিজের স্বকীয়তা অক্ষুণ্ন রেখেছেন। নবী আরবী ও দ্বীনে আরবীর সাথে তার সম্পর্ক অটুট রয়েছে। অধিকন্তু আমি তাদেরকে আত্মমর্যাদাবোধ দিয়ে বলেছি, আজ আপনারা আরব জাতীয়তার আচলে আশ্রয় নিচ্ছেন।

আপনারাই তো আমাদের ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ফিৎনা থেকে রক্ষা করেছেন। এর জন্য আমরা তিরস্কৃত হয়েছি। মানুষ আমাদেরকে বলেছে– থাকো ভারতে, পানাহার কর এখানে আর গান গাও আরবের। যেমন, 'ডেকে নাও মোরে মদীনায়, ওহে আমার মনিব।' এ লোক পুরোপুরি ভারতের কৃতজ্ঞ নয়।'

আমরা তো আপনাদের সৌজন্যে ভর্ৎসনা শুনেছি! আর আপনারা আবু জাহল, আবু লাহাবের জাতীয়তাবাদের দিকে ফিরে যাচ্ছেন! আরবদের উপর এর বিরাট প্রভাব পড়ে। অনেকেই আমার কাছে তার প্রতিক্রিয়াও ব্যক্ত করেছেন। যাই হোক, আমাদের এখানে এ এক রীতি ছিল। আজও তা পুনর্জীবিত করা হোক। সেই ফুতুহুশ্ শাম হয়তো আজ বাজারে পাওয়া যায় না। কিন্তু এখনও 'ছমছামুল ইসলাম' এর কপি সন্ধান করে নেওয়া যেতে পারে। আবার এ জাতীয় অন্যান্য কিতাবাদী যেমন মুসাদ্দাসে হালী– আল্লামা হালীর ছয় পংক্তির কাব্য গ্রন্থ্ পড়া যায়। এতেও একদিকে যেমন ঈমানী চেতনা ও উষ্ণতা সৃষ্টি হবে, অপরদিকে ইসলামী জ্ঞান- সভ্যতা বৃদ্ধি পাবে। ১৯৫১ খ্রিষ্টাব্দে আমি সিরিয়া গিয়েছিলাম। সেখান সম্পর্কে আমি এতই পরিচিত ও অবগত ছিলাম, যেন ইতোপূর্বেও আমি এখানে বহুবার এসেছি। আমি বাবে তাওয়মা সম্পর্কে জানতাম। সেখানে অমুক যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। এরূপ আরও অনেক স্থান সম্পর্কেও জানতাম, যার নাম অনেক শিক্ষিত লোকজনও শোনেন নি।

ইসলামী সভ্যতা ও নারী

সম্মানিত বোনেরা! আমার জন্য বিরাট সুখকর মুহূর্ত! আমি আপনাদের একজন দ্বীনী ভাই হিসেবে কথা বলব। মহান আল্লাহর অনেক বড় অনুগ্রহ এটা। তিনি আমাকে সে সব সম্ভ্রান্ত বোনদের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ দান করেছেন, যাদের সাহায্য-সহযোগিতা ছাড়া কোনো সৎ ও দায়িত্বশীল সমাজ অস্তিত্ব লাভ করতে পারে না। পুরুষদের সামনে বয়ান করা ও তাদের সেঙ্গ কথা বলার অনেক সুযোগ হয়। কিন্তু এই পুণ্যময় মাহফিলে আমি আমার সম্মানিত দ্বীনী বোনদের কাছে কিছু কথা পেশ করতে চাই।

ভূতপূর্ণ চ্যালেঞ্জ

সম্মানিত বোনেরা! ইসলামকে একেবারে সূচনা লগ্নেই এমন এক ভূতপূর্ব চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হয়েছে, পৃথিবীর কোনো ধর্ম ও সভ্যতার ইতিহাসে যার কোনো নযীর নেই।

আরব উপদ্বীপে ইসলামের আবির্ভাবের পর, যা ধর্মীয়, চারিত্রিক, সামাজিক ও আকীদা-বিশ্বাস সংক্রান্ত বহু শিক্ষা নিয়ে শুভাগমন করেছিল- সেই ইসলামকে এমন দুটি সভ্যতার চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হয়েছে, যার থেকে বড় কোনো সভ্যতার বিশ্লেষণ মানব সভ্যতার ইতিহাসে করা হয় নি। এই সভ্যতা ছিল রোমান ও পারস্য সভ্যতা। এই সভ্যতা, সাহিত্য-সংস্কৃতি, স্বাধীনতা, সূক্ষ্মদর্শিতা, উচ্চকল্পনা ও ধ্যান-ধারণা. মানব জীবনকে সুসজ্জিত ও সুশৃঙ্খল করা এবং আরাম-আয়েশের উপায়-উপকরণে সহজলভ্যতা ও সুব্যবস্থার বহু মঞ্জিল অতিক্রম করে গিয়েছিল। পৌঁছে গিয়েছিল উন্নতির উচ্চশিখরে। এই সভ্যতা তাদের সাজ-সজ্জায় বিরাট সৌন্দর্যের অধিকারী এবং অনুভূতিপরায়ণ ছিল।

রোমান ও ইরানীদের প্রভাব

রোমান ও ইরানীদের (পারস্যবাসী) বই-পুস্তকে ভরা গ্রন্থাগার, বিশাল বিশাল যন্ত্রপাতি ও উপকরণ, আরাম ও বিনোদন সামগ্রী, সূক্ষ্ম কাব্যচর্চা ও উন্নত রুচিবোধ, সাহিত্য-আর্ট, জীবনযাত্রার বিভিন্ন পদ্ধতি ও ভাবধারা এবং

বিত্ত-বৈভবের উপর বিরাট গর্ব ছিল। মোটকথা, এসব বিষয়ে তাদের সভ্যতা ছিল পরিপূর্ণ।

পক্ষান্তরে আরববাসী তাদের প্রাথমিক যুগে বা ভিন্ন কথায় সভ্যতার শৈশবকালে ছিল। বস্তুত ইসলামকে এই অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছে, তা বিরাট স্পর্শকাতর অভিজ্ঞতা ছিল। ইসলাম নিঃসন্দেহে আসমানী শিক্ষামালা, আকীদা-বিশ্বাস ও উন্নত স্বভাব-চরিত্র এবং উত্তম শিষ্টাচারে সজ্জিত ছিল। কিন্তু সভ্যতা ও সমাজের নেতৃত্বের লাগাম ছিল রোমান ও ইরানীদের হাতে। কাজেই অপার সম্ভাবনা ছিল এবং সমগ্র কুরআন বলছিল– এই যে আরব ও মুসলমান এক সংকীর্ণ ও অন্ধকার পরিবেশে চোখ খুলেছে, যাদের নিকট যৎসামান্য আসবাবপত্র রয়েছে, যাদের মাটি সম্পদের ভাণ্ডার শূন্য, যারা সভ্যতার সকল উপায়-উপকরণ থেকে একদম বঞ্চিত, যাদের জীবন কাটে তাবু আর ক্ষুদ্র-জীর্ণ কুটিরে, উট-ঘোড়ার উপরই যাদের যোগাযোগ ব্যবস্থার ভিত্তি, যাদের জীবন ছিল ভবঘুরে যাযাবরের জীবন, এই মুসলিম উম্মাহ রোম ও পারস্যের পারদর্শিতার সামনে ঝুঁকে পড়ারই আশঙ্কা ছিল। আর এর স্পষ্ট শক্তিশালী আলামতও ছিল, যে জাতি এখনও তার শিশুকাল অতিক্রম করছে, সে রোমান ও পারস্য সভ্যতাকে তার সকল কলুষতা ও কদর্যসহ গ্রহণ করে নেবে। কারণ, কোন জিনিসকে যখন পুরোপুরিভাবে গ্রহণ করে নেওয়া হয়, তখন তার বৈশিষ্ট্যাবলী ও অনিবার্যতা থেকে মুক্ত থাকা যায় না। বিবেক তাই বলত; সম্ভাবনাও ছিল তাই। ইতোপূর্বে খ্রিষ্টবাদেরও এমনি অবস্থা হয়েছিল।

রোমান সভ্যতার সম্মুখে খ্রিষ্টবাদের আত্মসমর্পন

খ্রিষ্টবাদ ছিল একটি ন্যায় ও সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত স্বভাব ধর্ম। যা নিয়ে হযরত ঈসা (আ.) পৃথিবীতে শুভাগমন করেছিলেন। কিন্তু এই ধর্মমত যখন ইউরোপে প্রবেশ করল, তখন আর নিরাপদ-অক্ষত থাকতে পারল না। এর রূপরেখা ও অবকাঠামো বিকৃত হয়ে গেল। কারণ, তাদের কাছে সভ্যতা ছিল না। তাদের কাছে এমন গভীর তত্ত্বপূর্ণ ও বিস্তারিত শিক্ষামালা ছিল না, যা জীবন চলার পথনির্দেশনা দিতে পারে, উস্তাদ-শিক্ষকদেরকে সঠিক পথ দেখাতে পারে। জ্ঞানী-গবেষক ও শাসকবর্গকে সাহায্য করতে পারে। এই ধর্ম ছিল ইয়াহুদী নীতিমালা ও আইনী শিক্ষা-দীক্ষার উপর ভিত্তিশীল এক শরী'অতের নাম। মানবতার উপর ন্যায়-নিষ্ঠা, মানবিক সমতা, দুর্বল ও নির্যাতিতের উপর দয়া-সহমর্মিতা ছিল এর আদর্শ। ইয়াহুদীদের পাষণ্ডতা, অন্যায়-জুলুম ও শোষণের উপর সে কঠোর সমালোচনা করত। সেইসঙ্গে

আরও মনে রাখতে হবে, এই ধর্মমত এবং তার অনুসারীগণ কখনও দাবি করত না যে, তারা বিশেষ কোনও সভ্যতার কর্ণধার, বিশেষ সংস্কৃতির দাবিদার ও পতাকাবাহী। খ্রিষ্টবাদ যখন ইউরোপে প্রবেশ করল, যেখানে প্রথমে গ্রিক তারপর রোমান সভ্যতা উন্নতির উচ্চ শিখরে পৌঁছে গিয়েছিল, যেখানে মানবীয় জ্ঞান-প্রজ্ঞা, দর্শন, সাহিত্য ও গণিত শাস্ত্রে দক্ষতা অর্জন করেছিল– খ্রিষ্টবাদের মতো সাদাসিধে ধর্ম যখন সেখানে প্রবেশ করল, তখন তাকে সম্পূর্ণ এক নতুন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছে, যার কোন পূর্ব ধারণা ছিল না। ফলে খ্রিষ্টবাদ ইউরোপীয় সভ্যতার সাথে –যার নেতৃত্ব ছিল রোমানদের হাতে –সন্ধি করে নেয়; অন্য কথায় তার সামনে আত্মসর্ম্পণ করে। এই রোমান সভ্যতার ভিত্তি ছিল প্রাচীন গ্রিক সভ্যতার ওপর। খ্রিষ্টবাদ তার সাথে ধাক্কা খেয়ে নতশির হয়ে যায়। ভেঙ্গে পড়ে তার অবকাঠমো এবং সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয় সে। তার মধ্যে ছিল না মোকাবেলা করা ও সামলে উঠার শক্তি। স্বয়ং সে আস্থাপূর্ণ জীবন এবং শক্তি ও তৎপরতায় ভরা চ্যালেঞ্জের সম্মুখে দাঁড়াতে পারে নি। পরিণতি এই হল যে, খ্রিষ্টাব্দ সীমিত শিক্ষা দীক্ষা, সীমিত নিয়মনীতি, মানবিক সাম্য, দয়া-সহমর্মিতা, ন্যায়-নিষ্ঠা একত্ববাদ আর তাও এক সংক্ষিপ্ত ও সংকীর্ণ যুগ থেকে আগে বাড়তে পারে নি, সমাজ ব্যবস্থা, সংঘবদ্ধ জীবন, সাহিত্য-গ্রন্থনাসহ আরও অনেক চারিত্রিক ও মানবীয় মর্যাদা-মূল্যবোধে সে উন্নত রোমান সভ্যতার সরাসরি পদানত হয়ে যায়।

এই ঘটনার কারণ হচ্ছে, খ্রিষ্টধর্ম সেই শক্তি থেকে বঞ্চিত ছিল, যার দ্বারা সে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করবে; রোমান সভ্যতার চাকচিক্যে প্রভাবিত হবে না।

তাতারী ও ইসলামী সভ্যতা

মানব ইতিহাসের দ্বিতীয় অভিজ্ঞতা তাতারীদের অভিজ্ঞতা। আপনারা আল-হামদুলিল্লাহ শিক্ষিত গ্রাজুয়েট নারী। আপনারা জানেন, হিংস্র মঙ্গোলিয়রা অর্থাৎ তাতারীগণ স্বয়ং মুসলিম বিশ্বের উপর কাপুরুষচিতভাবে আক্রমণ করেছিল। তারা এমন বাঁধভাঙ্গা স্রোতের মতো ঝাপিয়ে পড়ে, যা প্রতিহত ও প্রতিরোধ করা সহজ ছিল না। তারা যখন মুসলিম বিশ্বকে তাদের টার্গেট (লক্ষবস্তু) বানিয়েছে, তখন তারা বিরাট শক্তিধর ছিল। তাদের কাছে হাজার বছরের সংরক্ষিত শক্তি ছিল, যার ব্যবহার তারা করে নি। তাদের শক্তির সাথে টক্কর দেওয়া সহজ ব্যাপার ছিল না। তারা

মুসলিম বিশ্বের উপর আক্রমণ করে রক্তের বন্যা বইয়ে দেয়। ধূলোয় মিশিয়ে দেয় মুসলিম বিশ্বের প্রভাব-প্রতিপত্তির প্রদীপ। ইসলাম ও মুসলিম মিল্লাতের বেইজ্জতি করে। ইসলাম এই শক্তিধর ও দুর্দম প্লাবনের সামনে পিছু হটতে থাকে। তাদের রাজ্যগুলো এক এক করে পর্যুদস্ত হতে থাকে। মুসলমানগণ ধরেই নেয়, তাদের মধ্যে তাতারীদের প্রতিরোধ ও মোকাবেলা করার শক্তি নেই। এমনকি কোন শক্তিই তাতারীদেরকে দমন করতে পারবে না। কারও শক্তি-সাহস নেই তাদের পদানত করার।

শেষ পর্যন্ত একথা প্রবাদ হয়ে যায়, যদি বলা হয়, তাতারীরা অমুক যুদ্ধে পরাজিত হয়েছে, তা হলে বলে দেবে– মিথ্যে কথা। তাতারী আর পরাজয়; এই হিংস্র রক্তখেকো জাতি আর পিছপা হওয়া অসম্ভব কথা। বিবেক তা মেনে নেয় না। তাতারীদের প্রভাব গোটা মুসলিম বিশ্বে ছেয়ে গিয়েছিল। এমন ভয়াবহ আতঙ্ক ও ত্রাস সম্ভবত কখনও কোন মানুষ চোখে দেখে নি। সবাই তাদের ঘোড়াগুলোর পায়ের ধূলো ছিল। তাদের দয়া ও করুণা প্রত্যাশী ছিল। কিন্তু অবশেষে পরিণতি কি হল?

ইসলামী সভ্যতার বিজয়

অবশেষ সেই ইসলাম, যাকে বাহ্যত তাদের সম্মুখে পরাজয়ের গ্লানি টানতে হয়েছে, যা তাদের প্রতিরোধে পিছপা হয়ে গিয়েছিল, সেইসব বিজয়ীদের জয় করে নিল। সে তরবারীর তীক্ষ্ণ ফলার জোরে জয় লাভ করে নি। কারণ, সে তার তরবারী ভোতা হয়ে গিয়েছিল। মুসলমানদের তরবারী ছিল কোষবদ্ধ। তারা নিরাশ হয়ে পড়েছিল। তারা বরাবরই বলত– এই তরবারী কিছুই করতে পারবে না। এর ধার তাতারীদের মোকাবেলায় নিষ্ক্রিয় হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু কি ছিল সেই জিনিস, যা তাতারীদেরকে পরাভূত করেছে, তাতারকে জয় করেছে? তা ছিল অলৌকিক অপরাজেয় দ্বীন। সেই শাশ্বত, চিরন্তন, অগ্রগামী ও বিজয়ী, চমৎকার ও চিত্তাকর্ষক, মনোহারী সুশৃঙ্খল দ্বীন। অনন্তর সময়ের আবর্তে ইসলামী সভ্যতা তাদেরকে নিজের অধীন ও পরাভূত করে নেয়। কারণ, তাতার জাতি ছিল সভ্যতা শূন্য। তারা ছিল মানুষরূপী পশু কিংবা হিংস্র দানব তূল্য। ওরা এই বিশাল বিস্তৃত পৃথিবীতে এসেছিল দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন এক ক্ষুদ্র উপত্যকা থেকে। যারা উন্নতির অনেক সিঁড়ি অতিক্রম করে ফেলেছিল। তাদের প্রয়োজন ছিল একটি সভ্যতার। মরুভূর জীবনে সভ্যতার সাথে তাদের ছোঁয়া লাগে নি। তারা বাধ্য ছিল নতুন সভ্যতা

গ্রহণে। কারণ, কোন জাতিই সভ্যতা ছাড়া বেঁচে থাকতে পারে না। নতুন জীবনের জন্য অনেক সমস্যা ও ব্যাপার-সেপার ছিল। পানাহার, পোশাক-পরিচ্ছদ, চলাফেরা, সামাজিকতা, আতিথেয়তার নতুন পদ্ধতি ছিল; ঘর-দুয়ার কিভাবে নির্মাণ করা হবে, বাসস্থানকে স্বস্তিকর, আরামদায়ক, স্বাস্থ্যসম্মত, মনোহর আনন্দময় কিভাবে করা যাবে– এ সকল বিষয়ই ছিল। ইতোপূর্বে তারা নেহাৎ সাদাসিধে যাযাবরের জীবন যাপন করত। এখন তারা এক নতুন সভ্যতার মুখোমুখি ছিল। তাদের উঠাবসা চলছিল ওই প্রশস্ত ইসলামী সভ্যতার সঙ্গে, যা ছিল প্রাচ্য থেকে প্রতিচ্য পর্যন্ত বিস্তত। এই সভ্যতা জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি দিয়েছে। আবিষ্কার করেছিল শিল্প-কারিগরি। মানবীয় বিবেককে সুসজ্জিত করেছিল। মানুষকে দিয়েছিল পরিচ্ছন্ন রুচিবোধ। তাদের জন্য রচনা করেছিল নতুন বিস্ময়কর বৈপ্লবিক জীবন। এই সভ্যতা সেসব চক্ষুকে চমকে দেয় এবং তাদেরকে ইসলামী সভ্যতার অনুসরণ করতে বাধ্য করে। তারা ইসলামের ছাঁচে বিগলিত হয়ে যায়। ইসলামী জীবনে প্রভাবিত হয়ে পড়ে। তারা মনোযোগসহ অধ্যয়ন করে 'ইসলাম কি'? আর ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হয়। কাজেই মূলত সভ্যতাই তাদের ইসলামে দিক্ষিত হওয়ার কারণ হয়েছে।

মুসলমানগণ ইসলামী ইতিহাসের সূচনা লগ্নে প্রথম হিজরী শতকের একেবারে গোড়ার দিকে রাসূলে কারীম (সা.) এর আবির্ভাবের সময় বিশেষভাবে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর তিরোধানের পর যখন সিরিয়া, ইরাক, মিসর ও ইরান জয় করে, তখন তাদের সামনে ছিল নেহাৎ উন্নত দু'টি সভ্যতা। যাদের বৈষয়িক উন্নতির কল্পনাও তখনকার মুসলমানদের জন্য ছিল কঠিন। এমনকি ইতিহাসের বই-পুস্তকে উল্লেখ আছে, প্রথমবার যখন তারা পাতলা রুটি দেখেছিল, তখন একে মনে করেছে, হাতরোমাল। খাবার শেষে তারা হাত মোছার জন্য ওই পাতলা রুটিগুলো হাতে নিয়ে বুঝতে পারে, এ তো রুটি। মোটকথা, যখন এই ধর্মীয় বিজয়ের যুগ শুরু হয়, তখন তাদেরকে এক নতুন ও চিত্তাকর্ষক সভ্যতার মুখোমুখি হতে হয়েছে– যার সম্পর্কে তারা ছিল একেবারেই অজ্ঞ।

কিন্তু কোন জিনিস তাদেরকে এই শক্তিশালী সভ্যতায় গলে যাওয়া ও ডুবে যাওয়া থেকে নিরাপদ রেখেছে। সে জিনিসটিই ছিল– তারা না সেই সভ্যতাকে গ্রহণ করেছে আর না জীবনে তার অনুসরণ করেছে। এভাবেই ইসলামী সভ্যতা নিরাপদ, অটুট-অক্ষুণ্ন অবস্থায় আজ আমাদের পর্যন্ত পৌঁছুতে পেরেছে। আজ এই ইসলাম যেভাবে এখানে বিদ্যমান রয়েছে,

তদ্রুপভাবে ভারত-পাকিস্তানেও বিদ্যমান আছে। সৌদি আরব, মারাকাশে রয়েছে। এশীয়াতেও রয়েছে। এই সুদীর্ঘ সময়ে কিভাবে এই সভ্যতা নিজের নিরাপত্তা বিধান করেছে? এই সভ্যতার স্থায়িত্ব, এর শক্তি ও দৃঢ়তা এবং এখানকার চ্যালেঞ্জের উপর তার বিজয় লাভের পেছনে কি রহস্য রয়েছে? যেই চ্যালেঞ্জের যার মোকাবেলা না খ্রিষ্টান করতে পেরেছে, না সেই দিগ্বিজয়ী তাতারী, যারা সমগ্র পৃথিবীকে ওলট-পালট করে দিয়েছিল আর গোটা মুসলিম বিশ্বকে করেছিল পদদলিত। কিন্তু সভ্যতার ব্যাপারে কেন তারা সফল হতে পারে নি।

মুসলমানগণ এই জটিল ও ভূতপূর্ব কঠিন ব্যাপারে কিভাবে সফলতা লাভ করল? অনেক বিপদাপদ ও সমস্যাকে অনিচ্ছায়ও মেনে নেওয়া হয়। যেমন ধর্মীয় উগ্রবাদের ভিত্তি জুলম-শোষণ ও বাড়াবাড়ি– যার সাথে মুসলমানদের জড়াতে হয় প্রায়ই এবং মেকাবেলা করতে হয় প্রতিনিয়ত। আমরা ভারতে অনেক চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করে যাচ্ছি। হিন্দু জাতীয়তাবাদের চ্যালেঞ্জ, অনৈসলামিক সভ্যতা-সাংস্কৃতিক চ্যালেঞ্জ, পৌত্তলিকতা ও শিরকের (অংশীদারত্ববাদের) চ্যালেঞ্জ। মহান আল্লাহর অপার অনুগ্রহে আমরা এসব চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করেছি এবং কঠোরভাবে ও দাপটের সাথে করেছি। কিন্তু প্রথম যুগের মুসলমান তো বেদুঈন-যাযাবরের জীবন যাপন করতে সাদাসিধে জীবিকা ছিল তাদের। সে সময় তারা এই সভ্যতার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা কিভাবে করেছে? অথচ সভ্যতা-সংস্কৃতির চ্যালেঞ্জ খুবই স্পর্শকাতর ও ভয়াবহ হয়ে থাকে। মূলত মুসলমানগণ সেই কঠিন সমস্যায় সফল হয়েছে পুরুষ ও নারীর পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতার মাধ্যমে। মুসলমানগণ নিজেদের দাওয়াত, আহ্বান এবং নিজেদের পয়গামের উপর গর্ব করে। তারা দৃঢ় বিশ্বাস রাখত যে, তাদের দ্বীন-ধর্ম পূর্ণাঙ্গ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং সর্বশেষ দ্বীন। আর মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.) এর নবুওয়াত ও রিসালাত হল সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ। তারা আল্লাহর এই শাশ্বত বাণী শুনেছিল–

اليوم اكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام دينا

'আজ আমি তোমাদের দ্বীনকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে দিয়েছি এবং আমার নেয়ামত পরিপূর্ণ করে দিয়েছি আর তোমাদের জন্য দ্বীন (ধর্ম) হিসেবে পছন্দ করেছি ইসলাম।' (সূরা মায়েদা) তাদের এই দ্বীন ও ধর্মের নিগুঢ়তা, গ্রহণযোগ্যতা ও শক্তির উপর পুরোপুরি আস্থা ছিল।

প্রথম যুগের মুসলমানদের ঈমান ও ইয়াকীন

তাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, এই দ্বীন যুগের সাথে তাল মেলানোর জন্য নয় বরং যুগের লাগাম সামলানো ও ঠিক রাখার জন্য। এর মধ্যে দিকনির্দেশনা দেওয়ার যারপরনাই যোগ্যতা রয়েছে। তাদের নিজ ধর্মের উপর গর্ব ও তৃপ্তি ছিল। নিজের ব্যক্তি সত্তার উপর আস্থা ছিল। নিজের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য-মর্যাদা ও নিজের সভ্যতাকে তারা সম্মানের চোখে দেখত। তাদের বিশ্বাস ছিল, যে দ্বীন নিয়ে রাসূলে কারীম (সা.) শুভাগমন করেছেন, তা নিছক একটি দ্বীন বা ধর্মই নয় কিংবা কয়েকটি নিয়মনীতির সমষ্টিই নয় বরং এটি যেমন ধর্ম, তেমনি সভ্যতাও। এতে বিধি-নিষেধও রয়েছে আবার সামাজিক আইন-শৃংখলাও রয়েছে। এ একটি বর্শা-তরবারী; আবার কুরআনও। এটি মসজিদ-মেহরাবও; আবার রাজত্ব এবং বিচারালয়ও। তারা এই দ্বীনকে মনে করত আরোগ্যদানকারী প্রতিষেধক আবার প্রশান্তিদায়ক পথ্য। আজকের অনেক মুসলমানের বিশ্বাস হল, নিঃসন্দেহে ধর্ম হিসেবে সর্বোৎকৃষ্ট ধর্ম, এটাই আল্লাহ পাকের সর্বশেষ ও গ্রহণযোগ্য ধর্ম। এই ধর্ম ছাড়া অন্য কোন ধর্মে মুক্তি নেই। এ ধর্মই শাশ্বত-চিরন্তন। কিন্তু সভ্যতা একটি ভিন্ন জিনিস। ধর্মের সাথে এর কী সম্পর্ক? ধর্ম একটি ভিন্ন বিষয় আর সভ্যতা একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বিষয়। ধর্ম ভিন্ন; সভ্যতা ভিন্ন। কাজেই আমরা যদি পাশ্চাত্যের অনুসরণ করি এবং পাশ্চাত্য সভ্যতা গ্রহণ করি, তবে তাতে আমাদের ধর্ম-বিশ্বাস বিরোধী কিংবা দ্বীন ও আকীদার পরিপন্থী কেনো কিছু নেই। তখনকার মুসলমানগণ এমন অদ্ভুত বিশ্বাস রাখতেন না।

আরবের প্রাথমিক বদ্দু মুসলমান রোম ও পারস্য সভ্যতা-সংস্কৃতিকে এ দৃষ্টিতে দেখত না। তারা এ ব্যাপারে বলতে পারত, যা আমরা আজ আমেরিকান ও ইউরোপীয় সভ্যতা সম্পর্কে বলে থাকি। তখনকার পারস্য ও রোম সভ্যতা-সংস্কৃতি আর আজকের আমেরিকান ও পাশ্চাত্য সভ্যতা-সংস্কৃতি অধিকন্তু রুশ সভ্যতায় বাস্তবে কোনও পার্থক্য নেই। এই সকল সভ্যতা এক ও অভিন্ন। যাকে আমরা কারিগরি, বস্তুগত আবিষ্কার, কাল্পনিক ও বাহ্যিক সভ্যতাও বলতে পারি। যেভাবে অনেক মুসলমান লোক এই সভ্যতাকে দেখে বলে– এসব মানুষের জ্ঞানবুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার চরম উৎকর্ষতা! সুতরাং যদি মরু সাহারার বেদুঈন তখনকার সভ্যতা-সাংস্কৃতি দেখে এ কথা বলত, তবে তাকে নির্দোষ অক্ষমই মনে করা হত। সে তো সভ্যতা-সংস্কৃতির চাকচিক্য-বৈচিত্র সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিল। দৃষ্টিনন্দন ঝলমলে কোন প্রদর্শনী কিংবা চোখ ঝলসানো কোন দৃশ সে কখনও দেখে

নি। আর যদি রোমের কোন শহর, বায়জেন্টাইন সাম্রাজ্যের কোনো শহর কিংবা ইরানের সাসানী রাজত্বের কোনো শহরে প্রবেশ করে তাদের মুখে পানি এসে যেত, ঐ সভ্যতায় অভিভূত হয়ে যেত এবং বলতে শুরু করত– কি বলব এই সভ্যতার, এই শিল্প-কারিগরি আর এই বিত্ত-বৈভবের কথা! মানুষের বুদ্ধি-জ্ঞান কতদূর পৌঁছে গেছে! কেমন সভ্যতার জন্ম দিয়েছে! যদি সে একথা বলত, আমি তাকে নির্দোষ-অপারগই মনে করতাম। কারণ, সে ছিল আরব মরুভূমির একজন বেদুঈনই। যার চোখ দুটি এক উন্নত দেশের রাজধানীতে এসে বিস্ময়ে হতবাক-হতবিহ্বল হয়ে পড়েছে। সে এই সভ্যতার সামনে হুঁশহারা হয়ে গিয়েছে। কিন্তু ইতিহাসের পাঠক কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যান এবং তার বিস্ময়ের কোনও অন্ত থাকে না। মানব ইতিহাসে স্বজাতির ভূতপূর্ব এই বিস্ময়কর অভিজ্ঞতার সামনে স্বীকৃতির সাথে তার মস্তকাবনত হয়ে যায়, যখন সে দেখে– আরব মুসলমান এই সভ্যতায় মোটেও প্রভাবিত হয় নি বরং নিজের ইসলামী ব্যক্তিত্ব ও স্বকীয়তার অতন্দ্র প্রহরী ও দুঃসাহসী রক্ষী হয়ে থাকে।

আজ মুসলিম বিশ্বের কোনো দেশের রাজধানী, যেমন আরব আমিরাতে আবুধাবী অথবা কাতারের দোহার কথাই ধরুন। সেখানে আজ আমরা অনিবার্য ভাবতে শুরু করেছি যে, আমাদের ঘরবাড়ির নির্মাণশৈলী ও ফর্নিচার একেবারে ঠিক তাই হতে হবে, যেমন হয় ইংলাণ্ড-আমেরিকায়। আমাদের সভ্যতা এবং তাদের সভ্যতায় পুরোপুরি মিল ও সমতা থাকতে হবে। কিন্তু একবার ভাবুন! সেই আরবী ও বেদুঈন মুসলমান কিভাবে নিজের ইসলামী স্বকীয়তাকে দৃঢ়হস্তে অটুট-অক্ষুণ্ন রেখেছে; রোম ও পারস্য সভ্যতার সামনে মাথা নত করে নি। এটা ইতিহাসের এক নিগূঢ় রহস্য, যা উদঘাটন করা প্রয়োজন। এর সমাধানে চিন্তা-গবেষণা করা দরকার। এটি একটি বড় প্রশ্ন। অবশ্যই এর প্রশান্তিমূলক জবাব প্রয়োজন।

আমার মতে এ প্রশ্নের জবাব হল, এসব কিছুই মুসলমান পুরুষ ও নারীর আত্মবিশ্বাসের সুফল, আত্মনির্ভরতার ফসল। তাদের মধ্যে নিজের দ্বীন-ঈমান, আল্লাহ পাকের শেষ পয়গামের যোগ্যতা এবং মানুষের জন্য পূর্ণাঙ্গ ও স্বয়ংসসম্পূর্ণ পথদিশারী দ্বীনের উপর পরিপূর্ণ ভরসা ছিল। ইসলামী ব্যক্তিত্ব-স্বকীয়তা, ইসলামী জীবন, যার মডেল তারা রাসূলে কারীম (সা.) ও তাঁর সাহাবায়ে কিরাম (রাযি.) এর জীবনে দেখেছিল এবং তাদের পর্যন্ত পৌঁছেল সেসব মহামানবদের মাধ্যমেই। লাজ-শরম, পুত-পবিত্রতা, নিষ্কলুষতা, পর্দা-সামাজিক শিষ্টাচার, বিনয়-নম্রতা, স্বচ্ছতা-নির্মলতা, ইসলামী চেতনা-

মূল্যবোধ, অনাড়ম্বরতা, স্বততা, মিথ্যাচার, অপব্যয় না-করা, অল্পেতুষ্টি, পারস্পরিক সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন, ন্যায়-নিষ্ঠা ও ইনসাফ, দাম্পত্য অধিকার সংরক্ষণ, আত্মীয়তার অধীকার রক্ষা, ছোটদের স্নেহ-মমতা, বড়দের ইজ্জত-সম্মান এগুলো এমন গুণ ও বৈশিষ্ট্য, যা পুরুষদের সাথে নারীদের পুরোপুরি সাহায্য-সহযোগিতার ফলাফল। এভাবে তারা ইসলামী সভ্যতা, ইসলামিক সংস্কৃতি ও ইসলামী ব্যক্তিত্বের সংরক্ষণ করেছেন। পুরুষ কর্মব্যস্ত থেকেছে জীবন সংগ্রামে, স্কুল-মাদরাসায়, কোর্ট-কাচারীতে এবং ঘরের বাইরের জগতে আর নারীরা গৃহাভ্যন্তরে। এভাবে সে সমাজ পূর্ণাঙ্গ ও পরিপূর্ণ সাম্য, একতা ও পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতার মূলনীতির উপর পরিচালিত ছিল। মুসলমানদের জন্য বিশ্বের বড় বড় এবং চরম উন্নত শহরে গিয়ে ইসলামী জীবনাদর্শ পেশ করা কোন কঠিন কাজ ছিল না। তাদের পদধুলি লেগেছে ইনতাকিয়ায়। তারা দিমাশ্ক, হাল্ব ও হিম্ছে রাজত্ব করেছে। গিয়েছে কনস্টান্টিনোপল। সিন্ধু জয় করেছে। মুলতান, বুখারা সময়কন্দ তাদের পদধুলি পেয়ে ধন্য হয়ছে। দিল্লি তাদের পাপোশ হয়ছে। লাহোর লক্ষ্ণৌ তাদের পদভারে ধন্য হয়ছে। এসব শহর নিজস্ব সভ্যতার অধিকারী ছিল, যা ছিল খুবই প্রাচীন ও উন্নত। তাদের উন্নত রুচিবোধ ছিল। কিন্তু মুসলমান যেখানেই যেত, নিজস্ব সভ্যতা-সংস্কৃতি সঙ্গে নিয়ে যেত। তারা কেবল নিজের সভ্যতার সংরক্ষণই করত না বরং সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রভাব সুদৃঢ় করে ছাড়ত। অনেক লোক তাদের সভ্যতার অনুরাগী ও প্রেমিক হয়ে যেত। অবশেষে ওই প্রাচীন সভ্যতার প্রদীপকে স্তিমিত হয়ে যেতেই হত। দীপ্তিমান ইসলামী সভ্যতার সূর্য হয়ে যেত আলোকোজ্জ্বল। মুসলমান স্পেন গিয়েছে। এই স্পেন ইউরোপের একটি দুর্গ। মুসলমানগণ সেখানে উন্নত ও চমৎকার সভ্যতার ভিত্তি স্থাপন করেছে। আবিষ্কার করেছে নতুন এক নির্মাণশৈলী ও স্থাপত্য কলা, যা আজও স্পেনের কোথাও কোথাও শোভা পাচ্ছে। আজও সেই কর্ডোবার জামে মসজিদ, আল-হামরা প্রাসাদ ও আশবেলিয়ার মসজিদগুলো থেকে উন্নত উৎকৃষ্ট কোনও কিছু পর্যটকদের ভ্রমণ ও পরিদর্শনের জন্য স্পেন পেশ করতে পারে না। ভারত উপমহাদেশ স্বদেশে অসংখ্য প্রাচীন নিদর্শন থাকা সত্ত্বেও তাজমহল অপেক্ষা অধিক সুন্দর সুরম্য, জামে মসজিদ ও লাল কেল্লার চেয়ে বড় কোনও সম্মান ও প্রভাবময় নিদর্শন উপস্থাপন করতে পারে না। মুসলমান সর্বত্রই তাদের সভ্যতা-সংস্কৃতি সঙ্গে নিয়ে গিয়েছে। সেখানে তারা এর পানি সিঞ্চন করেছে। একে দিয়েছে আরও প্রশস্ততা। বানিয়েছে সুন্দর থেকে আরও সুন্দর। তারা

উপকৃতও হয়েছে। সেখানকার বিনির্মান ও স্থাপত্য শিল্প, সেখানকার রুচিশীলতা ও মননশীলতা এবং সেখানকার সৌন্দর্য-সৌকর্যকে তারা উপেক্ষা করেনি বরং তার উপর ইসলামী সভ্যতাকে বৃদ্ধি করেছে।

পাশ্চাত্য সভ্যতার সঙ্গে আমাদের উঠাবসা

কিন্তু আক্ষেপ! বাস্তবেই আজ পাশ্চাত্য সভ্যতার সাথে আমাদের সেই আচরণ বাকী নেই, যা ছিল আমাদের প্রবীন বুযুর্গ পূর্বপুরুষদের পারস্য ও রোম সভ্যতা-সংস্কৃতির সঙ্গে। আজ প্রশ্ন হয়, বর্তমান ইসলামী সমাজ কেন বিদ্যমান পাশ্চাত্য সমাজের সম্মুখে পরাজিত হয়েছে। অথচ আজকের পাশ্চাত্য সভ্যতা সমকালের জন্য তৎকালীন রোম ও পারস্য সভ্যতা অপেক্ষা অধিক উন্নত ও প্রভাবশালী একথা কেউ বলতে পারবে না। সেকালে মুসলমানগণ নিজের সভ্যতা-সংস্কৃতিকে জবাই করে নি (একে বলি দেয়নি) বরং তারা গর্ব ও শ্রদ্ধার সাথে বলত– আমাদের সভ্যতাই শ্রেষ্ঠ। আমাদের সাহিত্য-নিবন্ধ তোমাদের চেয়ে প্রাচীন। আমাদের শিক্ষা- দীক্ষাই সর্বোত্তম। আমাদের আদর্শ, চরিত্র, নৈতিকতা ও শিষ্টাচার উঁচু এবং অতি উত্তম।

প্রতিরোধের স্থলে আনুগত্য

পাশ্চাত্য সভ্যতা সম্পর্কে আমাদের ধ্যান-ধারণা রোম-পারস্য সভ্যতা সম্পর্কে আমাদের প্রবীন বুযুর্গদের অবস্থান থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এর প্রথম কারণ আমাদের ঈমানের দুর্বলতা, আত্মবিশ্বাস ও আত্মনির্ভরতার অভাব এবং আত্মমর্যাদাবোধের অবসান। আমাদের সামনে পাশ্চাত্য সভ্যতার কোনও জিনিস এলে আমরা ঝাঁপিয়ে পড়ি। আমরা অকপটে নির্দ্বিধায় বলে উঠি, আধুনিক বিশ্বের এই উন্নতি সম্পর্কে আমাদের পূর্বপুরুষগণ অবগত ছিলেন না। আমাদের উপমা ওই শিশুর মত, যার লালন-পালন ও ক্রমবিকাশ হয়েছে কোনও গ্রামে। এরপর হঠাৎ সে বড় কোনও শহর দেখার সুযোগ পেয়েছে। তখন সে প্রত্যেক জিনিস সম্পর্কেই প্রশ্ন করে। তক্তার উপর চলন্ত রেলগাড়ী, আকাশে উড়ন্ত বিমান ইত্যাদি সবকিছুই তাকে আকৃষ্ট করে; তার মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে যায়। আমাদের সমাজ এখনও প্রাপ্ত বয়সে পৌঁছায়নি। এটা শিশুতুল্য সমাজ। অথচ আমাদের উচিত ছিল তাদের সভ্যতা-সংস্কৃতিকে চ্যালেঞ্জ করা এবং পূর্ণ শক্তিসহ বলা, হে পাশ্চাত্যবাসী! আমাদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করো! আমাদের থেকেই সবক নাও লজ্জা-শরম ও পুতঃপবিত্রতার। তোমরা যদি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, স্বচ্ছতা, মধুময় আনন্দঘন, সৌন্দর্য এবং হেদায়াত, পরিশুদ্ধি ও সৎ জীবন-যাপন করতে চাও, তবে আমাদের সম্মুখে ছাত্রের মতো

বিনীত হয়ে বসো। কিন্তু আমাদের মধ্যে একথা বলার দুর্বার সাহস নেই। কাজেই আমাদের নিজের ব্যক্তিসত্তা, নিজের দ্বীন-ঈমান, নিজের আকীদা-বিশ্বাস, নিজের আল্লাহ প্রদত্ত যোগ্যতাসমূহ এবং নিজের জ্ঞান-বুদ্ধির উপর আস্থা নেই। আমরা বেশ আস্থাহীনতা ও ভ্রান্ত বিশ্বাসের শিকার হয়ে গিয়েছি। আমরা সভ্যতা-সংস্কৃতি ও মানবীয় মূল্যবোধে অন্যের হাতের পুতুল ও ভিখারী হয়ে গিয়েছি। পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাব-ক্রিয়া এবং তার গুরুত্ব ও সম্মানবোধ আমাদেরকে বকরী পালের মতো হাঁকিয়ে নিতে শুরু করেছে। আমাদের হুঁশ জ্ঞান ও চেতনাকে লোপ করে দিয়েছে। আমরা তাতে পতঙ্গের মতো পতিত হচ্ছি। আমরা এভাবে ওই সভ্যতার উপর অকুণ্ঠ ঝাঁপিয়ে পড়ছি, যেভাবে তৃষ্ণাকাতর পানির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। একটি প্রদীপ ছিল। যার আলো দেখে পতঙ্গরা ছুটে আসে এবং তার কিরণে ছটফট করে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। আমরা আজ পাশ্চাত্য সভ্যতার সামনে নিজের বাস্তবতা, নিজের শক্তি-সামর্থ্য ও অধিকারকে অতীত কাহিনী বানিয়ে দিয়েছি। আমাদের যদি উপকৃত হওয়ারই প্রয়াস থাকত, তবে অবশ্যই আমরা আপন লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের জন্য কল্যাণকর ও ফলপ্রসূ জিনিসগুলো গ্রহণ করে নিতাম এবং خذ ما صفا ودع ما كدر (নির্মল যা, গ্রহণ করো আর কদর্য যা, পরিহার করো) –এই প্রাচীন বিজ্ঞবচনের উপর আমল করতঃ সেসব পবিত্র-পরিচ্ছন্ন জিনিসকেই গ্রহণ করতাম, যা আমাদের আকীদা-বিশ্বাস, চরিত্র ও মর্যাদার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হত। আমরা পাশ্চাত্যের কারিগরি শিল্প, টেকনোলজি এবং সহজতা ও আরামের কার্যকরি উপকরণগুলো গ্রহণ করে তাদেরকে আমাদের অনুগত-তাঁবেদার, পরিবেশ মাফিক এরূপভাবে বানাতাম, যাতে এই সভ্যতা-সংস্কৃতি আমাদের অধীন অনুগত হয়ে থাকত।

ইসলামী সভ্যতা সংরক্ষণে নারীদের ভূমিকা

অনৈসলামিক সভ্যতা-সংস্কৃতির ব্যাপারে মুসলিম রমণীদের অবস্থান ছিল এক চমকপ্রদ ও সম্মানজনক। যদি মুসলিম রমণীদের সেই দৃষ্টিভঙ্গি না থাকত, তাহলে মুসলমান পথপ্রদর্শক, উমারা ও শাসকবর্গ, সুলতান ও রাজা-বাদশা এবং ইসলামী সেনা কমাণ্ডারগণ ইসলামী সমাজ, ইসলাম ব্যক্তিত্ব ও ইসলামী সভ্যতা-সংস্কৃতির সংরক্ষণ করতে পারত না। যদি আল্লাহ ভীরু, সৎ-নিষ্ঠাবান, আমানতদার সম্ভ্রান্ত, পরিপক্ক ঈমানের অধিকারিণী রমণীগণ ইসলামী সভ্যতা ও ইসলামী স্বকীয়তা সংরক্ষণ ও তার স্থায়িত্বের জন্য পুরুষদের সাথে পুরোপুরি সাহায্য না-করত।

ইসলামিক পরিবার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা এবং এমন ইসলামি ঘরের, যা ইসলামিক পৃষ্ঠপোষকতায় সফলতার উচ্চ শিখরে আরোহন করছিল এবং যেখানে সততা, পুতঃপবিত্রতা, প্রেম-ভালবাসা, নিরাপত্তা ও শন্তির পরিবেশ ছিল, তা নির্মাণে পুরুষদের হাত শক্ত না-করত, যদি ইসলামী স্বকীয়তার রক্ষক আল্লাহর সম্মানী সৎকর্মশীল নেক বান্দীগণ তাদের সম্ভ্রান্ত পুরুষদের সাহায্য না-করত এবং তাদের সহায়তা না-দিত, তা হলে মুসলমানদের আপন স্বকীয়তা ও ইসলামিক সভ্যতা-সংস্কৃতি নিয়ে টিকে থাকা মুশকিল ছিল। সে সব রমণীর ইসলামিক স্বকীয়তা রক্ষাই নয় বরং ইসলামী অস্তিত্বের স্থায়িত্ব এবং অক্ষুণ্ণতায়ও বিরাট ভূমিকা রয়েছে। তাদের রক্ষণাবেক্ষণের ফলে দ্বীন-ধর্ম আপন সভ্যতা-সংস্কৃতি, সামাজিকতা, চরিত্র ও নৈতিকতা এবং শ্রেষ্ঠত্ব ও ধ্যান-ধারণাসহ নিরাপদ-অক্ষত অবস্থায় আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেছে।

নারীদের কাছে আজও সেই প্রত্যাশা

আজও আমাদের মুসলিম সমাজের এই মহান স্তম্ভ এবং ইসলামী কায়ার এই প্রভাবময়ী ও কর্মঠ গোষ্ঠীর কাছে সেই প্রত্যাশা। আমার বিশ্বাস তারা পাশ্চাত্য সভ্যতার ছায়ামূর্তি বা প্রতিচ্ছবি হওয়ার স্থলে নিজের উপর পাশ্চাত্য সভ্যতার ছোঁয়াও লাগতে দিবে না। তাদের উচিত এই পাশ্চাত্য সভ্রতার পেছনে দৌড়ানো ও প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার পরিবর্তে তার প্রয়োজনীয় ও উপরকারী অংশগুলো গ্রহণ করা আর প্রত্যেক সেই জিনিস বর্জন করা, যা তাদের দ্বীন-ঈমান, তার সম্মান-মর্যাদা, ভদ্রতা-আভিজাত্য, তাদের স্বভাব-চরিত্র ও শিষ্টাচার এবং তাদের ইসলামী স্বকীয়তার পরিপন্থী। আমাদের ঘরগুলো হতে হবে ইসলামিক আদর্শ-মডেল। যদি কোন ইউরোপীয়ান লোক আসে আর কোন মুসলমানের ঘরে প্রবেশ করে, তবে সে দেখবে– ইসলামী আইন-শৃঙ্খলা, সভ্যতা-সংস্কৃতি, লাজুকতা ও পুতঃপবিত্রতা, লজ্জা ও পর্দা, শ্রদ্ধাবোধ, ছোটদের প্রতি স্নেহ-মমতা, ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্বের ইসলামী দৃশ্যপট। আরও দেখবে– সে স্বামী-স্ত্রী, ভাই-বোন, বাবা-মায়ের মধ্যকার হৃদ্যতাপূর্ণ সেই পবিত্র সম্পর্ক। তার চোখে প্রতিভাত হবে সেই সুখকর জীবন পদ্ধতি-যার সম্পর্কে সে মোটেও জানত না; ছিল সম্পূর্ণ অজ্ঞ। আমরা তাদের অনুসরণ করব না বরং তারা আমাদের দেখে যখন ফিরে যাবে, তখন তাদের প্রাণের স্পন্দন হবে– 'আমাদের ইসলামিক সভ্যতা-সংস্কৃতির অনুকরণ করা উচিত।' তারা নিজের বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনদের কাছে গিয়ে বলবে, আমি এক

ইসলামিক রাষ্ট্রে সামান্য সময় কাটিয়েছি আর যা দেখেছি ভাষায় বর্ণনাতীত। সত্য বলতে আমি এক ভূস্বর্গ (পৃথিবীর জান্নাত) দেখে এসেছি। আমি এক মুসলমানের ঘর কি দেখেছি, যেন জান্নাতই দেখে ফেলেছি! আল্লাহর শপথ! এই ইসলামিক জীবনই জান্নাত আর আমরা যে জীবন যাপন করছি, তা জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড, আগুনের ভাটি। এখান থেকে প্রত্যাবর্তনকারী আমেরিকান সেখানকার আমেরিকানদের গিয়ে বলবে, হে মানুষ! তোমরা জাহান্নামে জ্বলছ! আল্লাহর শপথ! মুসলমান জান্নাতের স্বাদ উপভোগ করছে। কিন্তু আক্ষেপ! এখানকার মানুষ ইউরোপ-আমেরিকা গিয়ে দেখে, এই আরব রাষ্ট্রগুলো এক সংস্করণ, এসব এক পুস্তকের একই এডিশন। যেখানে পৃষ্ঠা, লাইন, বর্ণ সবই একরকম। সেখানকার মানুষ এখানে আসে, তখন একে পাশ্চাত্য সভ্যতার পূর্ণাঙ্গ চিত্র পরিলক্ষিত হয়। তাই সে পার্থক্য করতে পারে না, এই স্থিতিশীলতা, শান্তি-নিরাপত্তা, সুখ-সম্মান, প্রেম-ভালবাসা আত্মিক প্রশান্তি ইসলামিক জীবনের পরম বৈশিষ্ট্য।

আমি বলছি না, আপনারা বিদ্যুৎ, মোটরযান এবং সভ্যতার অন্যান্য অনায়াসলভ্য আবিষ্কার থেকে বিমুখ হয়ে যান বরং আমি বলছি, সর্বোচ্চ মর্যাদা ও আমাদের ইসলামী সভ্যতা থাকতে হবে। আর আপনারা নিজের জ্ঞান-বুদ্ধি, নিজের মেধা-শ্রম, নিজের দৃঢ় ইচ্ছা ও সংকল্পের মাধ্যমে, যাতে নারীরা প্রসিদ্ধ এবং স্ব-ইচ্ছায় দৃঢ়চিত্ত হয়। সত্য-সঠিক ইসলামিক জীবন-যাপন করতে পারে। আপনারা কাতার মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় এর সম্মানিত ছাত্রীগণ একটি নতুন মহাসড়ক প্রতিষ্ঠা করতে পারেন। আপনারা পাকিস্তানী, ইন্দোনেশিয়ান ও ভারতীয় নারীদের জন্য পথকে মসৃণ ও সুগম করার যোগ্যতা রাখেন। কারণ, আপনাদের নেতৃত্ব ও পথ-প্রদর্শনের অভিজ্ঞতা রয়েছে। আপনারা এই ইসলামিক আরব শহরে বিশ্ব মানবতা ও মুসলিম বিশ্বের আন্তর্জতিক ও বিশ্বব্যাপী ভ্রাতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত।

আমি এই আবেদন রেখেই আমার কথা শেষ করছি। সেইসঙ্গে আমার সম্মানিত, সম্ভ্রান্ত ও বিজ্ঞ বোনদের সাথে কথোপকথনের যে বরকতময় সুযোগ পেয়েছি, এর জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। আমি আশা করি, যেসব কথা বলা হয়েছে, নিশ্চয় তা বুঝতে পেরেছেন এবং ইন্‌শাআল্লাহ তা ফলপ্রসূ হবে আর এই শহর এই অভিজ্ঞতাকে বাস্তব রূপদানে নেতৃত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।[১]

---

[১] খাওয়াতীন আওর দ্বীনে ইসলাম: ১৯-৩৯।

মুসলিম নারীদের শিক্ষা ও ধর্মীয় কীর্তি

ইলমের ভূবন নারীদের কৃতিত্বে দীপ্তিমান

আমার আক্ষেপ! জাতির জ্ঞানীগুণীদের শত-সহস্র ইতিহাস রয়েছে। কিন্তু শিক্ষিতা, বিদ্বান নারী জাতির ইতিহাস খুবই কম লেখা হয়েছে। অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা উত্তম প্রতিদান দিবেন ঐতিহাসিক ও জীবনী রচয়িতাগণকে, যেমন ছিলেন ইবনে খালকান। যেমন, তব্কাতুশ্ শাফি'আতিল কুররা, তবকাতে হানাবেলা প্রভৃতি রচয়িতা। তিনি নারীদেরকে একেবারে উপেক্ষা করেন নি বরং সাহিত্যের ইতিহাসসমূহে তাদের নাম আছে। আমি শুধু একটি উদাহরণ দিচ্ছি, হয়তো অনেকের জন্যই স্পষ্ট হয়ে যাবে। অর্থাৎ নারীদের শিক্ষামূলক শ্রম-সাধনা, শিক্ষামূলক চেষ্টা-সংগ্রাম, শিক্ষামূলক আগ্রহ-উদ্যম, আবেগ-উচ্ছাস ও কর্মকানেণ্ড সাফল্য লাভের এমন এক দীপ্তিমান ও চমকপ্রদ দৃষ্টান্ত রয়েছে– যার ফলে মানুষের উপর এক বিস্ময়কর অবস্থার সৃষ্টি হয়ে যায়। আপনাদের কাছে জিজ্ঞাসা– কুরআনে কারীমের পর ইসলামের পূর্ণ গ্রন্থাগারে এবং এই পূর্ণ জ্ঞান-ভাণ্ডারে– যা রাসূলে কারীম (সা.) এর অনুগ্রহ হিসেবে এই উম্মতকে দান করা হয়েছে, এর ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে 'ইলম বিল কলম' এর অহীর দ্বারা– তাঁর কলমের আঁচড়ে পৃথিবীতে যে ভূতপূর্ব গ্রন্থাগার তৈরি হয়েছে, সেখানে কিতাবুল্লাহর পরে কার স্থান? এ প্রশ্নের জবাবে করলে সর্বসম্মতভাবে সকলেই বলবেন, সহীহ বুখারীর স্থান। আর আপনারা জানেন, সহীহ বুখারী আমাদের ভারত উপমহাদেশে প্রত্যেক মাদরাসার জন্য উচ্চ শিক্ষার মানদণ্ড। একে ইসলামের আলেমগণ

أصح الكتب بعد كتاب الله

তথা কুরআনের পর সবচেয়ে বিশুদ্ধ গ্রন্থ বলেছেন আর হযরত শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ (রহ.) তাঁর 'হুজ্জাতুল্লাহিল বলেগাহ' গ্রন্থে সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম সম্পর্কে লিখেছেন–

وكل من يهون شانهما فهو مبتدع تبع غير سبيل المؤمنين

অর্থাৎ যে ব্যক্তি এ দুটি কিতাবের অবমাননা করবে, এতদুভয়ের সাথে তাচ্ছিল্যের আচরণ করবে, এ দুটির জন্য কোনও সমালোচনামূলক ঘৃণ্য শব্দ ব্যবহার করবে কিংবা এতদুভয়ের গুরুত্ব হ্রাস করবে, সে

مبتدع ومتبع غير سبيل المؤمنين (বিদ'আতী এবং অমুসলিমদের পদাঙ্ক অনুসরণকারী)। সে মুমিনগণের পথ ছেড়ে দিয়েছে।

হাদীস শাস্ত্রে নারীদের স্থান

আজ আমাদের মাদরাসাগুলোতে বুখারী শরীফ পড়ানো হয় এবং ভবিষ্যতেও পড়ানো হবে। আপনারা এই বুখারী শরীফ কার রিওয়ায়েতে বর্ণনা? কারীমা (রহ.) এর রিওয়ায়েত। ইমাম বুখারী (রহ.) এর অসংখ্য অগণিত শিষ্যদের মধ্যে কারীমার যত শিষ্য রয়েছে– আমার অধ্যয়ন ও জানামতে তার শিষ্যদের শিষ্য সংখ্যাও তদ্রুপ অসংখ্য অগণিত আর তার রিওয়ায়েতকে আল্লাহ তা'আলা যে গ্রহণযোগ্যতা দান করেছেন, সম্ভবত তার অপর কোনও শিষ্যকে এরূপ গ্রহণযোগ্যতা দান করেন নি। শাইখুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমূদুল (রহ.) যে বুখারী শরীফ পড়েছেন এবং পড়িয়েছেন, হযরত মাওলানা খলীল আহমদ সাহরানপুরী (রহ.) যে বুখারী শরীফ পড়েছেন এবং পড়িয়েছেন, শাইখ হুসাইন ইবনে মুহসিন আনসারী (রহ.) ভূপালে যে দরস দিয়েছেন এবং শাইখুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া (রহ.) (আল্লাহ তাদেন মাগফেরাত করুন) যে বুখারী পড়াতেন, তা ওই মহিয়সী কারিমার রিওয়ায়েত। কত বড় সৌভাগ্য! কোনো জাতি কি এই নযীর পেশ করতে পারবে? যখন ইমাম বুখারী (রহ.) এর শিষ্যগণ শ্রম-সাধনা কনেছেন আর আল্লাহ পাক তাঁর শিষ্যদের প্রচেষ্টাকে যেভাবে সাফল্য দান করেছেন এবং তাদের সুনাম-সুখ্যাতি আজ বিশ্বজুড়ে অক্ষুণ্ন রয়েছে, তদ্রুপ তাঁর ছাত্রীগণের চেষ্টা-সাধানাগুলোও কিছুটা বেশিই সফল করেছেন। আর এ ব্যাপারখানা আমাদের ইসলামী সমাজে শেষ অবধি অটুট-স্থায়ী রয়েছে। একবার কেউ হযরত মাওলানা লুতফল্লাহ (রহ.) এর বিরুদ্ধে অভিযোগ করল, তিনি ভূ-পালকে নাকি সোমনাথ বলেন। হযরত বলেন– না, আমি সেকথা বলি না। আমি বলি, সালতানাতে মুমিনাত (মুমিনাহ রাজত্ব)। এই মুমিনাহ রাজত্ব ছিল সাফল্যের স্বর্ণশিখরে। নবাব সেকান্দর জাহাঁ বেগম, নবাব শাহজাহাঁ বেগমের মতো বিদ্বান-পণ্ডিতের যুগ ছিল। সেখানকার প্রধান মুফতী ছিলেন মাওলানা মুফতী আব্দুল কাইয়ূম (রহ.), মাওলানা আব্দুল হাই বুরহানবী, যিনি হযরত সাইয়িদ আহমদ শহীদ (রহ.)

-এর প্রথম ও প্রধান খলীফা ছিলেন। [তিনি শাহ ইসমাঈল শহীদ (রহ.) থেকে প্রথম খেলাফত পান; তার সুযোগ্য পুত্র ছিলেন।] মাওলানা মুফতী আব্দুল কাইয়ূম এর জীবনকর্ম ভূপালের লোকেরা বর্ণনা করেছে আর মাওলানা হায়দর হাসান খান বলতেন– তার কাছে কোন মামলা-মুকদ্দমা আসল। আর তিনি তার কোনও সিদ্ধান্ত দিতে পারলেন না বরং ভাবনায় পড়ে গেলেন, এই সমস্যার বিশুদ্ধ শরঈ সমাধান কি হবে? তখন বলতেন, সামান্য অপেক্ষা করুন আমি এক্ষুণি আসছি। এরপর ঘরে গিয়ে আপন স্ত্রী, হযরত মাওলানা শাহ ইসহাক সাহেবের সুযোগ্য কন্যাকে জিজ্ঞাসা করতেন– তুমি কি এ বিষয়ে তোমার আব্বাজান থেকে কোনও বর্ণনা শুনেছ কিংবা এ ব্যাপারে তোমার কোনও সমাধান জানা আছে? এরপর ফিরে এসে সমাধান দিতেন। আবার কখনও অকপটে বলে ফেলতেন, একটু সময় দিন! বিবি সাহেবাকে জিজ্ঞাসা করে আসি। কোনো দৃষ্টান্ত কি এই বিশ্ববুকে এরূপ আছে? আজ পাশ্চাত্যের দাবি কত বড়! এর কি বাস্তবতা আছে?

সাহিত্যে নারীদের অনুক্রম

আমাদের এখানে সাহিত্য জগতে পর্যন্ত ওয়ালাদাহ বিনতে মুস্তাকফার নাম স্মরণীয় হয়ে আছে। স্পেনের কোনো আমীরের কন্যা ছিলেন তিনি। তার সাহিত্য ও কাব্যসভা এমনভাবে অনুষ্ঠিত হত, যেভাবে বাদশাহের দরবার অনুষষ্ঠিত হত। বড় বড় কবি-সাহিত্যিকগণ তার কাছে উপকৃত হওয়ার জন্য আসত। আমি আর কতদূর পর্যন্ত উদাহরণ দিব। ইতিহাস তো আমার দুর্বল। আমি এ বিষয়ে বিশদ আলোচনায় যেতে চাই না। (আমি তো কুরআনে কারীমের সেই বিস্ময়কর অলৌকিকতার স্বাদ উপভোগ করতে চাই এবং বলতে চাই মহান আল্লাহ বলেছেন, لاأضيع عمل عامل منكم এখানে আমল এবং আমলকারী উভয়ই অনির্দিষ্ট। অর্থাৎ কোনও আমলকারীর কোনও আমল আমি নিষ্ফল করি না, যাতে তোমরা চেষ্টা করবে পুরুষ বা নারী; যদি তোমরা ইবাদত-বন্দেগীতে চেষ্টা কর,তবে আমি তোমাদেরকে রাবেয়া বসরীর পুণ্যস্থান বরং তারও উপরের স্থান পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পারি।

শিক্ষা জগতে নারীদের কীর্তি

আমি আপনাদেরকে আল্লাহর শপথ করে বলছি, দ্বীনের আহকাম তথা ধর্মীয় বিধি-নিষেধের উপর আমল করার দ্বারা এবং দ্বীনের জরুরী জ্ঞানার্জন ও এর উপর আমল করার দ্বারা নারী জাতি ইসলামের ইতিহাসে, ইসলামী

দুনিয়ায় এমন এমন উন্নতি অর্জন করেছে এবং আধ্যাত্মিকাতর এমন উৎকর্ষতায় পৌঁছিয়েছে, যে পর্যায়ে ওই যুগের হাজার হাজার নয় লাখ লাখ পুরুষ পর্যন্ত পৌঁছুতে পারে নি। আজ আমি আপনাদের জিজ্ঞাসা করি–রাবেয়া বসরীর নাম কি আপনারা শোনেন নি? এ রাবেয়া বসরী কে ছিলেন? তার যুগে শত-সহস্র নয় লাখ লাখ পুরুষ তার সমপর্যায়ে পৌঁছুতে পারে নি। এ ছাড়া ইতিহাস পাঠ করুন! স্বয়ং নারীদের এবং মুসলিম বিদ্বান ও কবি-সাহিত্যিক রমণীদের অনেক ইতিহাস পৃথক পৃথকভাবে রচিত হয়েছে। আপনারা ইতিহাস পাঠ করুন! তা হলে জানতে পারবেন, শিক্ষাগত দিক থেকেও আমাদের বোনেরা পূর্বযুগে এমন মর্যাদা ও সম্মানে পৌঁছেছেন যে ইতিহাসের পাতায় পাতায় নাম এসেছে, তৎকালীন বড় বড় আলেম বিদ্বান ও পণ্ডিতজনেরাও তাদের শরণাপন্ন হতেন। আজ এ মুহূর্তে আমি তাদের নাম বলে শেষ করতে পারব না। তারা অনেক ছিলেন। সবার কথা আমার স্মরণও নেই। উন্দুলুস, বাগদাদ, কাহেরাহ ও হারামাইনে (মক্কা-মদীনায়) এমন অনেক রমণী ছিলেন, যাদের কাছে লোকজন বিভিন্ন মাসয়ালা জিজ্ঞাসা করতে হাজির হত। আরবী শব্দকোষ জানতে ও তত্ত্বানুসন্ধান করতে যেত। তাদের থেকে জ্ঞানার্জন ও শিক্ষামূলক উপকার লাভের জন্য গমন করত। ইতিহাসের পাতায় পাতায় তাদের নাম উল্লেখ আছে। তাদের শিষ্যদের নামও আছে। কত বড় বড় শিষ্য তৈরি হয়েছেন! সুতরাং এই রত্ন, জ্ঞানের রত্ন কেবল পুরুষদের সাথেই নির্দিষ্ট নয়; নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য।

ভারতে নারীদের ধর্মীয় কীর্তি

আপনারা ভারতের ইতিহাসই পড়ুন, তা হলে জানতে পারবেন, এখানে কত কত মুসলিম রমণী কুরআনের শিক্ষা, ধর্মীয় বিষয়ের প্রচলন, বিদ'আত নির্মূল এবং সুন্নাতসমূহের ব্যাপক প্রসারে কাজ করেছেন। কেবল এক শাহ ওয়ালী উল্লাহ (রহ.) এর বংশই দেখুন! এই বংশে এমন এমন রমণীর শুভাগমন হয়েছে, যারা দিল্লিতে আবার কখনও দিল্লির বাইরেও তাঁদের কল্যাণের অবিরাম বারিধারা প্রবাহিত করেছেন। ন্যূনপক্ষে এ কি কম ছিল যে, তাঁদের প্রশিক্ষণ এবং তাঁদের স্নেহময় কোলে জন্ম নিয়েছেন শাহ আব্দুল কাদের (রহ.), শাহ রফীউদ্দিন (রহ.), শাহ আব্দুল আযীয (রহ.)–এ সকল মনীষী কার কোলে জন্ম নিয়েছিলেন? তারপর আমাদের এখানে উর্ধ বংশে দেখুন। এ বংশে কেমন রমণীগণ জন্ম নিয়েছেন! আমি ছোট্ট একটি উদাহরণ দিচ্ছি, হযরত সাইয়িদ আহমদ শহীদ (রহ.) রায়বেরলীতে

জন্মগ্রহণ করেন। কেবল সেখানকার বংশেই নয় বরং গোটা ভারতেই তার ফয়েয ও কল্যাণের বারিধারা বয়ে গিয়েছে। তার হাতে ২৫/৩০ হাজার লোক ইসলাম গ্রহণ করেছে। প্রায় ৩০ লাখ লোক তাঁর হাতে বাই'আত ও তাওবা করেছে। তাঁর জীবনী গ্রন্থে লেখা আছে, দেখতে শুনতে তো খুবই তুচ্ছ ব্যাপার মনে হবে। কিন্তু কোন পর্যায়ের কত উঁচু ব্যাপার এটি! একবারের ঘটনা, তাঁর মুহতারাম আম্মাজান নামায পড়ছিলেন আর তাঁর ধাত্রী কাছেই বসেছিলেন। সহসা কোনও এক ব্যক্তি একপলকে ঘরে প্রবেশ করল। ঘরে ঢুকেই সে বলল– দুই দলের মধ্যে সংঘর্ষ বেঁধে গেছে এবং লড়াই হচ্ছে। হযরতকে জিহাদের জন্য দাওয়াত দিলেন। হযরত প্রস্তুত হয়ে গেলেন। মাশাআল্লাহ তখন তিনি তরুণ যুবক ছিলেন। অনেক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও বিরাট বাহাদুর ছিলেন। ধাত্রী বলল– না, না। এ ছেলে যেতে পারে না। বয়সও তখন সম্ভবত তের/চৌদ্দ বছর হবে। মা খুব ভাল করেই জানতেন এবং বুঝতেন, সেখানে গেলে শাহাদাতের সংবাদও আসতে পারে। আমি এখানেই বসে থাকব আর খবর আসবে সে, শহীদ হয়ে গেছে কিংবা আহত অবস্থায় সেখান থেকে ফিরিয়ে আনা হতে পারে। সুতরাং ধাত্রী বারণ করল। এরপর যখন তার মুহতারামা আম্মাজান সালাম ফিরালেন, কি আশ্চর্য! তিনি বললেন, বিবি! তুমি কেন তাকে বাঁধা দিলে? তুমি এমন সৌভাগ্য থেকে কেন তাকে বঞ্চিত করলে? আমার ছেলেকে যেতে দেওয়া উচিত ছিল। এটা জিহাদের ব্যাপার। এবার আপনারাই বলুন! কত উঁচু, কত সুদৃঢ় ঈমান-ইয়াকীন হতে পারে এই রমণীর মধ্যে এবং তিনি দ্বীনী জ্ঞান সম্পর্কে কতখানি ওয়াকিবহাল ছিলেন। কতখানি আত্মত্যাগ ও কুরবানীর আগ্রহ জযবা তার ভেতর থাকতে পারে, যদ্দরুন তিনি আপন পুত্রকে এমন বিপদে নিক্ষেপ করতেও প্রস্তুত আর ধাত্রী! যার সাথে ক্ষণিকের সেবাধর্মী সম্পর্ক, সে বারণ করছে। কিন্তু দুগ্ধ পানকারিণী এবং তাকে পৃথিবীতে অস্তিত্বে আনয়ণকারিণী স্নেহময়ী মাতা বলেন– না, তার যাওয়া উচিত ছিল। এরূপ শত সহস্র কোটি উদাহরণ আপনারা পাবেন। এখানে সেসব বর্ণনা করার স্থান নয়। আপনারা ইনশাআল্লাহ এমন অনেক জ্ঞানী-গুণী, বিদ্বান-পণ্ডিত, দ্বীনের দাঈ ও সেবক পাবেন, তাঁদের নিকট যদি জিজ্ঞাসা করেন– আপনাদের এ অবস্থা কিরূপে হল? আপনারা এই মর্যাদার আসন পর্যন্ত কিভাবে পৌঁছলেন? আপনাদের এই জীবনচরিত কিভাবে গড়ে উঠেছে? তাহলে তাদের অনেকেই বলবেন, আমাদের আম্মাজান এমনই শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন। আশা করি, এ

সম্মেলনেও এমন লোক উপবিষ্ট আছেন, যিনি তাঁর মায়ের নিরলস শ্রম-সাধনার ফসল। আমরা স্বাক্ষ্য দিতে পারি, আমাদের আম্মাজান আমাদেরকে মিথ্য বলতে নিষেধ করেছেন। আমার মা আমাকে কারও অধিকার হরণ থেকে, কারও উপর বাড়াবাড়ি, জুলম-অবিচার করা থেকে, কারও উপর হাত বাড়ানো থেকে বারণ করেছেন। আমরা আমাদের আম্মাজানকে প্রত্যক্ষ করতাম। আমি বলতে পারি– আমি যখন থেকে বুঝতে শিখেছি এবং আমার ভালমত স্মরণ আছে, আমি আমার আম্মাকে তাহাজ্জুদ পড়তে দেখেছি। এ তাহাজ্জুদ নামায তার কখনও ছুটত না। আমি গর্ব করে একথা বলছি না, তবে নিবেদন করতে চাই যে, আমার শৈশবে আমাদের ছোট্ট বংশে চারটি পরিবার ছিল তাকিয়াকেলায়। প্রশ্ন করা হল, মহিলারা কি তারাবীহ্ পড়তে পারে? মহিলাদের তারাবীহ কি জামাতের সাথে হতে পারে? তখন আল্লামা ফিরিঙ্গী মহল্লী ফাত্ওয়া (সিদ্ধান্ত) দিলেন, তাদের জামাত করাতে কোনও দোষ বা সমস্যা নেই। কাজেই আমার সম্মানিতা মরহুমা আম্মাজান, আমার খালাত বোন এবং আমার ফুফু সবাই কুরআনে কারীম পড়তেন। এভাবে আমাদের ঘরে তারাবীহতে এক খতম কুরআনে কারীম পড়া হয়ে যেত।

এ ছাড়া অনেক মহিলা লেখিকা ছিলেন। তাদের কেউ কেউ এত বড় নামী-দামী লেখিকা ছিলেন, যাদের বই-পুস্তকগুলো শিক্ষাঙ্গনের সৌন্দর্য। আবার কেউ কেউ তো এক্ষেত্রে অনেক পুরুষকেও ছাড়িয়ে গেছেন।

মুসলমান থাকার অর্ধেক দায়িত্ব নারীদের

আমি পরিষ্কার বলি, এদেশে মুসলমানদের মুসলমান হয়ে বেঁচে থাকা, কুরআনে কারীম পড়ার যোগ্য হওয়া, উর্দূ কিতাবাদি দ্বারা উপকৃত হওয়া, ইসলামিক আদর্শ, নিদর্শন ও হুকুম আহকাম সম্পর্কে অবগত হওয়া, ইসলামিক সভ্যতা গ্রহণ করা ও তার উপর সুপ্রতিষ্ঠিত থাকা এবং একত্ববাদের বিশ্বাসের উপর অটল-অবিচল থাকা এসব ক্ষেত্রে অর্ধেকের চেয়ে বেশি দায়িত্ব আমাদের স্ত্রীগণ ও নারীদের ওপর।

আল্লাহ্ তা'আলা উত্তম প্রতিদান দিন আমাদের দ্বীনী তা'লীমী কাউন্সিল (ধর্মীয় শিক্ষা পর্ষদ) এবং কাযী মরহুম জলীল আব্বাসী সাহেব ও আমাদে ডা. ইশতিয়াক সাহেবকে। তাদের বয়স ও সুস্বাস্থ্যে উন্নতি হোক। তারা প্রতিটি ঘরে ঘরে এই আহবান পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন যে, আজ সামান্য চেষ্টা করে নিন, যেন আমাদের বাচ্চারা কুরআনে কারীম পড়ার যোগ্য

হয়ে যায়। কুরআনে কারীম তো আরবীতে লেখা, তা পড়তে পারে। উর্দূ পড়তে পারে, ধর্মীয় বই-পুস্তক পড়ে উপকৃত হতে পারে। শির্‌ক ও তাওহীদের পার্থক্য বুঝতে পারে। সুন্নাত ও বিদ'আতের পার্থক্য বুঝতে পারে এবং গুণাহসমূহ বুঝতে পারে। জানতে পারে, কোন্ কোন্ কাজ গুনাহ।

আমাদের শিক্ষিতা নারীদের দায়িত্ব

নতুবা যদি এ ব্যাপারে আমাদের নারীরা, আমাদের ঘরের শিক্ষিতা ধার্মিক রমণীরা মনোযোগ না-দেন এবং আগ্রহী না-হন, তা হলে আমি আপনাদেরকে পরিষ্কার বলছি এবং বুকের উপর হাত রেখে বলছি, এদেশে মুসলমানদের জন্য মুসলমান হিসেবে টিকে থাকা কঠিন হবে বরং এদেশ একদিন স্পেন হয়ে যাবে। আজ আমি আপনাদের বলছি, এই ছক ও পরিকল্পনা তৈরি হয়ে আছে; এদেশকে স্পেন বানিয়ে দেওয়া হবে। অথচ স্পেন কি? অনেক বড় বড় রমণীরাই জানে না। স্পেন ইউরোপের এমন একটি ভূখণ্ড ছিল, যা নিরঙ্কুশ মুসলিম রাষ্ট্র হয়ে গিয়েছিল। সেখানে বিরাট প্রভাবশালী ইসলামী রাষ্ট্র হয়েছে। সেখানে বড় বড় ওয়ালীআল্লাহ জন্ম নিয়েছেন; শাইখ আকবর, যার নাম প্রতিটি মানুষের মুখে মুখে– তিনি সেখানেই বসবাস করতেন। মালেকী মাযাহাবের একটি মাসয়ালা আছে: যদি জানা যায়, মদীনায় এরূপ হত, তা হলে এখন আর কোনও দলীল প্রমাণের প্রয়োজন নেই। তাদের আমল প্রামাণ্য দলীল।

ইতিহাসে লিখা আছে: একটা সময় এমন ছিল, যখন মালেকীদের একটি মূলনীতি ছিল যে, কর্ডোবাবাসীর আমল প্রামাণ্য দলীল। কর্ডোবার লোকেরা এরূপ করে। এর গুরুত্ব এত অধিক যে, কর্ডোবা সম্পর্কে এতটুকু বলাই যথেষ্ট ছিল– সেখানে এরূপ হয়। সেই স্পেন, যেখানে বহু ওয়ালীআল্লাহ জন্ম নিয়েছেন, শীর্ষস্থানীয় উলামায়ে কিরাম, মুয়াত্তার ব্যাখ্যাকারীগণ জন্ম নিয়েছেন, বড় বড় মুজাহিদ জন্ম নিয়েছেন। গোটা স্পেনে ইসলামী শাসন ছিল। কর্ডোবা জামে মসজিদ, আশ্‌বেলিয়া জামে মসজিদ ও গুর্‌রেনাতা জামে মসজিদ কত কত উন্নত জামে মসজিদ, যার দৃষ্টান্ত পাওয়া কঠিন।

এদেশকে সেখানকার অমুসলিম অধিবাসীরা লক্ষ্যবস্তু বানায় আর তাতে আমাদেরও কিছু মুসলমানের ক্রটি ছিল। তারা তাঁদেরকে পরিচিত করেনি। এভাবে সেখানে অমুসলিমরা ইসলামকে বিতাড়িত করে দেয়। যেসব শিশু-কিশোর মুসলমান ছিল, তারা গুর্‌রেনাতা থেকে মারাকাশ্‌ চলে যায়। আর

আজ গোটা স্পেন শূন্য-বিরান। না কোথাও আযানের মধুর আওয়াজ ভেসে আসে আর না কোথাও কোন মাদরাসা আছে।

অনুরূপ লোকজন বলল, আমরা শূন্য থেকে কত আওয়াজ শুনেছি, আযানের, কুরআনের। কিন্তু জানা যায় নি, কোত্থেকে আওয়াজ ভেসে আসছে। মনে হত, আত্মিক জগত থেকে আওয়াজ আসছে, যেন আল্লাহর কিছু প্রিয় বান্দা কুরআন পড়ছিল। আল্লাহর বান্দারা যখন রেকর্ড করতে পারে, তখন আল্লাহ মহীম কেন রেকর্ড করতে পারবেন না। সুতরাং আল্লাহ পাক একে রেকর্ড করে রাখেন আর তার আওয়াজই সবাই শুনছে। আমি আপনাদেরকে বলি, আজ যত চেষ্টা-সাধনা চলছে, এই নদওয়াতুল উলামা হোক কিংবা আমাদের যে কোন বিশেষ মাদরাসা বা প্রতিষ্ঠান অথবা দারুল উলূম দেওবন্দ, জামেয়া মিল্লিয়াহ বা মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় আলীগড় কিংবা অন্য যে কোনও বড় মাদরাসা, কলেজ ইউনিভার্সিটি হোক– তা সফল হতে পারে না।

দেশ তাহলে বিপদের সম্মুখীন

মুসলমান আগামী প্রজন্মকে মুসলমান হিসেবে টিকিয়ে রাখতে সফলকাম হতে পারে না, যাবৎ না আমাদের ঘরের স্ত্রী, বোন ও মায়েরা তার ইচ্ছা না করবে এবং সিদ্ধান্ত নিবে যে, আমরা আমাদের সন্তানকে ধর্মীয় জ্ঞান শিক্ষা দিব। প্রাইমারী স্কুলে যেতে হয় যাবে। কিন্তু আমরা বা'দ মাগরিব ব্যবস্থা নিব। তাদেরকে উর্দূ পড়াব। তাদেরকে উর্দূ লিখার প্রশিক্ষণ দিব। তাদের কালেমা শুনে নেব। জেনে নেব, কয়টা সূরা মুখস্ত হয়েছে। নামায পড়ে কি না? এসবের প্রতি যদি আমাদের মহিলারা যত্নবান না-হয়, ভ্রুক্ষেপ না-করে, তা হলে এদেশ নিশ্চিত বিপদের সম্মুখীন! এই মাহফিলকে আমি অনেক গুরুত্বপূর্ণ ও উপকারী মনে করি। কিন্তু এখানে আসল কথা হচ্ছে এবং একে আমানত স্বরূপ বলে যাচ্ছি– "নিজের সন্তানের ফিকির নিজেই করুন। নিজেদের ঘরগুলোরই নয়; নিজ মহল্লা, বোন-বান্ধবী, আত্মীয় নারীদেরও মনোযোগ আকর্ষণ করুন। বলুন! দেখ, বোন/ভাবী! নিজের সন্তানকে যেখানে খুশি পাঠাও। কিন্তু তাকে আল্লাহর নাম শিখিয়ে দাও। বলো, আল্লাহ এক। কেবলই একজন। তার কোন অংশীদার নেই। আল্লাহর নবী মুহাম্মাদ (সা.) ছিলেন সর্বশেষ নবী। অন্যথায় আজ তো এমন ষড়যন্ত্র হচ্ছে, মানুষ বলেছে– বলা হয়, যদি তোমাদের কোন জিনিস হারিয়ে যায় অথবা কোন কাজ থাকে কিংবা কোন

দুঃখ-কষ্ট হয়, তবে রাস্তায় মন্দির পড়বে, তার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তার কাছে প্রার্থনা করে নিবে। এমনকি ষড়যন্ত্র করে কোনও জিনিস লুকিয়ে রাখা হয়। এক তালিবে ইলম (ছাত্র) আরেক তালেবে ইলকে বলল, আমার বই কিংবা টুপি কোথায়? সে বলল– রামের নাম স্মরণ করো। রামের নাম নাও, তবে পেয়ে যাবে। সে যখন রামের নাম নিল, তখন সে চুপিচুপি বস্তুটি বের করে এনে সামনে রাখল। এভাবে তার মনে এই আকীদা বদ্ধমূল করে দেওয়া হল যে, রামের নাম নেওয়ার দ্বারা সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। কাজ সমাধা হয়ে যায়। হারানো জিনিস ফিরে পাওয়া যায়। এরূপ অনেক গভীর এবং অত্যন্ত সুদূর প্রসারী চক্রান্ত চলছে।

যে ভারত বহু ওয়ালীআল্লাহর পুণ্যভূমি, অনেক মুজাহিদের পুণ্যভূমি, মুজাদ্দিদগণের পুণ্যভূমি, যেখানে জন্ম নিয়েছেন মুজাদ্দিদে আলফে ছানী (রহ.), খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী (রহ.), শাহ ওয়ালী উল্লাহ (রহ.) এর মতো যুগশ্রেষ্ঠ ইমাম, যেখানে মাওলানা কাসেম নানুতবী (রহ.), মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (রহ.), মাওলানা মুহাম্মাদ আলী সাহেব মুঙ্গেরী (রহ.) এবং বড় আলেম-উলামা, কত কত বিদ্বান-মাশাইখ, সে দেশ নিয়ে এই গোপন চক্রান্ত চলছে, নীল নকশা প্রস্তুত হয়ে আছে। কেবল নাম সর্বস্ব মুসলামন থাকবে আর তার কোনও স্বকীয়তা থাকবে না। আগামী প্রজন্মকে সম্পূর্ণ ইসলাম বিমুখ ও ইসলামী জ্ঞানশূন্য করে দেওয়া হবে। চাই ইসলামকে অস্বীকার না-করুক। কিন্তু ইসলাম সম্পর্কে তাদেরকে অজ্ঞ বানিয়ে দেওয়া হবে। কাজেই শুনুন! প্রথমে নিজ ঘরে, তারপর নিজ মহল্লায় আর তারপর ভ্রাতৃপ্রতীম স্থানে, কোথাও বিয়ে হয়ে গেলে, সেখানে কোথাও সুযোগ এলে সেখানেও বলবেন, সেখানেও সচেতনতা এবং জাগরণ সৃষ্টি করবেন।

বোনেরা! শুনে রাখুন, বোনেরা! রমণীরা শুনে নিন। আপন সন্তানকে মুসলমান বানান। মুসলমান রাখুন। উর্দূ-আরবী পড়তে শিখান। কুরআন মাজীদ পড়ার যোগ্য বানান। একত্ববাদকে তাদের মনে গেঁথে দিন। শিরক, বিদ'আত, পৌত্তলিকতা ইত্যাদি থেকে বারণ করুন। আল্লাহ আমাদের সকলকে সেই তাওফীক দিন। যদি এমনটি হয়ে যায়, তবে এতে অনেক নিরাপত্তা ও গ্যারান্টি রয়েছে ইসলামের স্থায়িত্ব ও সংরক্ষণের। নতুবা কেবল বাহ্যিক ও ব্যবস্থামূলক চেষ্টা শুধু পত্র-পত্রিকা ও বই-পুস্তক এবং শুধু সভা-সেমিনার ইত্যাদি উপকারী ঠিক কিন্তু যথেষ্ট নয়।

জিহাদে নারীদের খেদমত

হযরত আসমা বিনতে আবী বক্র রাযি. এর বীরত্ব

নারীদের বীরত্ব ও সাহসিকতার একটি দৃষ্টান্ত দিতে চাই। আপনারা সকলেই হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাযি. এর নাম শুনে থাকবেন। হযরত যুবাইর ইবনে আওয়াম ছিলেন একজন বিশিষ্ট ও প্রবীন সাহাবী এবং আশারায়ে মুবাশ্শারা (তথা জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশ সাহাবী) এর অন্তর্ভূক্ত। তিনি সেই দশ ভাগ্যবান সাহাবীগণের একজন, যাদের নাম নিয়ে জনাব রাসূলে কারীম সা. ঘোষণা করেছেন زبير بن العوام فى الجنة سعد بن ابى وقاص فى الجنة فلان فى الجنة আর খোলাফায়ে রাশেদীনের কথা কি বলব! তাদের সুসন্তান হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর ছিলেন বড় আলেম, বিজ্ঞ ফকীহ, বিরাট সাহসী ও দুর্দম বীর। তিনি আব্দুল মালেক ইবনে মারওয়ানের মোকাবেলা করেছেন। তার শাসন ব্যবস্থা নবুওয়াতের আদর্শ থেকে সরে গিয়েছিলেন। তিনি তখন চেষ্টা করেছিলেন, তাকে নবুওয়াতের আদর্শিক পথে পুনঃ তুলে আনার জন্য আব্দুল মালেক ইবনে মারওয়ানের গভর্নর হাজ্জাজ ইবনে ইফসুফ ছাকাফীর সঙ্গে তার কঠিন যুদ্ধ হয় এবং তিনি শহীদ হয়ে যান। অনন্তর সে আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাযি. কে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে রাখে এবং বলে, যাবৎ না তার মা সুপারিশ করবে, তাঁকে ফাঁসির কাষ্ঠ থেকে নামাব না। আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর ছিলেন একজন সাহাবী পিতার সাহাবী পুত্র, সাহাবী মাতার নয়নমনি। তার মাতা ছিলেন যাতুন্ নাতাকাইন হযরত আসমা বিনতে আবী বকর রাযি.। হযরত আবু বকর রাযি. এর কন্যা। মানুষ এই দৃশ্য সহ্য করতে পারছিল না। দু'চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরবে, তার কি অর্থ! মানুষ ডুকরে ডুকরে কাঁদছিল। বাধ্য হয়ে অবশেষে তারা তার মুহতারাম আম্মাজানের কাছে ছুটে আসল এবং বলল– আল্লাহর জন্য আমাদের প্রতি দয়া করুন। আপনার সাহসিকতায় তো কোনও ঘাটতি নেই। এমন কোনও বাক্য বলে দিন, যাতে আমরা এই মর্মন্তুদ দৃশ্য দেখা থেকে নিরাপদ হয়ে যাই। সুতরাং আপনারা জানেন, আল্লাহর বাঘিনী, আল্লাহর এই বান্দী কি বাক্য বলেছিলেন– ألم يأن لهذا الفارس ان يترجل

"এই অশ্বারোহীর জন্য কি এখনও পদাতিক/পদব্রজী হওয়ার সময় আসে নি!?" কি সব শব্দ বলেছেন। এখনও তার অশ্বারোহন, বীরত্ব ও সাহসিকতা; যেন বললেন- الم يأن لهذا الراكب ان ينزل অর্থাৎ এখনও কি এই অশ্বারোহীর জন্য তার অশ্বপৃষ্ঠ থেকে নেমে আসার সময় হয় নি। হাজ্জাজও অপেক্ষমান ছিল। তার উপরও অভিশম্পাত বর্ষিত হচ্ছিল। সে এ বাহানায় তাকে নামিয়ে আনার নির্দেশ দেয়।

হযরত খানাসা রাযি. এর ধৈর্য-অবিচলতা

আপনাদের শিক্ষিত লোকজন হযরত খানাসা রাযি. এর নাম শুনে থাকবেন। তিনি আরবী ভাষার অমর স্মরণীয় মহিলা কবিদের একজন। তার দু'ভাইয়ের মৃত্যু হয়ে গিয়েছিল। তাদের প্রতি এমন হৃদয়স্পর্শী শোকগাঁথা রচনা করেছেন, যার দৃষ্টান্ত আরবী শোকগাঁথায়ই নয় বরং শোকগাঁথার জগতে অর্থাৎ পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষার শোকগাঁথার ভাণ্ডারে দ্বিতীয়টি পাওয়া কঠিন। আমি আরবী সাহিত্য পিয়াসী ছাত্র। আমি তা পড়েছি, মুখস্থ করেছি। আশ্চর্য কবিতা সেটি! তার এই ঘটনা ইসলামপূর্ব সময়ের। এই খানাসাই যখন ইসলাম গ্রহণ করে নিলেন, তখন দেখুন! ইসলাম তার অন্তরজগতে কি বিপ্লব সৃষ্টি করে দিল! যে আল্লাহর বান্দী তার ভাইদের বিচ্ছেদে শোক-কবিতা রচনা করেছিল এবং এমন এমন শোকগাঁথার জন্ম দিয়েছিল, যা শুনে মানুষ কাঁদতে শুরু করত আর তার কবিত্ব-কাব্যচর্চা এ বিষয়েই নিবিষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তদুপরি কিন্তু ভাই আর পুত্রের মধ্যে পার্থক্য থাকে। পুত্র হয় কলিজার টুকরা, প্রাণস্পন্দন। ভাইয়ের সাথে হাজার হৃদ্যতা ভালবাসা থাক। কিন্তু পুত্র তো দেহের একটি অংশ, একটি টুকরা! কোনো এক যুদ্ধের সময় তিনি তার পুত্রদের কাছে ডাকলেন। বিদায় করলেন এক একজনকে। বললেন, বাবা! পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে না। আমি তোমাদেরকে এমন দিনের জন্য দুগ্ধ পান করাই নি। এরপর এক এক পুত্রের শাহাদতের সংবাদ শুনতে থাকেন। যখন শেষ ছেলের শাহাদতের সংবাদ শুনলেন, তখন তার মুখ থেকে অমনি বেরিয়ে এল- "الحمد لله الذى اكرمنى بشهادتهم" -হে আল্লাহ! সকল প্রশংসা আপনার, আপনি তাদের শাহাদত দ্বারা তাদেরকে এবং আমাকে সম্মানিত করেছেন।

হযরত ছফিয়া রাযি. এর সাহসী পদক্ষেপ

মহিলাগণ যে দুর্গে অবস্থানরত ছিল, সেটি বনূ কুরাইযা এলাকার সাথেই ছিল। ইয়াহুদীরা যখন দেখল, সকল লোকজন রাসূলুল্লাহ সা. এর সাথে, তখন দুর্গে আক্রমণ করে বসল। এক ইয়াহুদী দুর্গের ফটক পর্যন্ত

পৌঁছেও গেল। দুর্গের ভেতরে আক্রমণের সুযোগ খুঁজছিল সে। হযরত ছফিয়া রাযি. (রাসূলুল্লাহ সা. এর ফুপু) তাকে দেখে ফেললেন। মহিলাদের নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন (কবি) হাস্‌সান রাযি.। হযরত ছফিয়া রাযি. তাকে গিয়ে বললেন, নেমে গিয়ে ওকে হত্যা করুন। অন্যথায় সে শত্রুদেরকে গিয়ে খবর সরবরাহ্ করবে। হযরত হাস্‌সান রাযি. এর একটা অসুখ হয়ে গিয়েছিল। ফলে তাঁর মনের মধ্যে মারাত্মক ভয় সৃষ্টি হয়েছিল। তিনি যুদ্ধ-লড়াইয়ের দিকে চোখ উঠিয়েও তাকাতে পারতেন না। সুতরাং তিনি নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করে বললেন– আমি এ কাজের লোক হলে কি আর এখানে পড়ে আছি! এরপর হযরত ছফিয়া রাযি. তাবুর একটি খুঁটি উপড়ে ফেললেন এবং নেমে গিয়ে ওই ইয়াহুদীর মাথায় এত জোরে আঘাত হানলেন যে, তার মাথা ফেটে গেল। হযরত ছফিয়া রাযি. ফিরে এসে হাস্‌সান রাযি. কে বললেন, শত্রুর অস্ত্র ও কাপড় ছিনিয়ে আনুন। হাস্‌সান বললেন, ভাল কথা! যান তার মাথা কেটে দুর্গের নিচে ফেলে দিন, যেন ইয়াহুদীরা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে যায়। কিন্তু এই খেদমতও অবশেষে হযরত ছফিয়া রাযি. কে-ই আঞ্জাম দিতে হয়েছে। ফলে ইয়াহুদীদের বিশ্বাস হয়ে যায়, দুর্গের মধ্যেও কিছু সৈন্য প্রস্তুত আছে। এই ভেবে তারা দুর্গ আক্রমণের সাহস করল না।

মা তার কলিজার টুকরোকে যখন জিহাদ ও শাহাদাতের প্রেরণা দেন

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রাযি. বনী হারেসার যে দুর্গে অন্যান্য মুসলমান নারীদের সাথে আশ্রয় নিয়েছিলেন এবং তখন পর্যন্ত পর্দার বিধান অবতীর্ণ হয় নি– সা'দ ইবনে মা'আয রাযি. এর মাতাও সেখানে তার সঙ্গে ছিলেন। হযরত আয়েশা রাযি. বলেন, আমি দুর্গ থেকে বাইরে এসে ঘুরছিলাম। পেছন থেকে পায়ের শব্দ শোনা গেল। ঘুরে দেখি, সা'দ যুদ্ধাস্ত্র হাতে নিয়ে উত্তেজিত অবস্থায় অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সাথে সামনে এগিয়ে যাচ্ছেন। মুখে উচ্চারিত হচ্ছে–

لبث قليلا يدرك الهيجاء جمل + لابأس بالموت اذا الموت نزل

"খানিক দাঁড়াও! আরও একজন যুদ্ধে আসছে। সময় যখন ঘনিয়ে এসেছে, তখন মরণের ভয় কিসের!"

হযরত সা'দ রাযি. এর মা শুনলেন একথা। ডেকে বললেন, দৌড়ে যাও। তুমি বেশ দেরি করে ফেলেছ। সা'দ রাযি. এর লৌহবর্ম অতি ক্ষুদ্র ছিল। তার উভয় বাহু ছিল খোলা। হযরত আয়েশা রাযি. হযরত সা'দ রাযি. এর মাকে

বললেন, আহ! সা'দের বর্ম যদি লম্বা হত! আকস্মাৎ ইবনুল আরফাহ তার খোলা হাত লক্ষ্য করে তীর ছুড়ল। ফলে হাতের রগ কেটে গেল।

খন্দক যুদ্ধ হয়ে গেলে রাসূলে কারীম সা. তার জন্য মসজিদের বারান্দায় একটি তাবু স্থাপন করলেন এবং তার সেবা-শশ্রুষা শুরু করালেন। এ যুদ্ধে যুবাইদা নামের এক নারী শরীক ছিল। যে নিজের কাছে ঔষধ পথ্য রাখত এবং আহতদের জখমগুলোর ব্যাণ্ডেজ করত। এ তাবুটি তারই ছিল। সে ছিল চিকিৎসার তত্ত্বাবধায়ক। রাসূলে কারীম সা. স্বয়ং হস্ত মুবারকে ঔষধ নিয়ে ছ্যাকা দেন। কিন্তু আবার ফুলে উঠে। পুনরায় ছ্যাকা দেন, কিন্তু তারপর কোনও ফল হল না। কয়েকদিন পর অর্থাৎ বনু কুয়াইযার ধ্বংসের পর জখম ফুলে যায় এবং তিনি ইহধাম ত্যাগ করেন। (সীরাতে রাসূলে আকরামঃ ১৯০–১৯১)

মুসলিম নারীদের সেবা ও আত্মত্যাগ

উহুদ যুদ্ধে প্রায় মুসলিম নারীই অংশ নিয়েছেন। হযরত আয়েশা রাযি. এবং (হযরত আনাস রাযি. এর মা) উম্মে সুলাইম রাযি. আহতদেরকে পানি পান করাতেন। সহীহ বুখারী শরীফে হযরত আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত আছে; তিনি বলেন, আমি আয়েশা ও উম্মে সুলাইম রাযি. কে দেখেছি, পর্দা করে মশ্‌ক ভরে ভরে আনতেন এবং আহতদেরকে পানি পান করাতেন। মশ্‌ক খালি হলে আবার গিয়ে আনতেন। এক রিওয়ায়েতে আছে, হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাযি. এর আম্মা হযরত উম্মে সুলাইমও এ খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন। ঠিক যখন কাফিররা গণহামলা চালিয়েছিল আর নবী কারীম সা. এর সাথে গণা ক'জন নিবেদিতপ্রাণ সাহাবী ছিলেন, তখন আনসারদের এক নারী আফীফার বাপ-ভাই-স্বামী সবাই এ যুদ্ধে নিহত হয়ে গিয়েছিল। একে একে তিনটি কঠিন দুর্ঘটনার করুণ ধ্বনি তার কানে পড়ছিল। কিন্তু প্রত্যেকবারই তিনি কেবল জিজ্ঞাসা করতেন রাসূলুল্লাহ সা. কেমন আছেন? লোকজন বলল, ভাল আছেন। তিনি নবীজী সা. এর কাছে গিয়ে চেহারা মুবারক দেখলেন এবং অনিচ্ছায়ই বলে উঠলেন– كل مصيبة بعدك جلل আপনি (নবীজী সা.) থাকতে সকল বিপদই গৌণ। "আমি-তুমি, স্বামী-ভাই নিবেদিত সবাই, ওহে বাদশা! তুমি থাকতে আমরা কী!"

এ যুদ্ধে মুসলমানদের মধ্য হতে সত্তরজন শহীদ হলেন। এর অধিকাংশই ছিলেন আনসারী। কিন্তু মুসলমানদের দীনতার অবস্থা এমন ছিল যে, শহীদদের শরীর মুবারক ঢাকার মতো কাপড়ও ছিল না।

তাদেরকে গোসল ছাড়া এভাবেই রক্তরঞ্জিত অবস্থায় এক-কবরে দু'-দু'জন করে দাফন করা হয়েছে। যার কুরআন বেশি মুখস্থ ছিল, তাকে অগ্রবর্তী করা হত। এসব শহীদদের জানাযার নামাযও তখন পড়া হয় নি। আট বছর পর ওফাতের দু'-এক বছর পূর্বে নবী কারীম সা. প্রথম যখন এদিক দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন অনিচ্ছায় তাঁর মধ্যে দয়ার্দ্রতা ছেয়ে যায়। আর তিনি এমন জ্বালাময়ী কথা বললেন, যেন জীবিত কেউ কোন মুর্দা থেকে পৃথক হচ্ছে। এরপর তিনি একটি হৃদয়স্পর্শী খুতবা দিলেন, হে মুসলমান সকল! তোমাদের নিয়ে পুনরায় মুশরিক হয়ে যাওয়ার ভয় নেই। কিন্তু ভয় হল, দুনিয়ার মোহে ফেঁসে যেও না। (সীরাতে রাসূলে আকরাম ঃ ১৬৭–১৬৮)

দাম্পত্য জীবন
পুরুষ ও নারীর পারস্পরিক সম্পর্ক

বিবাহ একটি ইবাদত, একটি দায়িত্ব

বিবাহ জীবনের অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন। এ প্রয়োজন পূরণে সবাই একে অন্যের মুখাপেক্ষী। বিবাহ অতি গুরুত্ববহ একটি ইবাদত এবং নবী করীম সা. এর সুন্নাতও। নবীজী সা. ইরশাদ করেছেন, " النكاح من سنتى فمن رغب عن سنتى فليس منى " (বিবাহ আমার একটি সুন্নাত; যে ব্যক্তি আমার সুন্নাত থেকে বিমুখ-বিতৃষ্ণ হবে, সে আমার উম্মত নয়। স্ত্রীর সাথে সুসম্পর্ক রাখা, তার সাথে হাস্য-রস করা, মিষ্টি আলাপ এবং তার অধিকার রক্ষা করার মধ্যে বিরাট সওয়াব রয়েছে। রাসূলে কারীম সা. ইরশাদ করেন, আমি কিয়ামত দিবসে আমার উম্মতের প্রাচুর্য (সংখ্যাধিক্য) নিয়ে গর্ব করব।

পানাহার করাও জীবনের অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন আবার ইবাদতও। মানুষ যদি সুন্নাত মোতাবেক পানাহার করে, তার নিয়ত থাকে– এ খাবার খেয়ে যে শক্তি আসবে, তা আল্লাহর সন্তুষ্টি অনুযায়ী ব্যয়িত হবে। সাথে সাথে আরও ভাবল, আল্লাহ তা'আলা এ জীবিকা আমাদের জন্য কোন কোন হেকমতে সৃষ্টি করেছেন। তা হলে এই পানাহার, বাহ্যত যাকে ইবাদত বলে মনে হয় না, তা সাওয়াবের যোগ্য হয়ে যায়। পানাহারকে আল্লাহ পাক জীবন রক্ষা ও জীবন বাঁচানোর মাধ্যম বানিয়েছেন। তদ্রুপ বিবাহ এবং স্ত্রীর অধিকারসমূহ সংরক্ষণকে মানব প্রজন্ম রক্ষা ও বংশবিস্তারের মাধ্যম করেছেন। একবার সাহাবায়ে কিরাম প্রশ্ন করলেন, "স্ত্রীর সাথে মেলামেশা করাও কি ইবাদত?" এর জবাবে নবীজী বললেন, কেন নয়! বলতো, মানুষ যদি তার কামনা-বাসনা হারাম স্থানে পূর্ণ করে, তবে কি গুনাহ হবে না? সাহাবায়ে কিরাম জবাব দিলেন, অবশ্যই গুনাহ হবে। রাসূলে কারীম সা. বুঝিয়ে বুঝিয়ে বললেন, যে জিনিস গুনাহ থেকে রক্ষা করে, তাতে কেন সওয়াব থাকবে না?

মুসলমানদের জীবনের কোনো দিক বা শাখা এমন নেই, যা শরী'অত শূন্য আর শরী'আত পরিপালনে সর্বাবস্থায় সাওয়াব আছে এবং তার বিরোধিতা বা পরিত্যাগে আছে গুনাহ। কিন্তু আক্ষেপ! যেভাবে পানাহারের সুন্নাত ও ইবাদতে চলছে উদাসীনতাই উদাসীনতা, তদ্রুপ বিবাহের ইবাদত সম্পর্কেও হয় উদাসীনতাই উদাসীনতা। বিবাহ হলে পুরা বংশ ধুমধাপ করে। সকল আত্মীয়-স্বজন উল্লাসে মেতে উঠে। আর জনৈক বুযুর্গের উক্তি মতে সারা রাস্তা খুশি করা হয়। নাপিত, ধোপা, মুচি, ভিস্তি এমনকি মেথরকেও খুশি করে নেওয়া হয়। কিন্তু আল্লাহ ক্ষমা করুন! আল্লাহ ও তার রাসূল সা. এর কোনও তোয়াক্কা করা হয় না। অধিকন্তু বলা হয়, এখন তো আমোদ-প্রমোদ করার সময়, ইচ্ছা পূরণের সময়। যাবতীয় নিষিদ্ধ কাজ করা হয়। পানাহারে অহেতুক আড়ম্বরতা, লৌকিকতা, বিবাহ উপহার প্রদর্শনী, বিবাহ উপহার বা যৌতুক দাবি, অবস্থা ও সাধ্য থেকে অতিরিক্ত মোহরানা, নাচ-গান আরও না জানি কত কী।

স্মরণ রাখুন! এই আমোদ-ফুর্তি আসলে আমোদ নয়, যার কারণে আল্লাহ ও রাসূল সা. অসন্তুষ্ট হন। এ বিবাহ কেবল এতটুকুই নয় যে, এর দ্বারা দুই শাবক মিলে যায়, দুটি মানুষ একত্র হয়ে যায়। এতটুকুই নয় যে, এটা আত্মীয়-স্বজনের পরস্পর সাক্ষাৎ এবং তাদের খেদমতের মাধ্যম কিংবা কেবলই দাওয়াত খাওয়া ও খাওয়ানো এবং বন্ধু-বান্ধবদেরকে কুশলাদি জিজ্ঞাসার বাহানা মাত্র বরং এটা আল্লাহ পাকের রুষ্ট রহমতকে অনুরক্ত ও আকর্ষিত করার মাধ্যমও বটে। তবে এই বিয়ে-শাদী, এই অলীমা (বৌভাত) শরী'আতের সীমানার মধ্যে ও সুন্নাতের অনুসরণে হতে হবে। এই বিয়ের দ্বারা ছেলের ঘরে কোনো কিছুর কমতি আসে না বরং সদস্য সংখ্যা বাড়ে। কিন্তু কোনো কোনো যুবক নিজের অপরিণামদর্শিতার কারণে একজনকে [স্ত্রীকে] জড়িয়ে বোনদের তাড়িয়ে দেয় অর্থাৎ মা, বাবা, ভাই-বোনদের ভুলে কেবল বউয়ের হয়ে থাকে। স্মরণ রাখুন! যে আল্লাহর নামে দু'জন অচেনা-অজানা মানুষ এক হয়েছে, তারই হুকুম হচ্ছে- " واتقوا الله الذی تساءلون به والارحام" যে আল্লাহর নামে তোমরা একে অন্যের কাছে সুওয়াল কর, কিছু কামনা কর এবং নিজের অধিকারসমূহ পাওয়ার প্রত্যাশা কর, তাকে তোমরা ভয় কর এবং আত্মীয়তার প্রতিও লক্ষ্য রাখে। মায়ের খেয়াল রাখ, বাপের খেয়াল রাখা, ভাই-বোনদের স্নেহ-ভালবাসা অক্ষুণ্ন রাখ এবং সকল আত্মীয়-স্বজনরে অধিকার আদায় কর আর স্ত্রীর সাথেও প্রেম-সোহাগের আচরণ কর, তার অধিকারগুলো রক্ষা কর।

বিয়ের বৃত্তান্ত

বিয়ের বৃত্তান্ত কিংবা বাগদানের রূসম-রেওয়াজের ব্যাপারে সম্ভবত হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে তেমন একটা পার্থক্য নেই। এতে বংশীয় অবস্থা, অর্থনৈতিক অবস্থা এবং রুসম-রেওয়াজ অনুসরণ ও বর্জনের বিরাট দখল রয়েছে। আধুনিক শিক্ষা-সভ্যতা এসব বিষয়ে একই রকম প্রভাব বিস্তার করেছে।

বিয়ে কেবল একটি প্রয়োজন পূরণই নয় বরং এটা অনেক বড় একটি এবাদত। আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভের একটি মাধ্যম। যেমন, নামায। বিশেষ কোনও পার্থক্য নেই; কেবল রূপরেখার পার্থক্য। এই বিবাহ নিছক একটি প্রথা নয়। ইসলামে রূসম-রেওয়াজ ও প্রথাগত জিনিসের কোনো ধারণাই নেই। আজকাল সেসব ধারণা সৃষ্টি হয়েছে। তবে এটি এক এবাদত। এবাদত জ্ঞান করেই বিবাহ করতে হবে এবং এবাদতই মনে করেই এতে শরীক হতে হবে।

বিয়ে-শাদীতে পূর্বসূরীদের কর্মপদ্ধতি

ইসলামে বিয়ের খোদায়ী নির্দেশ এবং বিয়ে অনুষ্ঠান অত্যন্ত সাদাসিধে, সহজ ও সংক্ষিপ্ত ছিল। একে জীবনের আবশ্যিক একটি কর্তব্য, একটি স্বভাবগত চাহিদা এবং একটি এবাদত হিসেবে পালন করা হত। কেবল প্রস্তাব ও সমর্থনের দুটি শব্দ আর দু'জন স্বাক্ষ্য এর জন্য জরুরী ছিল। উদ্দেশ্য ছিল, এ সম্পর্কটা অপরাধমূলক, রহস্যাবৃত ও গোপনীয় নয়– তা নিশ্চিত করা। সে জন্য তা কিছুটা খোলাখুলি ও প্রচার-প্রসারের সাথে হওয়া জরুরি। আর এর জন্য সাক্ষি রাখা আবশ্যিক শর্ত। পুরুষ দেনমোহর পরিশোধ করা আবশ্যক জ্ঞান করবে। স্ত্রীর নিরাপত্তা, সম্মান ও ভরণ-পোষণের দায়িত্ব নিবে। এছাড়া আর কোনোকিছু আবশ্যিক ছিল না। ইসলামের ইতিহাসে এমন অনেক দৃষ্টান্তই পাওয়া যায়, যাতে দেখা যায়, রাসূলে কারীম সা. এর যুগে এক সময় মদীনা শরীফে মুসলমানদের সংখ্যা খুবই নগন্য ছিল। মদীনার জনবসতীও ছিল ক্ষুদ্র। তথাপি এমন কিছু সাহাবী, যারা মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় এসেছিলেন এবং রাসূলে কারীম সা. এর সাথে যাদের অত্যন্ত গভীর বংশীয় ও পারিবারিক সম্পর্ক ছিল, তারা মদীনায় বিয়ে করলেন এবং স্বয়ং ইসলামের নবী সা. কে পর্যন্ত বিবাহ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের (যার অংশগ্রহণ যেমন বরকতের কারণ, তেমনি সম্মানেরও) দাওয়াত দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেন নি। আর

মহানবী সা. এই আনন্দঘন ঘটনার কথা জানতে পেরেছেন ঘটনা ঘটে যাওয়ার কোন নিদর্শনের মাধ্যমে।[১]

বিয়ের সময় সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা ও দাম্পত্য অধিকার বর্ণনা

বর্তমানে কিছুকাল ধরে অনেক উলামায়ে কিরাম খুতবার আরবী অংশ আয়াত পাঠ করার পর মাতৃভাষায় সংক্ষিপ্ত আলোচনার রীতি চালু করেছেন। যেখানে বিবাহের মৌলিকত্ব এবং এর ফরযসমূহ ও পারস্পরিক দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে বর্ণনা দেওয়া হয়। চেষ্টা করা হয়, বিবাহ যাতে নিছক প্রথাগত ও উপভোগ্য হিসেবে না-থাকে বরং এখানে নওশা (বর) এবং উপস্থিত লোকজন ধর্মীয় ও চারিত্রিক বৃত্তান্ত পায়। তাদের মধ্যে জাগ্রত হয় দায়িত্বশীলতার অনুভূতি।

বক্তৃতার একটি উপমা

এখানে একটি বক্তৃতার নমুনা পেশ করা হচ্ছে। বক্তৃতাটি একটি বিবাহ অনুষ্ঠানে রেকর্ড করা হয়েছিল। এতে এই সংশোধনমূলক কর্মপদ্ধতির বেশ কিছু প্রকাশ পেয়েছে। (সুন্নাত খুতবার পর)

أعوذ بالله من الشيطن الرجيم- بسم الله الرحمن الر حيم- ياايهاالناس إتقواربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء - واتقواالله الذى تسائلون به والأرحام - إن الله كان عليكم رقيبا-[2]

يأيهاالذينَ امنوا إتقواالله حق تقته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون-[3]

---

[১] বিশিষ্ট সাহাবী আব্দুর রহমান ইবনে আওফি মদীনায় এসে বিয়ে করলেন। পরের দিন যখন নবী কারীম সা. তার কাপড় থেকে সুগন্ধির আলামত অনুভব করলেন, তখন জিজ্ঞাসা করে জানতে পেলেন, গতকাল তার বিয়ে ছিল। এরপর নবীজী সা. বললেন, অবশ্যই অলীমা (বৌভাত) করতে হবে; একটি বকরি দিয়ে হলেও। (সহীহ বুখারী)

[২] হে মানব সমাজ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তার থেকে তার সঙ্গিনীকে সৃষ্টি করেছেন; আর বিস্তার করেছেন তাদের দু'জন থেকে অগণিত পুরুষ ও নারী। আর আল্লাহকে ভয় করো, যার নামে তোমরা একে অপরের নিকট যাচনা করে থাক এবং আত্মীয় জ্ঞাতিদের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের ব্যাপারে সচেতন রয়েছেন। (সূরা নিসা–১)

৩ হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ যেমন ভয় করা উচিত ঠিক তেমনিভাবে ভয় করতে থাক এবং অবশ্যই মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না। (সূরা আলে ইমরান– ১০২)

يأيهاالذين امنوا اتقوالله وقولوا قولا سديدا- يصلح لكم اعمالكم ويغفرلكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما-[1]

সূধীবৃন্দ! এ বিবাহ নিছক প্রথা পালন আর প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণ নয়। বিবাহের সূন্নাত মাত্র একটি এবাদত নয় বরং একাধিক এবাদতের সমষ্টি। এর সঙ্গে একটি শরঈ হুকুমই নয়; ডজন-ডজন এবং বিশেরও অধিক শরঈ হুকুম জড়িয়ে আছে। এর মর্যাদা কুরআনে কারীমেও আছে; হাদীস শরীফেও আছে আর ফিকহের কিতাবাদিতে তো এর পৃথক অধ্যায়ই রয়েছে। কিন্তু এই সুন্নাত সম্পর্কে উদাসীনতা এত ব্যাপক হয়ে গেছে যে, অন্য কোনও সুন্নাত ও ফরযের ব্যাপারে তদ্রুপ নেই বরং একে আল্লাহর নাফরমানী, প্রবৃত্তির খোরাক, শয়তানের আনুগত্য এবং রুসম-রেওয়াজ পরিপালনের ক্ষেত্র বানিয়ে নেওয়া হয়েছে। এতে আমাদের জীবনের জন্য পূর্ণ বৃত্তান্ত রয়েছে। এর অনুমান আপনারা কুরআনে কারীমের সেসব আয়াত দ্বারাই করতে পারেন, বিবাহের খুতবায় যেগুলোর তিলাওয়াত রাসূলে কারীম সা. থেকে প্রমাণিত আছে। শুরুতে সেগুলো পড়া হয়েছে। প্রথম আয়াতে মানব জাতির সূচনার কথা আলোচিত হয়েছে, যা এই শুভ মুহূর্তে নেহাৎ উপযোগী ও কল্যাণের বার্তাবহ। কেননা হযরত আদম আ. প্রথমে একজন নিঃসঙ্গ মানুষ ছিলেন। তারপর তাকে একজন জীবন-সঙ্গিনী দিয়েছেন, যাদের দ্বারা মানব-বংশের সৃষ্টি করেছেন, যারা সারা পৃথিবী ভরে দিয়েছে। আল্লাহ তা'আলা এই দুই মানুষের মধ্যে এমন প্রেম-ভালবাসা এবং তাদের প্রীতি অনুরাগে এমন বরকত দান করেছেন, আজকের পৃথিবী তার সাক্ষ্য দিচ্ছে। সুতরাং আল্লাহর জন্য একি কঠিক, আজ যে দুই মানব মিলিত ও একাত্ম হচ্ছে, এক পরিবারকে আবাদ এবং এক বংশকে সুখী-সার্থক করে দিবেন।

তারপর আল্লাহ বলেন, নিজের ওই প্রতিপালকের প্রতি লজ্জাবোধ কর, যার নামে তোমরা একে অন্যের কাছে যাচনা কর।

সম্মানিত উপস্থিতি! গোটা জীবনই একটা ধারাবহিক এবং পুরোপুরি যাচনা ও প্রার্থনা। ব্যবসা, রাজত্ব, শাসন, শিক্ষাদান সবই এক ধরনের প্রার্থনা। এগুলোতে একদল প্রার্থনাকারী, সন্ধানকারী আর অপর দল প্রার্থিত ও জিজ্ঞাসিত। তারপর প্রত্যেক প্রার্থীই প্রার্থিত বা জিজ্ঞাসিত আবার

---

১ হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল। তিনি তোমাদের আমল-আচরণ সংশোধন করবেন এবং পাপসমূহ ক্ষমা করবেন। যে কেউ আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য করে, সে অবশ্যই মহা সাফল্য অর্জন করবে। (সূরা আহযাব- ৭০-৭১)

প্রত্যেক জিজ্ঞাসিতই প্রার্থী। আমরা আমাদের সমাজে নিচু থেকে নিচু মানুষের প্রার্থী। কেননা একজনের প্রয়োজন অন্যের সাথে সম্পৃক্ত। এর থেকে কোন আদম সন্তান মুক্ত থাকতে পারে না। এটাই সভ্য জীবনের বৈশিষ্ট্য। এই আক্‌দ (বন্ধন) ও বিবাহ্ কি? তাও একটি সভ্য ভদ্রোচিত ও পুণ্যময় প্রার্থনা। একটি সম্ভ্রান্ত বংশ-পরিবার আরেক সম্ভ্রান্ত বংশ-পরিবারের কাছে প্রার্থনা করেছে– আমাদের নয়নমনি, কলিজার টুকরোর জীবন-সঙ্গী প্রয়োজন। তার জীবন অসম্পূর্ণ। সদয় এর পূর্ণতা বিধান করুন। আরেক সম্ভ্রান্ত বংশ-পরিবার এই প্রর্থনা ও আবেদনকে সানন্দে গ্রহণ করেছে। এরপর তারা দু'জনই আল্লাহর নাম মাঝখানে এনে একে অন্যের সাথে মিলে গেছে। আর যে দুটি মানুষ গতকাল পর্যন্ত একে অন্যের জন্য সবচেয়ে অপরিচিত ছিল, সবচেয়ে বেশি অচেনা-অজানা ছিল এবং সবচেয়ে বেশি দূরে ছিল, তারা আজ এভাবে এত কাছের ও একাত্ম হয়ে গেল যে, এর চেয়ে বেশি একাত্মতা ও নৈকট্যের কল্পনাও হতে পারে না। একজনের ভাগ্য অন্যজনের সাথে সম্পৃক্ত এবং একজনের সুখ-আনন্দ, অনুভূতি অন্যজনের উপর সীমাবদ্ধ হয়ে গেল। এসব মহান আল্লাহর নামের আলৌকিকতা, যা হারামকে হালাল, অবৈধকে বৈধ, উদাসীনতা ও পাপকে আনুগত্য ও এবাদত বানিয়ে দিয়েছে। জীবনে এনেছে বিরাট পরিবর্তন। সৃষ্টি করেছে মহা বিপ্লব। আল্লাহ তা'আলা বলেন, এবার এ নামের লাজ রাখতে হবে। নিতান্তই স্বার্থপরতা হবে, যদি তোমরা এ নাম মাঝখানে এনে নিজের স্বার্থ পূরণ করে নাও এবং কাজ উদ্ধার করে নাও আর তারপর এই মহামহীম নামকে একেবারে ভুলে যাও; এর দাবিসমূহ জীবনে পূরণ না-কর। তাই ভবিষ্যতেও এ নাম স্মরণ করবে এবং এর লাজ রাখবে। তারপর বলেন, অবশ্যই আত্মীয়-স্বজনেরও খেয়াল রাখবে। وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِى تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ "তোমরা ভয় কর সেই আল্লাহকে, যার নামটি তোমরা নিজের প্রয়োজন পূরণের মাধ্যম বানাচ্ছ এবং আত্মীয়তা ছিন্ন করা থেকে বেঁচে থাক।" আজ এক নতুন আত্মীয় হচ্ছে। তাই পুরনো আত্মীয়ের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন পড়েছে। কেননা এই নতুন আত্মীয়ের কারণে সেসব পুরনো আত্মীয়ের সময়কাল ও তাদের অধিকারসমূহ নিঃশেষ হয়ে যায় নি। যাবেও না কোনোদিন। এমন যেন না হয় যে, স্ত্রীর আত্মীয়কে স্মরণ রাখলে আর মাতৃসম্পর্ককে ভুলে গেলে; শ্বশুর-শ্বাশুড়ির সেবাকে আবশ্যক মনে করলে আর নিজের আসল এবং জন্মদাতা পিতামাতা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলে। যদি কারও মনে ধারণা জন্মে, এসব

ব্যাপপার কে নযরদারী করবে? কে সর্বদা সঙ্গে থাকবে? সুতরাং আল্লাহ পাক বলছেন- إن الله كان عليكم رقيبا –নিঃসন্দেহে আল্লাহ তোমাদেরকে দেখছেন। আল্লাহ তা'আলা এগুলোর পর্যবেক্ষক। তিনি এমন সাক্ষী, যিনি সর্বদা সঙ্গে আছেন, থাকবেন। আল্লাহ বলেন, نحن أقرب إليه من حبل الوريد (আমি তার শাহরগ থেকেও অধিক নিকটে)।

দ্বিতীয় আয়াতে একটি তিক্ত কিন্তু অলজ্ঘনীয় বাস্তবতাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে। আল্লহর নবী সা. এরই বৈশিষ্ট্য এরূপ আনন্দঘন ও সুখকর সমাবেশে এমন তিক্ত বাস্তবতাকে উল্লেখ করা, যাতে মানুষ তার শেষ পরিণাম সম্পর্কে উদাসীস না-থাকতে পারে এবং সেই সম্পদের প্রতি যত্নবান থাকে, যা তার সঙ্গে যাবে ও অনন্তকাল তার সঙ্গে থাকবে অর্থাৎ ঈমানের দৌলত। তিনি বললেন, মানুষের জীবন যতই সুখী, আনন্দময়, সৌভাগ্যবান ও সুদীর্ঘ হোক, সর্বদা ফিকির রাখতে হবে- এ জীবনের পরিসমাপ্তি যেন আল্লাহর আনুগত্য এবং ঈমান-ইয়াকীনের উপর হয়। এটিই সেই সত্য ও বাস্তবতা, যাকে দুনিয়ার এক একজন সফল মানুষ- যাকে আল্লাহ পাক সম্মান ও যোগ্যতা, সম্পদ ও সৌভাগ্য, প্রভাব-প্রতিপত্তি ও সৌন্দর্য-সৌকর্য তথা সর্বপ্রকার ধন-রত্নে ধনবান করেছিলেন- সেও উন্নতির স্বর্ণশিখরে পৌঁছার পরেও ভুলতে পারে নি। হযরত ইফসুফ আ. এর সেই অবিস্মরণীয় দু'আকে স্মরণ করুন, যা তিনি সমকালের সর্বোচ্চ উন্নতি ও সম্মানে অধিষ্ঠিত অবস্থায় করেছিলেন। তার ভাষায় শুনুন-

رب قد اتيتنى من الملك وعلمتنى من تأويل الأحاديث فاطر السموات والأرض أنت ولى فى الدنيا والاخرة توفنى مسلما والحقنى بالصالحين

"হে আমার পালনকর্তা! আপনি আমাকে রাষ্ট্রক্ষমতা ও দান করেছেন এবং আমাকে বিভিন্ন তাৎপর্যসহ ব্যাখ্যা করার বিদ্যা শিখিয়ে দিয়েছেন। হে নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডেলের স্রষ্টা! আপনিই আমার কার্যনির্বাহী ইহকালে ও পরকালে। আমাকে ইসলামের উপর মৃত্যু দান করুন এবং আমাকে স্বজনদের সাথে মিলিত করুন।" (সূরা ইউসুফ- ১০১)

এবার সবশেষে বরের মুখ থেকে সেই পুণ্যবাক্য "আমি কবুর করলাম" বের হওয়ার পূর্বে –যা শোনার জন্য সকলেই কান খাঁড়া করে আছেন- কুরআনে কারীম নির্দেশ দিচ্ছে, হে ঈমাদারগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্য ও পাকা কথা মুখ থেকে বের কর। যেন বরকে হেদায়েত করা হচ্ছে, যাতে সে তার মুখনিঃসৃত বাক্যের দায়িত্ব-কর্তব্য ও সুদূর প্রসারী পরিণতির

কথা উপলব্ধি করে। সে যখন বলবে– "আমি কবুল করলাম", তখন বুঝতে হবে, সে কত বড় অঙ্গিকার করছে। এতে তার উপর কত বড় দায়িত্ব অর্পিত হচ্ছে। তারপর বলেন, যদি কেউ এভাবে মেপে-ঝেপে যাচাই-বাছাই করে কথা বলতে অভ্যস্ত হয়ে যায়, তা হলে তার গোটা জীবন এবং তার সকল কথাবর্তা ও কাজকর্ম সত্যতা ও নিষ্ঠার মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হয়ে যাবে। তা এক আদর্শ কীর্তি হয়ে যাবে এবং সে আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তুষ্টির যোগ্যপাত্র হবে। তারপর এই পয়গামকে এই বলে শেষ করেছেন যে, প্রকৃত সফলতা আল্লাহ ও তার রাসূল সা. এর আনুগত্যেও মধ্যেই রয়েছে; প্রবৃত্তির অনুসরণ কিংবা বিভিন্ন প্রথা পালনে নয়।"

বিবাহের খুতবা এবং প্রস্তাব-সমর্থন (ইজাব-কবুল) এরপর যে যে মিষ্টান্নের ব্যবস্থা এই পুণ্যময় অনুষ্ঠানের জন্য করা হয়, তা ছিটিয়ে বা বিতরণ করে দেওয়া হয়। আর এটা বিবাহ অনুষ্ঠানের প্রাচীন রীতি ও সুন্নাত।

হযরত ফাতেমা রাযি. এর সঙ্গে হযরত আলী রাযি. এর বিয়ে

তিনি ছিলেন রাসূলে কারীম সা. এর সর্বকনিষ্ঠা কন্যা, তার বয়স তখন আঠার বছর। বিয়ের প্রস্তাব আসছিল নানা দিক থেকে। হযরত আলী রাযি. যখন প্রস্তাব করলেন, তখন রাসূলে কারীম সা. হযরত ফাতেমা রাযি. এর মতামত জানতে চাইলেন। তিনি চুপ রইলেন। আর এটাও এক ধরনের মতামত প্রকাশভঙ্গি। রাসূলুল্লাহ সা. হযরত আলী রাযি. কে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার নিকট মহর হিসেবে দেওয়ার মতো কি আছে? তিনি বললেন– কিছুই নেই। রাসূলুল্লাহ সা. বললেন, ওই হুদাইনার (তথা বদর যুদ্ধে প্রাপ্ত) বর্মটি কি হল? আরয করলেন, তা তো আছে। নবীজী বললেন– ব্যাস, যথেষ্ট।

প্রত্যক্ষদর্শিদের ধারণা হল, সম্ভবত বিরাট দামি কোনো জিনিস (রূপার) হবে এটা। কিন্তু তারা যদি এর মূল্য জানতে চাইত, তবে জবাব হত– মাত্র সোয়াশ' টাকা। এ বর্মটি ছাড়া হযরত আলী রাযি. এর আর যা কিছু পুঁজি ছিল, তা হল একটি বকরীর চামড়া এবং পুরনো একটি ইয়ামেনী চাদর। হযরত আলী রাযি. এই সমুদয় পুঁজি হযরত ফাতেমা যাহরা রাযি. কে উপহার দিলেন। হযরত আলী রাযি. তখন পর্যন্ত রাসূলে কারীম সা. এর কাছেই থাকতেন। বিয়ের পর পৃথক ঘর নেওয়ার প্রয়োজন হল। হারেছাহ ইবনে নু'মান আনছারীর একাধিক ঘর ছিল। তন্মধ্যে কয়েকটি ঘর তিনি রাসূলুল্লাহ সা. কে উপহারও দিয়েছিলেন। হযরত ফাতেমা রাযি.

নবীজীকে বললেন, তার কাছ থেকেই আরেকটি ঘর নিয়ে দিন। রাসূল সা. বললেন, আর কত! তার কাছে বলতে এখন লজ্জা হচ্ছে? হারেছা কারও মাধ্যমে এ ঘটনা শুনে দৌড়ে এলেন। বললেন, আমি এবং আমার কাছে যা কিছু আছে সবই আপনার। আল্লাহর শপথ! আপনি কোনো ঘর গ্রহণ করলে সেটি আমার কাছে থেকে যাওয়া অপেক্ষা বেশি আনন্দ হয়। মোটকথা, তিনি তার একটি ঘর খালি করে দিলেন। হযরত ফাতেমা রাযি. তাতে বসবাস করতে থাকেন।

উভয় জাহানের বাদশা রাসূলে কারীম সা. বিশ্বনেত্রী হযরত ফাতেমা রাযি. কে কিছু বিবাহ উপহার দিয়েছিলেন। যেমন– একটি সূতার চৌকি, একটি চামড়ার বালিশ– যার ভেতরে ছিল তুলার পরিবর্তে খেজুর পাতা, একটি নূপুর, একটি মশক, দুটি যাতা, দুটি মাটির কলস।

হযরত ফাতেমা রাযি. যখন নতুন ঘরে চলে গেলে রাসূলে কারীম সা. একদিন তার নিকট তাশরীফ রাখলেন। দরজায় দাঁড়িয়ে অনুমতি চাইলেন। তারপর ভিতরে প্রবেশ করলেন। এক পাত্রে পানি চেয়ে আনালেন। তাতে উভয় হাত রাখলেন এবং হযরত আলী রাযি. এর বুকে ও বাহুদ্বয়ে ছিটিয়ে দিলেন। তারপর ফাতেমা রাযি. কে ডাকলেন। তিনি লজ্জায় জড়োসড়ো হয়ে সামনে আসলেন। তার উপরও পানি ছিটিয়ে দিলেন এবং বললেন– আমি আমার বংশের সবচেয়ে উত্তম মানুষের সঙ্গে তোমার বিয়ে দিয়েছি।

হযরত আলী ও হযরত ফাতেমা রাযি. এর অর্থনৈতিক অবস্থা

আলী ও ফাতেমা রাসূলে কারীম সা. এর সবচেয়ে প্রিয়পাত্র। এর জীবন-জীবিকা ছিল যারপরনাই সাদাসিধে; কঠিন পরিশ্রম, ধৈর্য-স্থৈর্য, সংযম ও কষ্টের। হান্নাদ রহ. হযরত আতা রহ. থেকে বর্ণনা করেন,

"আমাকে বলা হয়েছে– হযরত আলী রাযি. বলেছেন, এমন অনেক দিন কেটে গেছে, যেদিন আমাদের ঘরে খাওয়ার কোনো দ্রব্য ছিল না আর না নবী কারীম সা. এর কাছে কিছু ছিল। সেই সময় একবার বাইরে বের হলাম। তখন পথিমধ্যে একটি দীনার পড়ে আছে দেখতে পেলাম। আমি নড়ে চড়ে দাঁড়িয়ে গেলাম আর মনে মনে ভাবতে লাগলাম, এটি কুড়িয়ে নিব নাকি ফেলে যাব। কিন্তু অভাবের তীব্রতায় আমি তা কুড়িয়ে নেওয়ারই সিদ্ধান্ত নিলাম। সুতরাং তা কুড়িয়ে নিলাম এবং সেটি এক স্বর্ণকারকে দিলাম। সে বাইর থেকে খাদ্যশস্য আমদানী করেছিল। তার থেকে এর দ্বারা ক্রয় করলাম আটা এবং ফাতেমাকে দিয়ে বললাম, এগুলো খামীর করে রুটি

বানিয়ে নাও। সে আটা খামীর করছিল। কিন্তু অনাহারের কারণে সে এত দুর্বল ছিল যে, আটা খামীর করতে গিয়ে হাত বারবার পাত্রের উপর ছিটকে পড়ত এবং আঘাত লাগত। মোটকথা, কোনোমতে সে আটা গুলিয়ে রুটি তৈরি করল। আর আমি রাসূলে কারীম সা. এর দরবারে এসে এই ঘটনার বৃত্তান্ত দিলাম। তিনি বললেন, খেয়ে নাও! আল্লাহ তা'আলা এ রিযিক তোমাদেরকে কুদরতীভাবে পৌঁছিয়েছেন। আর হান্নাদ দীনাওয়ারী শা'বী একটি হাদীস নকল করেছেন। তিনি বলেন, হযরত আলী রাযি. বলেছেন– আমি যখন ফাতেমা বিনতে মুহাম্মাদ সা. কে বিয়ে করলাম। তখন আমার কিংবা তার কাছে ভেড়ার চামড়া ছাড়া আর কোনো বিছানা ছিল না। তার উপরই আমরা রাতে ঘুমাতাম আর দিনে তাতেই আমাদের বকরীকে ঘাস-পাতা দিতাম। এছাড়া আমাদের নিকট কোনও খাদেম (চাকর) ছিল না।

ইমাম তাবারানী নির্ভরযোগ্য সনদে (হাসান সনদে) বর্ণনা করেছেন, হযরত ফাতেমা রাযি. বলেছেন– একদিন রাসূলে কারীম সা. তার কাছে এসে বললেন– তোমার বাচ্চারা কোথায়? অর্থাৎ হাসান-হুসাইন রাযি.। হযরত ফাতেমা রাযি. বললেন, আজ আমরা সকালে উঠেছি, তখন ঘরে একটি জিনিসও এমন ছিল না, যা কেউ চিবাতে পারি। তাদের পিতা বললেন, এদের দু'জনকে বাইরে নিয়ে যাচ্ছি। যদি ঘরে থাকে তবে আমাদের সামনে কান্নাকাটি করবে। আর তোমার কাছে এমন কিছু নেই, যা খাইয়ে শান্ত করবে। কাজেই তিনি অমুক ইয়াহুদীর কাছে গিয়েছেন। রাসূলে কারীম সা. সেখানে তাশরীফ নিয়ে গেলেন। দেখলেন এই দুই শিশু একটি বোতল/সোরাহী নিয়ে খেলা করছে। আর তাদের সামনে বেঁচে যাওয়া পরিত্যক্ত দু'-একটা খেজুর রয়েছে। রাসূলে কারীম সা. বললেন– আলী! এখন বাচ্চাদের ঘরে নিয়ে চলো। রৌদ্রতাপ বাড়ছে। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আজ সকাল থেকে আমাদের ঘরে একটি দানাও নেই। কাজেই আপনি যদি একটু অপেক্ষা করেন, তবে আমি ফাতেমার জন্য কিছু উচ্ছিষ্ট-পরিত্যক্ত খেজুর কুড়িয়ে নিব। একথা শুনে রাসূলে কারীম সা. বসে পড়লেন। এমনকি ফাতেমার জন্য কিছু পরিত্যক্ত খেজুর কুড়ানো হয়ে গেল। হযরত আলী রাযি. খেজুরগুলো একটি কাপড়ে বেঁধে নিলেন এবং এগিয়ে এসে দুজনকে কোলে নিয়ে চলে আসলেন।

ইমাম বুখারী রহ. হযরত আলী (রহ.) থেকে বর্ণনা করেন, হযরত ফাতেমা চাক্কি পিষতে পিষতে অস্থির হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি জানতে পারলেন রাসূলে কারীম সা. এর নিকট কিছু বন্দী গোলাম এসেছে। হযরত

ফাতেমা নবীজীর দরবার হাজির হলেন। কিন্তু নবীজী সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। তিনি হযরত আয়েশা রাযি. কে একথা বলে দিলেন। হযরত আয়েশা রাযি. রাসূলে কারীম সা. এর কাছে আরয করলেন। পরে রাসূলে কারীম সা. আমাদের এখানে তাশরীফ নিলেন। আমরা তখন ঘুমাতে যাচ্ছিলাম। নবীজীকে দেখে আমরা উঠতে লাগলাম, তখন নবী কারীম সা. বললেন, নিজের জায়গায়ই থাকো। সে সময় আমি রাসূলে কারীম সা. এর পায়ের শীতলতা নিজের বুকে অনুভব করি। তারপর নবীজী বললেন, তোমরা দু'জন যে জিনিসের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছ, তার চেয়ে উত্তম জিনিস কি আমি তোমাদের বলে দিব? যখন তোমরা ঘুমাতে যাবে, তখন ৩৪ বার আল্লাহু আকবার, ৩৩ বার আল-হামদু লিল্লাহ এবং ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ পড়ে নিবে। এটা তোমাদের দু'জনের জন্য তদপেক্ষা অধিক ফলপ্রসূ হবে, যা তোমরা প্রার্থনা করেছ।

আরেক বর্ণনায় ঘটনাটি নিম্নরূপে বর্ণিত হয়েছে, "রাসূলে কারীম সা. বললেন, আমি আহলে সুফ্ফাকে বাদ দিয়ে– যাদের ক্ষুধায় পেটে মোচড়াচ্ছে– তোমাদেরকে দিব না। আমার কাছে তাদের পানাহারের কিছুই নেই। তবে সেসব গোলাম বিক্রি করে তার মূল্য ওই আহলে সুফ্ফার জন্যে খরচ করব।

পুণ্যাত্মা রমণীগণ এবং বহুবিবাহের কারণ

পুণ্যাত্মা রমণীগণ

রাসূলে কারীম সা. এর পুণ্যাত্মা স্ত্রীগণের মধ্যে সর্বপ্রথম নাম হযরত খাদীজা বিনতে খুওয়াইলিদ রাযি. এর। তিনি নবীজীর নবুওয়াত লাভের পূর্বে, যখন তার বয়স চল্লিশ, সেসময় নবীজীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হোন। হযরত খাদীজা রাযি. রাসূলে কারীম (সা.) এর নবুওয়াত লাভের পর ক্রমাগত সর্বপ্রকার দুঃখ-কষ্টে নবীজীকে পুরোপুরি সাহায্য করেছেন। জিহাদ ও কুরবানীতে তাঁর সঙ্গে অংশ নিয়েছেন। নিজের সহমর্মিতা, ভালবাসা এবং ধন-সম্পদ দ্বারা সার্বিকভাবে নবীজীর সান্ত্বনা-প্রবোধ, প্রশান্তি ও রশদ যুগিয়েছেন। তার ইন্তিকাল হয়েছে হিজরতের তিন বছর পূর্বে। রাসূলে কারীম (সা.) এর সকল সন্তান (সাইয়িদুনা ইবরাহীম রাযি.) ব্যতীত হযরত খাদীজা রাযি. এর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। নবীজী (সা.) স্বপ্রশংস ও কৃতজ্ঞতার সাথে সব সময় তার আলোচনা করতেন। কখনও কখনও তো বকরী যবাই করা হলে নবীজী (সা.) এর বিভিন্ন অংশ আলাদা করে হযরত খাদীজা রাযি. এর বান্ধবীদের কাছে পাঠাতেন। [বুখারী-মুসলিম। হযরত আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলে কারীম সা. এর পুণ্যাত্মা রমণীগণের মধ্যে কারও প্রতিই আমার এতটুকু ঈর্ষা হয় নি, যতখানি হয়েছে খাদীজা রাযি. এর ওপর। অথচ আমি তাকে দেখিও নি।] তার ইন্তিকালের কিছুদিন পর সাওদা বিনতে যাম'আ রাযি. এর রাসূলে কারীম (সা.) এর জীবনসঙ্গিনী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ হয়েছে। এরপর নবীজী সা. হযরত আয়েশা রাযি. কে বিয়ে করেন। যিনি তাঁর অতিপ্রিয় ও মহব্বতের স্ত্রী ছিলেন। মুসলিম নারীদের মধ্যে ফিক্‌হ ও ইলমে দ্বীন বা ধর্মীয় জ্ঞানে কেউ তার সমতূল্য ছিল না। বড় বড় সাহাবায়ে কিরাম বিভিন্ন মাসয়ালা-মাসায়েল সম্পর্কে তার শরণাপন্ন হতেন এবং তার মতামত ও সিদ্ধান্ত চাইতেন। এরপর নবীজী সা. হযরত উমর রাযি. এর কন্যা হযরত হাফসা রাযি. এর সাথে বিবাহে আবদ্ধ হোন। এরপর বিয়ে হয় হযরত

যয়নব বিনতে খুযাইমা রাযি. এর সঙ্গে। যিনি বিবাহের দু'মাস পর ইন্তিকাল করেন। এরপর উম্মে সালামা রাযি. নবীজীর বিবাহে আসেন। তার ইন্তি কাল হয় পুণ্যাত্মা স্ত্রীগণের সকলের পরে। তারপর বিয়ে করেন যয়নব বিনতে জাহশ রাযি. কে, যিনি ছিলেন নবীজী সা. এর ফুফু উমাইমা এর কন্যা। এরপর তিনি জুওয়াইরিয়া বিনতে হারেস রাযি. কে বিয়ে করেন। তিনি ছিলেন বনুল-মুস্তালিক গোত্রের কন্যা। তারপর আবু সুফিয়ান রাযি. এর কন্যা উম্মে হাবীবা রাযি এর সাথে, তারপর বনূ নাযীর গোত্রের নেতা হুওয়াই ইবনে আখতারের কন্যা হযরত সফিয়া রাযি. এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। হুওয়াই ইবনে আখতাব ছিলেন হযরত মূসা আর এর ভাই হারূন ইবনে ইমরান (আ.) এর বংশধর। এরপর সবশেষে হযরত মাইমূনা বিনতে হারেছ হেলালিয়া রাযি. এর সাথে বিবাহ হয়। পুণ্যবতী স্ত্রীগণের মধ্যে সবার শেষে তারই এই সৌভাগ্য নসীব হয়।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, রাসূলে কারীম সা. এর ইন্তিকালের সময় তাঁর পুণ্যবতী স্ত্রীগণের মধ্যে নয়জন জীবিত ছিলেন। হযরত খাদীজা রাযি. এবং যয়নব বিনতে খুযাইমা রাযি. এর নবীজীর জীবদ্দশায়ই ইন্তিকাল হয়ে গিয়েছিল। একমাত্র হযরত আয়েশা রাযি. ব্যতীত তাঁরা সকলেই ছিলেন পূর্ব-বিবাহিতা।

নবীজীর ইন্তিকালের সময় তাঁর দু'জন বাঁদী জীবিত ছিল। একজন মারইয়া বিনতে শামউন। সে ছিল মিসরের কিবতী বংশোদ্ভূত মেয়ে। তাকে মিসরের শাসক মুকাওকিস নবীজীর খেদমতে উপহার হিসেবে পেশ করেছিলেন আর তিনিই ছিলেন নবীজীর পুত্র সাইয়্যিদুনা ইবরাহীম রাযি. এর গর্বিত মাতা। দ্বিতীয়জন ছিলেন বনূ নাযীর গোত্রের কন্যা (বর্ণনান্তরে বনু কুরাইযা গোত্রের কন্যা) রাইহানা বিনতে যায়েদ। ইসলাম গ্রহণের পর নবীজী তাকে মুক্ত করে দিয়েছিলেন এবং পরে তাকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন।

আল্লাহ তা'আলা নবীজীর ইন্তিকালের পর তাঁর পুণ্যবতী স্ত্রীগণের সাথে বিবাহে আবদ্ধ হওয়াকে মুসলমানদের উপর হারাম সাব্যস্ত করেছেন। কারণ, তারা ছিলেন উম্মাহাতুল মুমিনীন (মুসলমানগণের মাতা) এর মর্যাদার অধিকারী। সেই সম্পর্ক (বিবাহের সাথে) সেই পবিত্র ও স্পর্শকাতর আত্মীয়তার পূর্ণ সংরক্ষণ ও যত্ন হতে পারত না, যা উম্মতের আপন নবীর সাথে (স্থায়ীভাবে) রয়েছে।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا ازواجه من بعده ابدا ان ذلكم كان عندالله عظيما

"আল্লাহর রাসূলকে কষ্ট দেওয়া এবং তাঁর ওফাতের পর তাঁর পত্নীগণকে বিবাহ করা তোমাদের জন্য বৈধ নয়। আল্লাহর কাছে এটা গুরুতর অপরাধ।" (সূরা আহযাব– ৫৩)

আল্লামা ইবনে কাছীর রহ. এ আয়াতে কারীমার ব্যাখ্যায় লিখেন– সকল উলামায়ে কিরাম পূর্ণ ঐকমত্যে নবীজী সা. ওফাতের পর অন্য কারও জন্য নবীজীর পুণ্যবতী স্ত্রীগণের সাথে বিবাহে আবদ্ধ হওয়া হারাম। কারণ, তাঁরা ইহকাল ও পরকাল উভয় স্থানে তাঁর স্ত্রী এবং ঈমানদারদের শ্রদ্ধাস্পদ মা।

বহুবিবাহ সম্পর্কে কিছু কথা

রাসূলে করীম সা. তাঁর জীবনের বিরাট এক অংশ নির্জনে নিভৃতে কাটিয়েছেন। এটা পঁচিশ বছরের সেই সময়, যা যৌবনের একান্ত বিশেষ সময় হয়ে থাকে। তিনি পূর্ণাঙ্গ স্বভাবধর্মী মানবিক, আরবী পৌরুষ-বীরত্ব এবং শারীরিক সুস্থতা ও সুঠাম দেহের উত্তম ও অতি উৎকৃষ্ট পথিকৃৎ ছিলেন। তাঁর লালন-পালন হয়েছিল আরবের গ্রামের এক নির্মল পরিবেশে। সভ্যতা-সংস্কৃতির ব্যাধিসমূহ এবং কলুষতা থেকে আল্লাহ তাকে নিরাপদ রেখেছিলেন। অশ্বারোহন ও পৌরুষ-বীরত্বের উন্নত গুণাবলী তার মধ্যে ছিল পর্যাপ্ত। আরবদের দৃষ্টিতে যার বিরাট গুরুত্ব ছিল এবং যেগুলোকে শরীর বিদ্যা ও চারিত্রিকতায় অভিজ্ঞ পণ্ডিতগণও স্বীকার করেছেন।

তাঁর চরম জঘন্য শত্রুদের পর্যন্ত সে সময় (নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বে তাঁর যে সময়টা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর ছিল। তাঁর উপর কালিমা লেপন বা কটূক্তি ও আঙ্গুলী উঠানোর কোনও সুযোগ হয় নি। না তাঁর নবুওয়াত প্রাপ্তির পর আজ পর্যন্ত কেউ এ ব্যাপারে তত্ত্ব বের করতে পেরেছে। তিনি পুতঃপবিত্রতা, সাধুতা, নির্মলতা, পরিচ্ছন্ন হৃদয় ও দৃষ্টি, নিষ্কলুষতা ও নিষ্পাপতার সর্বোচ্চ উপমা ছিলেন। এমনকি যেসব তাঁর জন্য শোভনীয় নয়, তা থেকেও তিনি ছিলেন বহুদূরে ও বহু উপরে।

পঁচিশ বছর বয়সের এই পূর্ণ যৌবনে তিনি সর্বপ্রথম হযরত খাদীজা রাযি. সাথে বিবাহে আবদ্ধ হন। যিনি ছিলেন পূর্ববিবাহিতা ও বিধবা। চল্লিশোর্ধ্ব ছিল তার বয়স। ইতোপূর্বে তার দুটি বিয়েও হয়েছিল। ছিলেন একাধিক সন্তানের জননী। তা ছাড়া প্রসিদ্ধ বর্ণনামতে নবীজীর এবং তার

মধ্যে বয়সে পনের বছরের ব্যবধান ছিল। তারপর নবী কারীম সা. দ্বিতীয় বিবাহ করেছেন হযরত সাওদা বিনতে যাম'আ রাযি. কে। সে সময় নবীজীর বয়স হয়ে গিয়েছিল পঞ্চাশ বছর। তার স্বামী হাবশায় একজন মুহাজির মুসলমান হিসেবে ইন্তিকাল হয়ে গিয়েছিল। তিনি একমাত্র হযরত আয়েশা রাযি. ব্যতীত কোন কুমারী-অনুঢ়া নারীকে বিয়ে করেন নি। অধিকন্তু তিনি যেসব বিয়ে করেছেন, তাতে দ্বীন-ধর্ম ও দ্বীনের দাওয়াতের কোন কল্যাণ, মনঃতুষ্টি, উদারতা, সহমর্মিতা, উন্নত চরিত্র মুসলমানদের কোন গণস্বার্থ কিংবা বড় কোন সামাজিক বিপদ আশঙ্কা ও বিপর্য প্রতিরোধ করাই ছিল তার মূল্য লক্ষ্য। আত্মীয়-স্বজন ও বৈবাহিক সম্পর্কেও যতখানি গুরুত্ব আরবের গোত্রীয় ও সামাজিক জীবনে রয়েছে, ততখানি অন্য কোন গোষ্ঠী ও সমাজে নেই। এজন্য এসব বিবাহ এবং নতুন আত্মীয়তা ইসলামের দাওয়াত ও ইসলামের আদর্শ সমাজের ইতিহাস রক্তপ্রবাহ থেকে রক্ষা এবং আরব গোত্রগুলো বহুমুখী ক্ষতি থেকে মুক্তির বিরাট একটি মাধ্যম ছিল।

তা ছাড়া সেসব পুণ্যবতী স্ত্রীর সঙ্গে রাসূলে কারীম সা. এর জীবন যাপন কোনও আরাম-আয়েশ, আনন্দ-বিনোদন ও আমোদ-প্রমোদের জীবন ছিল না। যা বহুবিবাহের ক্ষেত্রে অনেক লোকেরই উদ্দেশ্য থাকে। তা এর উঁচু পর্যায়ের যুহদ ও তাকওয়া, কষ্ট-সাধনা, ত্যাগ-তীতিক্ষা ও অল্পেতুষ্টির জীবন ছিল, যার শক্তি-সামর্থ্য প্রাচীন ও অধুনা কোনো কালের বড় বড় সাহসী, শক্তিশালী, দৃঢ়চিত্ত ব্যক্তি ও বিখ্যাত দুনিয়াবিরাগী যাদের মধ্যে নেই (এবং থাকতেও পারে না)। এর সামান্য আলোআভা ও নমুনা জীবনচরিত অংশে পেশ করা হবে। তদুপরি একজন ইনসাফপ্রিয় ব্যক্তির জন্য কুরআনে কারীমের নিচের এই একটি আয়াতই যথেষ্ট। আল্লাহ পাক বলেন–

يأيهاالنبى قل لأزواجك إن كنتن تردن الحيوة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا- وإن كنتم تردن الله ورسوله والدار الاخرة فان الله أعد للمحسنات منكن اجرا عظيما-

"হে নবী! আপনার পত্নীগণকে বলে দিন, তোমরা যদি পার্থিব জীবন ও তার বিলাসিতা কামনা কর, তবে এসো, আমি তোমাদের ভোগের ব্যবস্থা করে দিই এবং উত্তম পন্থায় তোমাদেরকে বিদায় দেই।

পক্ষান্তরে যদি তোমরা আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও পরকাল কামনা কর, তবে তোমাদের সৎকর্মপরায়ণদের জন্যে আল্লাহ মহা পুরস্কার প্রস্তুত করে রেখেছেন।" (সূরা আহযাব– ২৮-২৯)

এই মহান উদ্দেশ্য, পবিত্র আগ্রহ-উদ্যম, স্বচ্ছ-পরিচ্ছন্ন মানসিকতা এবং গভীর ও প্রজ্ঞাপূর্ণ শিক্ষার প্রতিক্রিয়া সেসব পুণ্যবতী পত্নীগণ কোনও প্রকার ইতস্ততঃ, সঙ্কোচ এবং এতটুকু দ্বিধাদ্বন্দ্ব ব্যতীত আল্লাহ, তার রাসূল ও পরকালকে প্রধান্য দিয়েছেন। উপমা হিসেবে হযরত আয়েশা রাযি. এর সে জবাবই যথেষ্ট, যা তিনি এ প্রসঙ্গে প্রাধান্য দিয়েছিলেন। রাসূলে কারীম সা. এ আয়াতে কারীমা তাদের সম্মুখে তিলাওয়াত করার পর ইরশাদ করলেন– দেখ! তাড়াহুড়া করবে না। নিজের পিতামাতার সঙ্গে অবশ্যই পরামর্শ করে নিবে। তিনি জবাব দিলেন– ভাল কথা! এ ব্যাপারেও পিতা-মাতার সাথে পরামর্শের প্রয়োজন আছে? আমার তো আল্লাহ, তার রাসূল এবং পরকাল উদ্দেশ্য। (বুখারী) হযরত আয়েশা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. এর সকল পত্নীই এমনটি করলেন।

বহুবিবাহ এবং এর মনোস্তাত্ত্বিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক প্রভাব ও দাবিসমূহ রাসূলে কারীম সা. কে দাওয়াতের বিশাল দায়িত্ব, শ্রম-সাধনা ও মুজাহাদার জীবন এবং মুসলমানদের আরো গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনাদি ও কর্মকাণ্ড থেকে মুহূর্তের জন্যেও উদাসীন করে নি বরং এর ফলে তাঁর কর্মতৎপরতা, দৃঢ়চিত্ততা, শক্তি ও চেতনায় আরো অনেক গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। পুণ্যবতী স্ত্রীগণ ইসলামের প্রচার-প্রসার ও ধর্মীয় শিক্ষার মহান লক্ষ্যে বরাবরই তাঁর সহযোগী ও সাহায্যকারী ছিলেন। তারা বিভিন্ন যুদ্ধ-জিহাদে তাঁর সহযাত্রী ছিলেন। আহতদের চিকিৎসা-সেবা এবং রুগ্নদের শুশ্রূষা করতেন। তাঁর পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের এক-তৃতীয়াংশ এবং অন্যান্য আরও অনেক হুকুম-আহকাম ও শিক্ষামালা এসব পুণ্যবতী স্ত্রীগণেরই করুণা-দান। মুসলসমানগণ সেগুলো যথারীতি তাদের কাছ থেকেই শিখেছে, আয়ত্ত করেছে এবং অপরকে বলেছে ও শিখিয়েছে।

এ প্রসঙ্গে শুধু হযরত আয়েশা রাযি. এর নাম নেওয়াই যথেষ্ট। যার সম্পর্কে "এলমে রিজাল ও তবাকাত" শাস্ত্রের ইমাম যাহাবী রহ. (মৃত: ৭৪৮ হি.) তার বিখ্যাত গ্রন্থ "তাযকিরাতুল হুফ্ফায" এর মধ্যে লিখেছেন– "তিনি ছিলেন ফকীহ সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে সবচেয়ে আলাদা। ফকীহ সাহাবীগণ অনেক মাসয়ালায় তাঁর শরণাপন্ন হতেন। কবীছাহ বিনতে যুওয়াইব রাযি. থেকে বর্ণিত আছে, হযরত আয়েশা রাযি. মাসয়ালা-মাসায়েল সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি জ্ঞান রাখতেন। বড় বড় প্রবীণ সাহাবায়ে কিরাম তাঁর কাছে বিভিন্ন মাসয়ালা জিজ্ঞাসা করতেন। হযরত আবু মূসা বলেন, আমাদের রাসূলুল্লাহ সা. এর সাহাবীগণের কোনও হাদীস বুঝতে

কষ্ট হলে আমরা তখন হযরত আয়েশা রাযি. এর নিকট জিজ্ঞাসা করতাম আর তাঁর কাছে অবশ্যই সে সম্পর্কে ইলম/জ্ঞান থাকত। হাসসান রাযি. বলেন– আমি কুরআনে কারীম, হালাল-হারাম, ফারায়েয ও আহকাম, শে'র-কবিতা, আরব ও বংশ ইতিহাস সম্পর্কে তার চেয়ে অভিজ্ঞ আর কাউকে পাইনি।

তাঁর উন্নত চরিত্র, উঁচু সাহস, বদান্যতা-দানশীলতা, সমবেদনা, সহমর্মিতা, স্নেহ-মমতা, মহানুভবতা ও হৃদ্যতার সম্পর্কে যত-যা-ই বলা হোক, তাও কম হয়ে যাবে। এ প্রসঙ্গে সেই বর্ণনাই যথেষ্ট হবে, যা হিশাম তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন– একবার আমীর মু'আবিয়া রাযি. হযরত আয়েশা রাযি. এর নিকট এক লক্ষ দিরহাম প্রেরণ করলেন। আল্লাহর শপথ! এক মাসও গত হয় নি। হযরত আয়েশা রাযি. অভাবীদের মাঝে সেই দিরহাম (রৌপ্যমুদ্রা) বিতরণ করে অবসর হয়ে গেলেন। তাঁর বাদী বলল– আপনি যদি এখান থেকে এক দিরহামের গোশত কিনে নিতেন, তবে ভাল ছিল। হযরত আয়েশা রাযি. বলতে লাগলেন, তুমি তখন স্মরণ করিয়ে দিলে না? সে সময় হযরত আয়েশা রাযি. রোযা অবস্থায় ছিলেন।

এ বিষয়টি পাশ্চাত্যের অনেক গবেষক চিন্তাবিদ এবং প্রাচ্যবিদদের মেধা-মনন বিক্ষিপ্ত এস্তব্যস্ত করে রেখেছে। আর এর একমাত্র কারণ তারা আরব দেশগুলোতে এবং ইসলামী শরী'অতে দাম্পত্য জীবনের বিশেষ ব্যবস্থাকে পাশ্চাত্যের চিন্তাধারা, অবস্থা-প্রেক্ষিত, স্বভাব-রীতি ও রুসম-রেওয়াজের অনুগত বানাতে চায়। তারা পাশ্চাত্যের (এক বিশেষ সভ্যতা ও সোসাইটির উৎপাদিত) শর্তগুলোকে সেই অবস্থা চিত্রের উপর চাপানোর চেষ্টা করেছে, যা ছিল বহুবহু সুস্থ স্বভাবরীতি ও আরবের পরিবেশ মাফিক এবং যার পেছনে ছিল বিভিন্ন চারিত্রিক ও সামাজিক হিতাকাঙ্ক্ষা ও কল্যাণ ক্রিয়াশীল। আরও ছিল মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে অনুমোদন। এটা মূলত পাশ্চাত্য চিন্তাধারা ও পাশ্চাত্য লেখকদের বই-পুস্তকের বিরাট এক দুর্বল দিক। তারা প্রথমে পাশ্চাত্যকে মানদণ্ড সাব্যস্ত করে। তারপর প্রত্যেক ঐ জিনিসের বিরুদ্ধে নির্দয়ভাবে সিদ্ধান্ত প্রকাশ করে, যা তার বিপরীত হয়। স্বয়ং তিনি একটি উদ্ভট বিষয় এনে দাঁড় করান, যার কোনও ভিত্তিমূল বলতে কিছু নেই। তারপর এর সমাধানের পেছনে লেগে যান। এটা এদের জাতীয় অহংকার এবং পাশ্চাত্যের মনগড়া চিন্তাধারা ও কল্পনার সীমাতিরিক্ত পবিত্রায়ণের কুফল।

বৃটিশ লেখক মিস্টার বোডলে (R.V.C. Bodley) রাসূলে কারীম সা. এর পুণ্যবতী পত্নীগণের বিষয়ে এই পাশ্চাত্য অনুভূতি ও চিন্তাধারার উপর নেহাৎ সাহসিকতা ও ন্যায়ানুগ সমালোচনা করেছেন। তিনি তার স্বরচিত গ্রন্থে লিখেন– মুহাম্মাদ (সা.) এর দাম্পত্য জীবন (বা বৈবাহিক জীবন) না পাশ্চাত্যের মানদণ্ডে যাচাইয়ের প্রয়োজন আছে আর না সেসব প্রথা-প্রচলন আইন-কানুনের দৃষ্টিকোণ থেকে, যেগুলোর জন্ম দিয়েছে খ্রিষ্টান। এই মানুষটি না পাশ্চাত্যের ছিলেন; না খ্রিষ্টান বরং তিনি এমন এক দেশে এবং এমন এক যুগে জন্ম নিয়েছিলেন, যখন তার নিজের চারিত্রিক নীতির (চরিত্র দর্শনের) প্রচলন ছিল। এতদসত্ত্বেও আমেরিকা-ইউরোপের চরিত্র- দর্শনকে আরবদের চরিত্র দর্শন থেকে উন্নত-উৎকৃষ্ট মনে করার কোনোই কারণ নেই। পাশ্চাত্যের কাছে প্রাচ্যকে দেওয়ার অনেক কিছু আছে। কিন্তু নিজের জীবন-পদ্ধতিকে উত্তম এবং নিজের চরিত্র দর্শনকে উন্নত-উৎকৃষ্ট প্রমাণ করার জন্য তো তাদের এখনো অনেক গবেষণা ও বিচার-বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। কাজেই অন্যদের সভ্যতা-সংস্কৃতির মধ্যে ছিদ্রান্বেষণ করা থেকে তাদের নিবৃত হওয়া উচিত। (The Messenger, The Life of Mohammad)

তা ছাড়া বহুবিবাহের সেই দোষ, আজ যা পাশ্চাত্যে প্রকাশ্য বাস্তবতা হয়ে গেছে এবং পাশ্চাত্যবাসী এসব চোখ বন্ধ করে মেনে নিয়েছে, তা এমন কোনও দোষ বা জঘন্যতা নয় যে শতাব্দীর পর শতাব্দী ও প্রজন্মের পর প্রজন্মে বর্তমান থাকবে। এটা না চূড়ান্ত জ্ঞানগত মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত; না মানবীয় সুস্থ বিবেকসম্মত। এটা মূলত একটি কাল্পনিক ও অতি-উৎসাহব্যঞ্জক দোষ; যা আবেগপূর্ণ, উস্কানিমূলক ও শক্তিশালী প্রপাগাণ্ডা এবং অপপ্রচারের জোরে টিকে আছে। কাজেই খুব সম্ভব সময়ের আবর্তনে এবং অর্থনৈতিক, সামাজিক ও শিক্ষামূলক দৃষ্টিভঙ্গি আর অবস্থা-প্রেক্ষিত পরিবর্তনের সাথে সাথে না কেবল এর শক্তিই হ্রাস পাবে বরং চিরদিনের জন্য নিস্তব্ধ হয়ে যাবে।

জনৈক পাশ্চাত্য লেখক (Alwin Toffler) তার নতুন রচনা “Future Shook” যা পাশ্চাত্যেও শিক্ষিত মহলে বিরাট হৈ চৈ ফেলে দিয়েছে, এর মধ্যে তিনি সেই মানসিক ও সামাজিক পরিবর্তনের প্রতি ইঙ্গিতও করেছেন, যা অদূর ভবিষ্যতে প্রকাশিতব্য।

মুসলিম নারীদের সমীপে

ইসলামী সমাজ

প্রিয় ভাই ও বোনেরা! আমি এই সম্মান প্রদর্শনের জন্য খুবই কৃতজ্ঞ যে, আপনারা আমাকে এই সভায় স্মরণ করেছেন এবং একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ ও জটিল বিষয়ে কথা বলার সুযোগ দিয়েছেন। আমি এ কারণেও শোকরিয়া জ্ঞাপন করছি যে, আপনারা আমার সৌজন্যে এই প্রোগ্রামে রদবদল ও সংশোধন মেনে নিয়েছেন। এটা আপনাদের ভদ্রতা ও সচ্চরিত্রতা। আমি কুরআনে কারীমের একটি আয়াত পাঠ করব এবং বলব– ইসলাম সমাজকে কি দৃষ্টিতে দেখে? তার মূল্যায়ন ও চিন্তাধারা কি? আর তা এ ব্যাপারে কতটুককু বাস্তবধর্মী প্রমাণ হয়েছে।

এ আয়াতে কারীমাটি সূরা নিসার। এ সূরার নামটিই প্রমাণ করে যে, ইসলাম নারী সমাজ এবং দুর্বল জাতিকে কি মর্যাদা দিয়েছে। সূরা নিসার প্রথম আয়াত–

يا ايها الناس اتقوا ربكم--------------- ان الله كان عليكم رقيبا

"হে মানব সমাজ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর, যিনি এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তার থেকে তার সঙ্গিনীকে সৃষ্টি করেছেন; আর বিস্তার করেছেন তাদের দু'জন থেকে অগণিত পুরুষ ও নারী। আর আল্লাহকে ভয় কর। যার নামে তোমরা একে অপরের নিকট যাঞ্চা করে থাক এবং আত্মীয়-জ্ঞাতীদের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করা। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের ব্যাপারে সচেতন রয়েছেন। (সূরা নিসা– ১)

আমি মনে করি, নারীসমাজ সম্পর্কে ইসলামের ভাবনা, দৃষ্টিভঙ্গি এবং পুরুষ ও নারীর পারস্পরিক দায়িত্ব-কর্তব্য ও সম্পর্কের রূপরেখা প্রসঙ্গে উল্লেখিত আয়াতে কারীমা পুরোপুরি দিক-নির্দেশনা প্রদান করে। প্রথমত আল্লাহ তা'আলা এতে ইরশাদ করেছেন– এই দুই শ্রেণীর সৃষ্টি একইভাবে হয়েছে। তাদের ভাগ্য পরস্পরের সাথে এমনভাবে জড়িত, যেন একই দেহের দুটি অঙ্গ। পুরুষ ও নারীর শারীরিক গঠন আকৃতিতে যৎসামান্য

পার্থক্যের কারণ হল, যাতে তারা সুখ-সাচ্ছন্দ্যে জীবন সফর অতিক্রম করতে পারে।

প্রথমে তো এই দুই শ্রেণীর অস্তিত্ব এক সত্তা থেকে হয়েছে। তারপর ওই এক সত্তাকে দু'ভাগে বিভক্ত করে দেওয়া হয়েছে। এই বিভাজন সত্ত্বেও তাদের মধ্যে কোনও বিরোধ, কোনও বৈরিতা নেই বরং তারা শেষে গিয়ে একই কেন্দ্রে এক হয়ে যায়। এ পৃথিবীতে সফররত মানুষকে সফরসঙ্গী ও সহযাত্রী দেওয়া হয়েছে তার জাতি থেকে আর সে তারই দেহের অংশ। অনন্তর তাদের দু'জন থেকে মানবগোষ্ঠীর প্রসার ও বিস্তার ঘটেছে। আল্লাহ তা'আলা তাদের দু'জনের বন্ধুত্ব, প্রেম-ভালবাসা ও সহযাত্রায় প্রভূত কল্যাণ ও বরকত দান করেছেন। কাজেই তাদের দু'জন থেকে হাজার জন হয়েছে আর হাজার জন থেকে লাখ-লাখ, কোটি কোটি হয়েছে। এমনকি জনসংখ্যার সঠিক পরিসংখ্যান কম্পিউটারও দিতে পারবে না, কতজন মানুষ জন্ম নিয়েছে। তা কেবলই আল্লাহ জানেন। كثيرا (অনেক) শব্দ এনে আল্লাহ পাক তাদের সংখ্যাধিক্যের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

সেই নিবেদক; সেই নিবেদনপ্রাপ্ত

এবার আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– "তোমরা সেই আল্লাহকে ভয় কর, যার নামে তোমরা একে অন্যের কাছে যাঞ্চা কর।" কুরআনে কারীমে বৈপ্লবিকভাবে এই ধারণা প্রথমবার পেশ করা হয়েছে যে, মানব সমাজের প্রতিটি সদস্য একে অন্যের মুখাপেক্ষী। প্রত্যেকেই প্রার্থনাকারী ও আবেদনকারী আবার প্রত্যেকেই আবেদনপ্রাপ্ত অর্থাৎ প্রত্যেকেই অন্যের কাছে কিছু না কিছু চায় আবার তার কাছেও কেউ না কেউ চায়। তারপর এভাবে বিভাজন করা হয় নি, যাতে একদিকে আবেদনকারীগণ আর অপরদিকে আবেদনপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ থাকে বরং যে আবেদনকারী সেই আবার আবেদনপ্রাপ্ত; যে কিছু চাইল; তাঁর কাছেই আবার চাওয়া হচ্ছে। আবার কখনও এর উল্টো। تساؤل (পারস্পরিক প্রশ্নোত্তর) এমন একটি শিকল, যাতে প্রত্যেকেই আবদ্ধ। আমাদের সভ্য জীবন একটি জাল। যেখানে প্রত্যেকেই অপরের মুখাপেক্ষী।

পুরুষ নারীকে ছাড়া তার আল্লাহ প্রদত্ত ও স্বাভাবধর্মী সফর সুখকর ও মধুময় পন্থায় অতিক্রম করতে পারে না। আবার কোনো ভদ্র সম্ভ্রান্ত নারী জীবনসঙ্গী ছাড়া সুখীভাবে জীবন যাপন করতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেককে অপরের এমন মুখাপেক্ষী ও প্রত্যাশী বানিয়ে দিয়েছেন, যদ্দরুন তাকে ছাড়া জীবন চলতে পারে না।

আল্লাহর নাম পরকে করে আপন

তারপর আরও বলা হয়েছে, যার নামে তোমরা পরস্পর যাঞ্চা কর, তিনি আল্লাহ। ইসলামী সমাজ অস্তিত্ব লাভ করে আল্লাহতে বিশ্বাস, আল্লাহর বড়ত্ব ও সম্মান, আল্লাহর কুদরত ও শক্তি এবং আল্লাহর একত্বের (তথা একত্ববাদের) বিশ্বাসের ওপর। একজন মুসলমান পুরুষের মুসলমান নারীর সাথে সহযাত্রা, সহাবস্থান এবং বন্ধুত্ব ও প্রেম ভালবাসা তখনই বৈধ হয়, যখন তারা মাঝখানে আল্লাহর নাম নিয়ে আসে। আল্লাহর নামই পরকে আপন বানিয়ে দেয়, দূরকে নিকটে করে দেয়। অপরিচিতকে করে পরিচিত। যাদের শরীরের ছায়া পড়াও পছন্দ ছিল না, তাদেরকে এমন আপন ও প্রিয় বানিয়ে দেওয়া হয় যে, তাদের ছাড়া জীবনের সঠিক কল্পনাও হতে পারে না। তারা একে অপরের জীবনসঙ্গী ও দায়িত্বশীল হয়ে যায়। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক এমন, প্রেম-ভালবাসা ও আস্থা বিশ্বাসের সম্পর্ক, কখনও কখনও তা মাতা-পিতার সম্পর্ক থেকেও বেড়ে যায়। যে অলৌকিকতা, যে বিশ্বাস, যে প্রেম, যে সততা, যে সহজাত প্রবৃত্তি ও স্বভাবধর্মীতা তাদের মধ্যে সৃষ্টি হয়, অন্য কোনো আত্মীয়ের মাঝে তা কল্পনাও করা যায় না। এসব আল্লাহর নামের যাদু। আল্লাহর নামটি যখন তাদের মাঝে আসে, তখন নতুন এক পৃথিবী অস্তিত্ব লাভ করে। গতকাল পর্যন্ত যে পর ছিল, আজ সে নিজের চেয়েও আপন হয়ে গেল। একজন মুসলমান পুরুষ, একজন মুসলমান নারী একে অপরের সাথে এমনিতেই কখনো দ্বিধাহীন-বাঁধাহীন হতে পারে না। অনেক সময় একে অন্যের সাথে সফরও করতে পারে না। একে অন্যের জন্য না-মাহরাম, পরনারী, পরপুরুষ। কিন্তু যখন মধ্যখানে আল্লাহর নাম এসে যায়, তখন এক পবিত্র বন্ধন, মধুর সম্পর্ক তৈরি হয়ে যায়। তারপর আল্লাহ বলেন– যে নাম মাঝখানে এনে হারামকে হালাল কর, অবৈধকে বানাও বৈধ এবং নিজের জীবনে সৃষ্টি কর এক মহা বিপ্লব, সেই পবিত্র ও মহান নামের লাজও রাখা উচিত। স্বামী-স্ত্রীর গভীর ও সুদৃঢ় সম্পর্কের কথা কুরআনে কারীমে এক ভিন্ন আঙ্গিকে বর্ণনা করেছে। বলেছে, هن لباس لكم وانتم لباس لهن –তারা (স্ত্রীগণ) তোমাদের পোশাক; আর তোমরা (স্বামীগণ) তাদের পোশাক। তোমরা একে অপরের পোশাক হয়ে যাও। এটাও কুরআনে কারীমের একটি অলৌকিকতা! আল্লাহ পাক এখানে 'পোশাক' শব্দ ব্যবহার করেছেন। যা লজ্জা ঢাকা ও জীবনের সৌন্দর্যে অতীব প্রয়োজনীয়। 'পোশাক' শব্দে সে সব বিষয় পুরোই এসে গেছে, যেগুলো স্বামী-স্ত্রীর

পারস্পরিক সম্পর্ক ও আস্থা-বিশ্বাসের ব্যাপারে অধিকতর বলা যেতে পারে। তোমরা তাদের জন্য পোশাক; তারা তোমাদের জন্য পোশাক। যেভাবে পোশাক ছাড়া মানুষকে পশুর মত দেখায়, একটি বন্য জংলী প্রাণী মনে হয়, তদ্রুপ দাম্পত্য ও বৈবাহিক জীবন ছাড়া মানুষকে অসভ্য দেখা যায়। একে অসভ্য বর্বর মনে করাই উচিত।

দাম্পত্য জীবন একটি এবাদত

ইসলামে দাম্পত্য জীবন ও বৈবাহিক সম্পর্ককে নিছক জীবনের একটি প্রয়োজন হিসেবে দেখা হয় নি বরং একে একটি এবাদতের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। যার দ্বারা মানুষ আল্লাহর নৈকট্য লাভ করে। অর্থাৎ আমাদের ধর্মে দাম্পত্য সম্পর্ক ও বিবাহ বন্ধনের ধারণা শুধু এতটুকুই নয় যে, জীবনের প্রয়োজনের নিমিত্তে এটা করতেই হত। নতুবা জীবনের স্বাদ উপভোগ করা যেত না; জীবন উপভোগ্য হত না বরং একে দ্বীনী ও ধর্মীয় রূপ দেওয়া হয়েছে। একে এবাদত সাব্যস্ত করা হয়েছে। আর তাই রাসূলে কারীম সা. আপন জীবনে এর সবচেয়ে বড় আদর্শ-উপমা পেশ করছেন। অধিকন্তু তিনি বলেছে– তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ভাল ওই ব্যক্তি, যে তার ঘরের লোকদের (স্ত্রীগণের) জন্য সবচেয়ে ভাল হবে আর আমি আমার ঘরের মানুষদের জন্য তোমাদের সবার চেয়ে ভাল।"

সুতরাং আপনারা যদি রাসূলে কারীম সা. এর জীবন-চরিত অধ্যয়ন করেন, তবে দেখতে পাবেন, নবীজীর মধ্যে নারীজাতির যে সম্মানবোধ, তাদের আবেগ-উচ্ছাস, আগ্রহ-উদ্যম ও সূক্ষ্ম উপলব্ধি এবং তাদের লক্ষ্য ছিল– নারী সমাজের বড় বড় উকীল এবং নারীর অধিকার ও সম্মানের বড় বড় দাবিদারের মধ্যেও তার দেখা পাওয়া যায় না। অনুরূপভাবে তা বড় বড় পুণ্যবান লোকজন, সাধু-সন্যাসী, সাধক-ঠাকুর, এমনকি অন্যান্য নবী-রাসূলগণেরও জীবনে পাওয়া যাওয়া কঠিন। পুণ্যবতী স্ত্রীগণের মনোরঞ্জন, তাদের বৈধ আনন্দ-বিনোদনে অংশগ্রহণ, তাদের আবেগ-উচ্ছাস, উদ্যম-আগ্রহের খেয়াল রাখা এবং তাদের মধ্যে যে মিথ্যাচার ও ন্যায়ানুগতা প্রদর্শন করতেন, তার কোন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না।

কেবল তাদের সঙ্গেই নয়; শিশুদের সাথেও নবীজী সা. এরূপ আচরণ করতেন। নামাযের মতো অতিপ্রিয় ইবাদতও তিনি কেবল একারণে সংক্ষিপ্ত করে দিতেন, যাতে কোনো মায়ের কষ্ট না-হয়। যদি কোনো শিশু কাঁদত, তখনও তিনি নামায সংক্ষেপ করতেন। এটা চরম আত্মত্যাগ,

রাসূলে কারীম সা. এর জন্য তো নামায অপেক্ষা বড় কোনও জিনিসই ছিল না। এর চেয়ে বড় কোনও কুরবানী হতে পারে না। তিনি বলতেন– অনেক সময় আমার মনে চায়, দীর্ঘ নামায পড়ি। কিন্তু যখন কোনও শিশুর কান্নার শব্দ শুনতে পাই, তখন আমার চিন্তা হয়, কখন যেন তার মায়ের মনে কষ্ট লেগে যায়! তার মায়ের মন ঘাবড়িয়ে যায়! একারণে আমি নামায সংক্ষেপ করে দেই।

পাশ্চাত্য সভ্যতার পতন শুরু

আমাদের সামনে এই আদর্শ আছে। আল্লাহ পাক বলেন, যে নামটি তোমরা মধ্যখানে নিয়ে এলে, তার লাজও রাখা চাই। এমন যেন না হয় যে, এর দ্বারা শুধু স্বার্থ আর স্বার্থই হাসিল করলে। এই নির্দেশ নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য। আপনারা এখানে আমেরিকান সোসাইটিতে আছেন, এখানে আমাদের শুধু ইসলামী আকীদা-বিশ্বাসগুলো উপস্থাপন করলে হবে না বরং ইসলামের গোষ্ঠীগত সমাজব্যবস্থাও পেশ করতে হবে। পাশ্চাত্য সভ্যতার পতন শুরু হয়ে গেছে। দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে ধ্বংসের পথে। আপনারাও উপলব্দি করছেন সে অধঃপতন। এটা কোনও অস্পষ্ট বা গোপন বাস্তবতা নয়। এর বড় একটি কারণ হল, এখানকার বংশীয় ব্যবস্থায় এক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়ে গেছে। পরিবার ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়েছে। তাতে চলছে চরম বিক্ষিপ্ততা। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে আস্থা-বিশ্বাস এবং প্রেম-ভালবাসা থাকা উচিত, দিনদিন তাতে ঘাটতি আসছে। আজকের গবেষক-চিন্তাবিদগণ উদ্বিগ্ন। বিভিন্ন বই-পুস্তক লেখা হচ্ছে পাশ্চাত্যের সমাজব্যবস্থাকে ভেঙ্গে পড়া থেকে, বিশৃঙ্খল হয়ে যাওয়া থেকে কিভাবে রক্ষা করা যায়? দু'পক্ষের মধ্যে প্রেম-ভালবাসা থাকা উচিত। জীবনের প্রকৃত স্বাদ এখানেই। তখন অভাব-অনটন, ক্ষুৎপিপাসা হলেও স্বানন্দে তা সহ্য করে নেওয়া হয়। এখনও আমাদের প্রাচ্যদেশগুলোতে এমন অনেক পরিবার রয়েছে, যেখানে অতিকষ্টে খাবার যোগাড় হয়। কিন্তু তারা জান্নাতের স্বাদ উপভোগ করে। কারণ, পরস্পর ভালবাসা আছে। একে অন্যের মুখ দেখে নিজের ক্ষুৎপিপাসা এবং নিজের দুঃখ-যাতনা ভুলে যায়। অথচ এখানে সবকিছু আছে। সকল উপকরণ, ভোগ-সামগ্রী পদতলে স্তূপ হয়ে আছে। বিশ্বজগতের অনেক শক্তিকেই তারা পদানত করে নিয়েছে। কিন্তু তারা নিজের হৃদয়রাজ্যকে, মনের পৃথিবীকে এবং নিজের ঘরকে জান্নাতে রূপান্তর করতে পারে না। যেমনটি আল্লামা ইকবাল বলেছেন–

ڈھونڈھنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا
اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا

"নক্ষত্রের কক্ষপথ সন্ধানকারী, নিজের চিন্তার গবেষণার পৃথিবীতে ভ্রমণ করতে পারল না।"

সুখান্বেষণ

যে লোক সূর্যের কিরণগুলো নিজের মুষ্ঠিবদ্ধ করে নিয়েছে, জীবনের অন্ধকার রাতকে প্রভাত করতে পারে নি, আর নক্ষত্রপুঞ্জের কক্ষপথ অনুসন্ধানকারী– যদি ইকবাল হতেন তবে বলতেন– চাঁদে গমনকারী পশ্চিমা লোক নিজের চিন্তাধারার পৃথিবীতে ভ্রমণ করতে পারে নি। যে পৃথিবীকে জান্নাত বানানোর চেষ্টা করেছে, তার ঘর জাহান্নাম হয়েছে। বহু আমেরিকান ও ইউরোপীয় পরিবার এমন আছে, যাদের ঘরে সুখ-শান্তির কোনও উপাদান নেই। কাজেই আজ আমরা দেখছি, তারা বাইরের ভ্রমণ-বিলাস আর কুকুরের মধ্যে সুখ-শান্তি খুঁজে ফিরছে। কেননা শান্তি তাদের ঘরে সহজসাধ্য নয়। ঘরে এসে তাদের অনুভূত হয় না যে, তারা পার্থিব বা নৈসর্গিক জান্নাতে পৌঁছে গেছে বরং তারা ঘরের জীবন থেকে, পরিবার জীবন থেকে পলায়ন করে ঊর্ধ্বশ্বাসে।

প্রয়োজন ও সম্মান

আমি মনে করি, যারা এখানে দশ বছর, বিশ বছর যাবৎ জীবন কাটাচ্ছেন, তারা আমার চেয়ে বেশিই জানেন এই যন্ত্রণাদগ্ধ ও দুর্বল দিক সম্পর্কে। আমার খুব বেশি বলার প্রয়োজন নেই। মোটকথা, পূর্বোক্ত আয়াতে কারীমায় আল্লাহ্ তা'আলা ইসলামী সমাজের একটি মৌলিক চিত্র উপস্থাপন করেছেন। এ সমাজ একে অন্যের প্রয়োজন পূরণ ও সম্মান প্রদর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রয়োজন তো সবারই হয়। কিন্তু প্রয়োজন উপলব্ধি করা আর যার দ্বারা সে প্রয়োজন পূরণ হতে পারে, তার মূল্যায়ন করা দুটি আলাদা বিষয়। দুটি ভিন্ন ভিন্ন মানসিক অবস্থা। এই মানসিক অবস্থা ইসলাম সৃষ্টি করতে চায়, যাতে আমাদের প্রত্যেকেই নিজেকে অন্যের মুখাপেক্ষী মনে করে। নিজের প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করে এবং অপরকে সম্মান প্রদর্শন করে। যদি এই চিন্তাধারা পুরোপুরি স্বীকার করে নেওয়া হয় এবং হৃদয় মানসপটে গেঁথে যায়, তা হলে এরপর আর কোনও খাঁদ বা ছিদ্র বাকি থাকবে না।

আমি আল্লাহর নিকট দু'আ করি, আল্লাহ যেন আপনাদের সকলকে সঠিক পথ প্রদর্শন করেন। আপনারা এদেশে ইসলামী জীবন এবং ইসলামী সমাজের এমন আদর্শ নমুনা উপস্থাপন করবেন, যা এখানকার জীবনবিমুখ ও বিতৃষ্ণ হয়ে পড়া সমাজের জন্য চিত্তাকর্ষক ও মনোহারী প্রমাণ হয়। বিচক্ষণতার সাথে যেন তারা ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা এবং এর পারস্পরিক সম্পর্কগুলোও অধ্যায়ন করে আর নিজের জন্য একেই অগ্রাধিকার দেয়; তাদের আগ্রহ জন্মে, আহ! আমাদেরও যদি এ নেয়ামত লাভ হত!

যদি আপনারা এমনটি করেন, তা হলে আপনারা না শুধু এদেশের বিরাট বড় খেদমত আঞ্জাম দিলেন বরং ইসলামের অনেক বড় খেদমত আঞ্জাম দিলেন। আর এটা হবে ইসলামের এক মহান দাওয়াত ও তাবলীগ।

জীবনের স্বার্থকতা ও প্রকৃত আনন্দ

পবিত্র জীবন কী?

হামদ ও সানার পর হযরত মাওলানা কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত তিলাওয়াত করেন

من عمل صالحا من ذكر او انثى

অর্থাৎ যে ব্যক্তি সৎকর্ম করবে পুরুষ হোক বা নারী, যদি সে মুমিন হয়, তা হলে আমি তাকে উত্তম জীবন দান করব। আমি তাকে পবিত্র জীবন, সুখের জীবন দান করব। আর পরকালে তাকে দান করব উত্তমতর প্রতিদান। এটা আল্লাহ পাকের এক বিরাট ঘোষণা। অত্যন্ত সুখকর প্রতিশ্রুতি। বিরাট জামানত। পরিপক্ক নিশ্চয়তা। এতে পুরুষ-নারীর বিশেষত্ব নেই। কারণ, প্রতিটি মানুষই উত্তম ও সুখকর জীবন প্রত্যাশা করে। জীবন সবচেয়ে প্রিয় জিনিস; জীবনের প্রতিটি জিনিসেই রয়েছে স্বাদ। পানাহারের এত স্বাদ জীবনের বদৌলতে; স্বাস্থ্য, সুস্থতায় যত মজা, জীবনের বদৌলতে। সন্তান-সন্ততির স্বাদ থাকে তো জীবনের বদৌলতে। এসব জীবনের বিস্ময়, জীবনের কমনীয়তা। বলুন না, যদি আমরাই না-থাকি, আমাদের বিপদ-বিপত্তির কারণে; তবে এসবে আমাদের কী উপকার?

জীবনের অস্থিরতা

যদি দুনিয়ায় অনবরত নেয়ামত বৃষ্টি হতে থাকে, স্বাদ বর্ষিত হতে থাকে, আকাশ থেকে নানা বরকত ও কল্যাণ অবতীর্ণ হতে থাকে, মাটি উগলে দিতে থাকে সোনা-রূপা, হিরা-জহরত কিংবা মাটি ফেটে স্বর্ণের খনি উপচে উঠতে থাকে, ঘর ভরা সন্তানাদি থাকে; প্রতিমুহূর্ত ঘরে ঘরে, পাড়ায় পাড়ায়, মহল্লায়, শহরে উৎসব হতে থাকে আর আমাদের চোখ বন্ধ হয়ে গেল– তা হলে ঈদ কি বরযাত্রী, দুঃখ-যাতনা কি আনন্দ-সুখ, আমাদের ঘরে কি মহল্লায় রকমারি খাবারের পসরা সাজানো থাকুক, দস্তারখান বিছানো থাকুক, তাতে আমাদের কী লাভ? আমরা কী পেলাম? সকল সুখ ও সকল আনন্দ তো জীবনের নিঃশ্বাস চালু অবস্থায়। যেখানে চোখ বন্ধ

হয়েছে, সকল জিনিস অকেজো, অনর্থক। জীবন সকল স্বাদ ও আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু। প্রত্যেক জিনিসে মিষ্টতা ও মধুরতা পাই জীবনের বদৌলতে। কিন্তু আমরা অপূর্ণবুদ্ধি, অবুঝ, অবোধ, অনভিজ্ঞ, অপরিণামদর্শি। আমরা জানি-ই না, উত্তম জীবন কী? আমাদের দৃষ্টান্ত তো ওই শিশুর মত– যাকে মিষ্টি খেতে পাওয়া যায়, যাকে যাচ্ছে তাই করতে দেওয়া হয়, পড়তে দেওয়া হয় না। যদি সে ঘরের ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়তে চায়, তবে কেউ বাঁধা দেয় না। কোনো জ্ঞানী সুবোধ পিতাই কি তার সন্তানকে এমনটি করতে দিবেন? কখনও নয়। আমাদের জীবনচিত্র তো এই যে, মানুষ শিশু থেকে যুবক হবে, তখন আরও বাড়তি কাপড় পাবে, খেলাধূলা করতে পারবে। ধনাঢ্য, নেতৃস্থানীয় পরিবারে বিরাট ধুমধামের সাথে তার একটা পুতুলবিয়ে হবে। গোটা মহল্লাবাসীকে আমন্ত্রণ করা হবে।

বয়স ও জ্ঞান-বুদ্ধির তফাৎ

এতো শিশুদের খেলা, এতো ছেলেখেলা, ধ্বংসযজ্ঞ। শিশুদেরকে আপনারা বুঝাবেন। কিন্তু তাদের বুঝে আসবে না। যেভাবে বয়সের পার্থক্য হয়, তদ্রুপ জ্ঞান-বুদ্ধিরও পার্থক্য হয়; ঈমানী জ্ঞান-বুদ্ধি ভিন্ন জিনিসই বটে। একজনের জীবনকে অন্যজনের কাছে নির্বুদ্ধিতা মনে হয়। একজনের বিকৃত জীবনকে অন্যের কাছে মনে হয় চমৎকার সুশৃঙ্খল। অভিজ্ঞজনের কাছে জিজ্ঞাসা করুন, এটা তাদের নিকট স্বপ্ন ও কল্পনা, একটি শিশুখেলা। যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা অন্তর্দৃষ্টি দান করেছেন, প্রকৃত জীবনের বসন্ত যাদের দৃষ্টিগোচর হয়েছে, তাদের কাছে এসব এক শিশুখেলাই মনে হয়। পবিত্র জীবন! যদি কেউ বলে, এটা পরকালীন জীবনের সাথে সম্পৃক্ত, তবে বলব, তা তো চিরস্থায়ী জীবন। কিন্তু একথা কোথায় আছে, দুনিয়াতে হোঁচট খাওয়ানো হবে। দুঃখ-কষ্ট দেওয়া হবে! আমার মতে উদ্দেশ্য হল, দুনিয়া ও পরকালের জীবন সুশৃঙ্খল সুসজ্জিত করে দিবেন। পরকালে তো অবশ্যই তারা সুখ-শান্তি পাবে। দুনিয়াতেও উত্তম জীবন দিবেন আর পরকালে দান করবেন পবিত্র জীবন। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন– "যেসব লোক গুনাহ করছে, তাদেরকে সে পাপের স্বাদ (শাস্তি) এখানেই (দুনিয়াতে) আস্বাদন করাব।"

মন আন্দোলিতকারী ঘোষণা

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন–

فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم

যারা তাদের সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহকে ভুলে গেছে, পরকাল বিস্মৃত হয়ে গেছে, তাদের জন্য এটা কঠিন সতর্কবাণী, মারাত্মক ঘোষণা। এ ঘোষণার দ্বারা শরীরের পশম দাঁড়িয়ে যাওয়া উচিত। আল্লাহ তা'আলা বলেন, এই দুনিয়ার জীবনেই আমি তাদেরকে স্বাদ আস্বাদন করিয়ে ছাড়ব। তাদেরকে পিষে পিষে মারব। এমন বেত্রাঘাত করব যে, সকল নেশাই কেটে যাবে। সেসব সন্তান দ্বারাই, যাদেরকে বিরাট মনোবাসনায় লাভ হয়েছে। বুকের রক্ত পান করিয়ে করিয়ে, হৃদপিণ্ড খাইয়ে খাইয়ে লালন-পালন করা হয়েছে, যেসব সন্তানের জন্য অপকর্ম করেছে, অবাধ্যতা করেছে, আল্লাহকে ভুলে গেছে। সুতরাং এসব সন্তান তোমাদের গলায় ফাঁস হয়ে যাবে।

মা কী আর কি হয়ে গেল?

মায়েদেরকে সন্তান প্রতিপালনে যেসব কষ্ট-ত্যাগ স্বীকার করতে হয়, তার কিয়দাংশও যদি কেউ ভোগ করেন, তবে আমি তার অভিভাবকত্বের কসম দিচ্ছি! শিশুর রোগ-ব্যাধিতে মায়ের মনে যে চোট লাগে, মায়েরা যত কাঁদে; ব্যাকুল, উদ্বেলিত ও উৎকণ্ঠিত হয়– তা নারীদের চেয়ে বেশি কে জানে? এই আদরে-সোহাগে লালিত-পালিত সন্তান যখন বড় হল, তখন মাতাপিতা উত্তম পছন্দ করলেন বিবাহ-শাদীর, অর্থ-সম্পদ, গয়না-গাটি খরচ করলেন। আত্মত্যাগের উচ্চ মূল্য দিলেন। এরপর ছেলের মন মায়ের প্রতি বিষিয়ে উঠল। স্ত্রীর সকল আত্মীয়-স্বজনের দেখা-সাক্ষাৎ ও সম্পর্ক ঠিক। কিন্তু সেই মা, যে তাকে অত্যন্ত আদর-সোহাগে, অতি সযতনে লালন-পালন করেছিল, আজ সে ডাইনী, ঘাতক, শত্রু, অপদার্থ হয়ে গেল। এই লাঞ্ছনা কত মর্মন্তুদ, বক্ষ-প্রাণে ছুরি চলছে আর তা চালাচ্ছে সেই আদুরে সন্তান! বিয়ের পর মনে হয়, জান্নাতের ঈর্ষা ঘর যেন জাহান্নামের এক খুপড়ি ও নমুনা হয়ে গেছে।

মা ও স্ত্রীর পার্থক্য

কোনও কোনও 'বউপাগল' তো এতই উন্মাদ হয়েছে যে, তারা বউয়ের মনোরঞ্জনে এলাকাই ছেড়ে গেছে। শুধু নিজ এলাকা বা শহরই নয় স্বদেশ পর্যন্ত ছেড়ে গেছে। এসব পৃথিবীতেই হচ্ছে এবং ঘরে ঘরে হচ্ছে। সন্তান আর দুঃখ আজ এমন নিবিড় বিষয় হয়ে গেছে, যেন শীতে উষ্ণতা, ঠাণ্ডায় গরম, আগুনে পানি, আর পানিতে আগুন, অন্ধকারে আলো। মা তার ছেলেকে কিভাবে ভুলতে পারে; আবার না-পারে সম্পর্ক রাখতে। যদি সে ঘরে প্রবেশ করে, তবে তর্কবিতর্ক শুরু হয়ে যায়। মায়ের কাজ নীরবে সব

শুনে যাওয়া, নিজ মুখে তালা ঝুলানো। তার কথা বলার কোনও অধিকার নেই, সব বদহজমও হজম করতে হবে তাকে। আর বউকে ধরে নিয়েছে নবী-রাসূলের মত নিষ্পাপ। তার সম্পর্কে কোনও কথাই শোনা হয় না। এই সেই সন্তান, যার যত্ন-পরিচর্যায় মা তার রাতের পর রাত বিনিদ্র কাটিয়ে দেন। এই সন্তানের যদি সামান্য কষ্ট হত, মা ব্যাকুল হয়ে পড়তেন। কোথায় ছিল তার আরাম-আয়েশ আর কোথায় শান্তি! আপাদমস্তক উৎকণ্ঠা-যন্ত্রণায় ভরে যেত। এই তো সন্তানের দ্বারা কঠিনতর শাস্তি। এই তো কত নিদারুণ ভোগান্তি!

সম্পদ এক আযাব

সম্পদ হাতে এল তো আইনী বিপদ আসল। নানা প্রকার দুর্ভোগ-যাতনা সম্পৃক্ত হল। আর কিছু না- হোক, তবু নয়-ছয়ের চক্করে পড়ে গেল। বাড়ি-গাড়ি ও বিলাসিতাই রোগ হয়ে দাঁড়াল। আমি বলি, পুরনো জ্বর আক্রমণ করল। সন্তান ও সম্পদ তো সুখের জন্য; দুঃখের জন্য নয়। ধন-সম্পদের কোনো অভাব নেই। কিন্তু নানা রোগের শিকার হয়ে গেল। ডাক্তার-কবিরাজের ফী-তে পয়সা যাচ্ছে; জলবায়ূ পরিবর্তনে পয়সা যাচ্ছে। এসব শাস্তি কে নির্বাচন করেছিল, যদ্দরুন ধন-সম্পদ গ্রাস হচ্ছে, ধ্বংসাত্মক রোগ-ব্যাধির আক্রমণ হচ্ছে। ধনীদের রোগ-ব্যাধিও ধনী হয়। রোগের কারণে না দিনে আরাম আছে আর না রাতে। প্রকৃত আরাম এবং সুখ-শান্তি তাদের মোটেও নেই। এত ধন সম্পদও এমনি পড়ে আছে; সুখের বাংলো, বিলাসভবনও ঠাই দাঁড়িয়ে আছে; চব্বিশ ঘণ্টাই তার প্রাণ হাতের তালুতে থাকে! না শিক্ষায় কিছু হয়; না ধন-সম্পদে। সুখের সম্পর্ক মূলত অন্য কোনও জিনিসের মধ্যে। প্রকৃত আনন্দ-শান্তি ভিন্ন কোনও জিনিসের সাথে। আত্মিক প্রশান্তি অন্য কোনও জিনিসের মধ্যে নিহত।

প্রকৃত সুখ-শান্তি

দুনিয়ার জীবনে প্রকৃত সুখ-শান্তি বাস্তবে তারাই লাভ করে থাকে, যাদের ঘরে আকীদা-বিশ্বাসে মিল থাকে। মাপকাঠিতে মিল থাকে, সামাজিকতা ও আচার-ব্যবহারে মিল থাকে, সন্তানরা সঙ্গে থাকলে তো কু-চিন্তা মনে থাকবে না। মৃত্যুকে মৃত্যু মনে হবে না; এর আগ্রহ আরও বেড়ে যাবে। এতে ভয় হবে না। জান্নাতের সবচেয়ে বড় পরিচয় হল, সেখানে ভয় ও চিন্তা থাকবে না। যেসব ঘরে বিশ্বাসে একতা থাকে, জীবনের মানদণ্ডে ও জীবন-যাত্রায় মিল থাকে, এ দুনিয়াতেই তাদের জান্নাতের স্বাদ অনুভূত হয়। এরপর যদি মোটা

ভাত-কাপড় জুটে, ডাল-মরিচও খেতে পায়– তাতে যে স্বাদ অনুভূত হয়, দুনিয়ার বড় থেকে বড় নেয়ামতরাজি এবং ভোগ-বিলাসেও নেই।

একটি উপমা

এক বাদশা ঘোষণা করলেন, আমি এক একদিন করে সকল মানুষের ঘরে খাবার খাব। সকলেই যখন যার পালা এসেছে, বাদশার খুব যত্ন-আত্মি করেছে। একদিন জনৈক হেকিম সাহেবের পালা আসল। তখন তিনি বিবিকে বললেন, সেই যবের রুটি আর ডাল ভূনা তৈরী করে রাখবে। বিবি ভাবল, হয়তো আমার স্বামীর মাথা খারাপ হয়ে গেছে। এরপর হেকিম সাহেব বাদশার খেদমতে হাজির হয়ে বললেন, জনাব! বনে হারিণ প্রচুর হয়ে গেছে, আসুন! সেগুলো শিকার করুন। বাদশা শিকারের জন্য বেরিয়ে পড়লেন। সারাদিন ঘুরে ফিরে ক্লান্ত-অবসন্ন হয়ে গেলেন। কিন্তু একটি হরিণও ধরা পড়ল না। সন্ধ্যায় হেকিম সাহেব বাদশাকে বললেন, চলুন! খাবার খাবেন। বাদশা ক্ষুধায় কাতর ছিলেন। এরপর ডাল আর যবের রুটি সামনে আনা হল। বাদশা তা-ই খুব তৃপ্তিসহ খেলেন।

এটা জান্নাত নয় তো কী?

যদি ক্ষুধা আর প্রকৃত আনন্দ থাকে, তবে ডাল-রুটিও বিরাট বড় নেয়ামত মনে হয়। যেসব ঘরে আল্লাহ আল্লাহ তা'আলা শান্তি দান করেছেন, যে ঘর পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদ, টানাপোড়েন থেকে মুক্ত, সেখানের অবস্থা তো এমন যে, চোখে-মুখে সুখ-আনন্দের ঝলক ঠিকরে পড়ে। প্রত্যেককেই অন্যের জন্য নিবেদিতপ্রাণ দেখা যায়। একে অপরের জন্য ত্যাগ স্বীকারে আকুল থাকে। মা চায়, আগে শিশুগুলো খেয়ে নিক আর সন্তানেরা চায় আমাদের মা-ই আগে খেয়ে নিক। কারও মনে কোনও হিংসা-বিদ্বেষ নেই। না আছে কারও প্রতি আপত্তি-অভিযোগ। প্রত্যেককেই হাসি-খুশি ও প্রফুল্ল দেখা যায়। এটা আল্লাহ তা'আলার অনেক বড় নেয়ামত। যেসব ঘরে এই জিনিস রয়েছে, এটা জান্নাতের স্বাদ নয় তো কি? জান্নাতের প্রাণ তো সার্বক্ষণিক সুখ-আনন্দ। জান্নাত তো মনের সুখ-শান্তি এবং দুঃখ-দুশ্চিন্তা ও ভয় থেকে নিষ্কৃতির নাম।

আধুনিকা নারী

আমাদের কিছু বন্ধু বলেছেন, আজকাল শিক্ষিতা মেয়েদের মধ্যে বিয়ে-শাদী না-করার প্রবণতা অনেক বেশি। স্বামী বেচারা সারাদিনের ক্লান্ত-শ্রান্ত

হয়ে ঘরে ফিরল তো রাজনীতি নিয়ে তর্ক-বিতর্ক শুরু হয়ে গেল। আজকে অমুক দৈনিক পত্রিকা/ খবরের কাগজে অমুক খবর হয়তো পড়েছেন। সোস্যালিজমকে (সমাজতন্ত্র) আমি এজন্যই ভয় পাই। স্বামী বেচারা কোনও কথা বলেছে তো বিবি বলবে– আপনি ঠিক বলেন নি। আমি তো অমুক বইয়ে এরূপ পড়েছি।

আরাম ও বিলাস সামগ্রী

বড়লোকের ঘরে সোফা আছে। আলীশান প্রাসাদ আছে। বাথরূম আছে। কিন্তু মনের শান্তি নেই। আত্মার সুখ নেই। আনন্দ-স্থিরতাও নেই। স্বামী স্ত্রীর প্রতি কু-ধারণা পোষণ করে। স্ত্রীকে সন্দেহের চোখে দেখে। স্ত্রীও স্বামীর প্রতি সন্দিগ্ধ, কু-ধারণার শিকার। কোথায় মোটর যান, কোথায় গয়নাগাটি, স্বর্ণলঙ্কার! মানুষ বলবে, এসব নিয়ে যাও। কিন্তু মনের শান্তি এনে দাও। জনৈক বুযুর্গ বলতেন– জান্নাত আমি তো আমার বক্ষে নিয়ে ঘুরাফেরা করি। কেউ তা আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না। ছোট্ট ঘরে, অভাবীদের ঘরে সামান্য ডাল-রুটি খেয়ে খেয়ে সপ্তাহও কেটে যায়; মুখের রুচি ও স্বাদ পরিবর্তনের জন্য কোন জিনিস তাদের জুটে না। যদি মনের সুখ থাকে, যদি মনে শান্তি থাকে, তবে ডাল-ভাতই তাদের কাছে বিরাট বড় নেয়ামত মনে হয়। কোনও মহিলার বাচ্চা অসুস্থ আর তাকে কোথাও নিমন্ত্রণ করা হল। যদি সে মহিলা শেষ পর্যন্ত অনুষ্ঠানে গমনও করে, তথাপি তার কাছে সব কিছুই অস্বস্তিকর লাগবে। মনে হবে, সব কিছুই যেন তার বিদ্রুপ করছে। স্মরণ রাখবেন, মনে স্বস্তি থাকলে শরীর স্বস্তিতে থাকে। মনে সুখ থাকলে শরীরেও সুখের ছোঁয়া লাগে। কিন্তু মনে অশান্তি থাকলে মাটির এ দেহ কখনও স্বস্তি ও শান্তি পেতে পারে না। গদিকে সোফা মোটেও নরম-কোমল, আরামপ্রদ সোফা মনে হবে না; হবে কাঁটার বিছানা। আমাদেরকে এমন পবিত্র জীবনের জন্য নিবেদিতপ্রাণ হওয়া উচিত। এই পবিত্র জীবন, পুণ্যময় সুখী জীবন যদি দীনতায় পাওয়া যায় তবু সাধুবাদ; অল্প শিক্ষায় পাওয়া গেল, তবু কল্যাণকর, ছিঁড়ে-ফাঁটা ময়লা কাপড়ে পাওয়া গেল, তবু মুবারক; বিপদ-আপদের সঙ্গে পাওয়া গেল, তবু সাধুবাদ, সপ্তরাজ্যের সাথে পাওয়া গেল, তবু ধন্যবাদ। ইতিহাস বিখ্যাত হাজ্জাজের বদনাম অনেক। একদিন সে বসে বসে খানা খাচ্ছিল। সহসা এক গ্রাম্য ব্যক্তি তার পাশ দিয়ে যেতে লাগল। হাজ্জাজ তাকে বলল, এসো! খানা খেয়ে যাও! যখন খাবার গ্রহণ শেষ হল, তখন সে গ্রাম্য

লোকটিকে জিজ্ঞাসা করল– কেমন হল? গ্রাম্য লোকটি বলল– এতে না বাবুর্চির দক্ষতার প্রভাব আছে আর না আছে মসলার গুণ-কৃতিত্ব বরং আপনি নিশ্চিত থাকুন, আপনার পেছনে কোন শত্রু নেই। আপনি কোনও ধরনের ভয়-ভীতি ও আশঙ্কা অনুভব করছেন না। যদি আপনার পেছনে শত্রুর তাড়া থাকত, তবে এ খাবারে কি ছাই স্বাদ থাকত!

সত্যান্বেষণ

পাকস্থলিতে যদি ক্ষুধার চাপ থাকে, তবে খাবার সুস্বাদু; মনে যদি শান্তি থাকে, তবে জীবন সুখময়-তৃপ্তিকর। যখন আমাদের পারস্পরিক সম্পর্ক ঠিক হয়ে যাবে, ঘরে আল্লাহর রহমত অবতীর্ণ হবে। তখন পানিতেও সেই স্বাদ পাবে, যা শরবতেও নেই। তরকারীতে যে স্বাদ হবে, মান্না-সালওয়াতেই তা নেই। যেখানে শরী'আতের হুকুম-আহকামের স্বযত্ন পরিপালন থাকবে, শরী'আত যেখানে বলেছে, থামো! ব্যাস, থেমে গেলে। শরী'আত বলেছে, কারও উপর জুলুম করবে না, সুদী লেনদেন করবে না, খেয়ানত করবে না, মিথ্যা বলবে না, ছোটদের সাথে সুন্দর, সদ্ব্যবহার করবে, পিতামাতার সম্মান করবে। যদি শরী'আতের আহকামের স্বযত্ন পরিপালন হয়, তবে সবকিছুই বরকতের কারণ হবে; পরম সফলতাই আর সফতা লাভ হবে। প্রয়োজন কেবল আল্লাহর সামনে রিক্তহস্ত হওয়া, নিজের নিঃস্বতা-অসহায়ত্ব প্রকাশ করা নামাযের মাধ্যমে, এখলাছ-একনিষ্ঠতার মাধ্যমে। আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র ও সুখ-সফল জীবনের তাওফীক এবং সে জ্ঞান-বুদ্ধি আমাদের দান করুন। আমীন।

নারী স্বাধীনতা
শরঈ এবং গায়রে শরঈ পর্দা

মিশরে নারী স্বাধীনতা আন্দোলন ও তার প্রভাব

পশ্চিমা সভ্যতা ও সমাজ ব্যবস্থার সাথে গভীর সম্পর্কের এক উজ্জ্বল উদাহরণ নারী স্বাধীনতার প্রসিদ্ধ মিসরীয় ঠিকাদার কাসেম আমীনের বই "তাহরিরুল মারআহ" (নারী স্বাধীনতা) এবং তারই আরেকটি বই "আল-মারয়াতুল জাদীদাহ" (আধুনিকা নারী)। প্রথমোক্ত বইতে লেখক দাবি করেছেন, পর্দাহীনতার আহ্বানে ইসলামের কোনও বাঁধা বা ধর্মে কোনও বিরোধ পাওয়া যায় না। তিনি লিখেছেন, ইসলামিক শরী'অত নির্দিষ্ট কিছু মূলনীতি ও সাধারণ দণ্ডবিধির নাম। যদি খুটিনাটি বিষয় ও শাখা-প্রশাখা নিয়ে আলোচনা করা এর ব্রত/বৈশিষ্ট্য হত, তবে তাতে বিশ্বজনীন জীবনব্যবস্থা হওয়ার যোগ্যতা থাকত না– যা সর্বকালে সর্বযুগে প্রত্যেক জাতির উপযোগী। শরী'অতের যেসব বিধি-বিধান প্রসিদ্ধ প্রচলিত রীতিনীতি, অভ্যাস ও আচার-অনুষ্ঠানের উপর ভিত্তিশীল, তাতে অবস্থা, পরিস্থিতি ও যুগ-সময়ের চাহিদা অনুযায়ী পরিবর্তন-পরিবর্ধন করা যেতে পারে। শরী'অতের চাহিদা শুধু এতটুকু যে, এই পরিবর্তন-পরিবর্ধন যেন কখনও এরূপ কোনও রূপরেখায় না-হয়, যার ফলে তার সাধারণ নীতিমালা ও ভিত্তিগুলোর কোনোটি প্রভাবিত ও ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায়।

উক্ত বইয়ে লেখক চারটি বিষয়ে কলম ধরেছেন। (১) পর্দা। (২) সাধারণ জীবন যাত্রায় নারীদের অংশগ্রহণ। (৩) বিবাহ সংখ্যা। (৪) তালাক (বিবাহ বিচ্ছেদ)। এই চারটি বিষয়েই তিনি পশ্চিমাদের মতাদর্শ গ্রহণ করেছেন এবং দাবী করেছেন– এটাই ইসলামের নির্দেশ।

পাশ্চাত্য শিক্ষা, পাশ্চাত্য, সভ্যতা এবং এর মর্যাদা মূল্যায়নের প্রতি তথাকথিত ঐ লেখকের গভীর সখ্যতা ও শ্রদ্ধাবোধের প্রভাব তার অপর বই "আধুনিকা নারী" এর মধ্যে আরও সুস্পষ্ট প্রতিভাত হয়। এই বইয়ে লেখক তার আলোচনা ও প্রমাণ উপস্থাপনে আধুনিক পাশ্চাত্য রীতির বাচনভঙ্গি ও

প্রমাণ পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন। যা সেসব বিদিত নীতিমালা ও আকীদা-বিশ্বাসকে প্রত্যাখ্যাত ও পরিত্যাক্ত ঘোষণা করে, অভিজ্ঞতা কিংবা বাস্তবতা আদৌ যার সমর্থন করে না। চাই সেসব আইন-কানুন ও আকীদা-বিশ্বাস দ্বীন-ধর্মের পথে পৌঁছে থাকুক কিংবা অন্য কোনও পথে। এটাই সেই পন্থা, যাকে পাশ্চাত্যবাসী একমুখী শিক্ষা নীতি বা সাইন্টিফিক বলে। এ বইয়ের শেষ দিকে এসে লেখক সরাসরি পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সমাজব্যবস্থা গ্রহণের স্পষ্ট আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। মুসলিম উম্মাহ এবং মিসরবাসীর আপন সভ্যতা ও সামাজিকতা, জীবন-পদ্ধতি এবং অতীত-ঐতিহ্যের উপর যে গৌরব রয়েছে, তাতে ছিদ্রান্বেষণ করতঃ তিনি লিখেন–

"এটাই আমাদের সেই ব্যাধি, যার চিকিৎসা সবার আগে প্রয়োজন। এর প্রতিষেধক কেবলই একটি। সেটি হল, আমরা আমাদের নতুন প্রজন্মকে পশ্চিমা সভ্যতার অবস্থাচিত্র সম্পর্কে অবগত করাব। আর তারা হবে এর মূলনীতি ও খুটিনাটি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল। যখন সেই সময় আসবে (যা খুব বেশি দূরে নয়), তখন প্রকৃত বাস্তবতা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট হয়ে যাবে। তখন আমাদের পাশ্চাত্য সভ্যতার মর্যাদা ও মূল্য উপলব্ধি হবে। আমরা নিশ্চিত হয়ে যাব যে, কোনো উন্নতি ও সংস্কার ততক্ষণ পর্যন্ত সম্ভব নয়, যাবৎ না তা আধুনিক পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানে ভিত্তিমূলের উপর প্রতিষ্ঠিত হবে। তা ছাড়া মানুষের অবস্থাগুলো চাই বৈষয়িক হোক কিংবা চরিত্রিক জ্ঞানের আজ্ঞাবহ হতে হবে। একারণেই আমরা দেখি, বর্তমান সভ্য জাতিগুলো জাতীয়তাবোধ, রাষ্ট্রভাষা ও ধর্মমতে কতটা মতবিরোধে লিপ্ত। সরকার কাঠামো, শাসন ব্যবস্থা, বিচার ব্যবস্থা, পরিবার ব্যবস্থা, পারিবারিক আইন, শিক্ষা পদ্ধতি, ভাষা, লিখন রীতি ও নির্মাণ শৈলী এমনকি সাধারণ রীতিনীতি, অভ্যাস-বৈচিত্র, পোশাক-পরিচ্ছদ, অভিবাদন এবং পানাহার পদ্ধতিতে একে অন্যের সাদৃশ্য রাখে। তাই আমরা পাশ্চাত্যবাসীকে মডেল ও দৃষ্টান্ত হিসেবে উপস্থাপন করি। তাদের অনুকরণের উপর জোর তাগিদ করি। আর এরই ভিত্তিতে আমরা আমাদের দেশবাসীকে আমন্ত্রণ জানাই, যেন তারা পাশ্চাত্য নারীদের অবস্থাবলী পর্যবেক্ষণ করে, অনুধাবন করে।

এ দুটি বই-ই মিসরের আধুনিক সমাজে বিরাট গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। এসবের প্রসার এবং নারী স্বাধীনতা আন্দোলনে আধুনিকতাবাদীরা যে তৎপরতা দেখিয়েছি, তার কুফলে নারীদের মাঝে মুক্তি, অবাধাচার ও

পর্দাহীনতার এক কঠিন তরঙ্গ সৃষ্টি হয়ে গেছে। নারী পুরুষের সহশিক্ষা ও গণসমাবেশের প্রচলন হচ্ছে। শিক্ষা লাভের জন্য মিসরীয় মেয়েরা ও ছাত্রীরা ইউরোপ-আমেরিকা সফর শুরু করেছে। আলেকজান্দ্রেরিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডা. মুহাম্মদ হুসাইন তার সরচিত জীবন্ত জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر এর মধ্যে লিখেন– "এই আমন্ত্রণ ও আন্দোলনের ফলে নারীদের মধ্যে পর্দাহীনতা, নির্লজ্জতা, অবাধাচার, স্বাধীনতা ও বন্ধনহীনতার যে প্রবণতা সৃষ্টি হয়েছে, এতে ইসলামিক মূল্যবোধ ও ভাবধারায় বিশ্বাসী লোকজন ভীত হয়ে পড়েছেন। নারীদের অবস্থায় যে পরিবর্তন ও বিপ্লব আসছিল, প্রাচীন সাহিত্য ও রীতিনীতি, পিতা ও স্বামীর কর্তৃত্ব ও অভিবাবকত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আগ্রহ-উত্তেজনা সৃষ্টি হচ্ছিল, একে তারা চরমভাবে অপছন্দ করেন। তারা বড় বিস্ময় ও অস্থিরতার সাথে বেশভূষার পরিবর্তনগুলো এবং দ্রুততার সঙ্গে ঢিলেঢালা ও মিসরীয় পর্দাপূর্ণ পোশাকের পরিবর্তে পাতলা ও খর্বাকৃতির পাশ্চাত্য পোশাক প্রত্যক্ষ করছিলেন। যা এত দ্রুততার সঙ্গে নারীদের মাঝে গ্রহণযোগ্যতা পাচ্ছিল, ইতোপূর্বে যার কোনও ধারণাই তাদের ছিল না।

যেসব মিসরীয় নারী এই আন্দোলনে বিশেষ আগ্রহী ও আকৃষ্ট ছিল এবং এ ব্যাপারে ইউরোপ-আমেরিকা সফর করেছে, তাদের বর্ণনা দিয়ে তিনি লিখেন– "নারী স্বাধীনতার এই আন্দেলনের ঝাণ্ডা উত্তোলন করেছেন বিশেষভাবে আলী পাশা শা'রাবীর পত্নী হুদা শা'রাবী। তিনি এমন সাহসিকতা, বুদ্ধিমত্তা ও পরিশ্রমের সাথে কাজ করেছেন, আজ পর্যন্ত কোনও মুসলিম নারী যার সাহস করে নি। তিনি পাশ্চাত্য নারীদের অবস্থা জানার জন্য প্যারিস ও আমেরিকা সফর করেছেন। তিনি পত্রিকা সম্পাদকরদেরকে অকুণ্ঠ সাক্ষাৎকার দিতেন এবং নিজের প্রতিক্রিয়া, মতামত ও চিন্তাধারার খোলাখুলি প্রকাশ করতেন।"

আমেরিকায় মুসলমান নারীদের পোশাক

আমেরিকায় নু'মান যায়েদের পরিবার ভারতীয় পদ্ধতিতে পর্দা মেনে চলতেন না। কিন্তু তাদের পোশাক এমনভাবে শরীর আবৃতকারী ছিল যে (বা এমনভাবে শরীর ঢেকে নিত) যাকে শরঈ পর্দা বলা চলে। মুখ ও হাতের কব্জি পর্যন্ত খোলা থাকত। ইউরোপ-আমেরিকায় পর্দা পালনকারিণী নারীগণ এরূপ পর্দাই মনে চলেন। আর সেখানকার জীবনে এর চেয়ে বেশি মেনে চলাকে কঠিন দুঃসাধ্য মনে করে। সেখানকার জীবনধারা এবং

সভ্যতা ও সামাজিক বাধ্যবাধকতার কারণে তাদের এই অনুভূতিকে সরাসরি ভুলও বলা চলে না। তবে ইসলামিক ধ্যান-ধারণার নিকটবর্তী কোনো ভারতীয় পাকিস্তানী নারীদের মধ্যে শাড়ি পরার প্রচলন সচেতন আরব নারী ও পুরুষদের কাছে মারাত্মক আপত্তিকর। তারা সমালোচনা করে বলেন, এসব নারী তাদের শাড়ির পোশাকে প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বনে অক্ষম থাকে। যা অন্তত নামায শুদ্ধ হওয়ার আবশ্যিক শর্ত। ব্লাউজে সাধারণত শরীর ঢাকে না। আমেরিকায় একাধিক স্থানে এ ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে, যেন পাক-ভারতের নারীদেরকে এই অর্ধনগ্ন (শরীর আবৃত করতে অক্ষম) পোশাক পরিধান থেকে বারণ করা হয়। কোনো কোনো নওমুসলিম আমেরিকান নারীরা তো মুসলিম সভা-সম্মেলনে অংশগ্রহণ থেকে এই বলে পাশ কাটিয়ে গেছে যে, এমন পরিবেশ, যেখানে নারীদের পোশাক নির্লজ্জ—তাতে অংশগ্রহণ করতে মন চায় না। আহ্! অসতর্ক পোশাক পরিধানকারিণী এসব নারীগণ যদি এ ব্যাপারে মনোযোগ দিত!

নুমান যায়েদের পত্নী, যার নাম সম্ভবত যয়নব, তিনি আপন স্বামীর মাধ্যমে পর্দা এবং একান্ত প্রয়োজনে পুরুষের সাথে জরুরী উঠাবসা ও চলাফেরা করার ব্যাপারে কিছু প্রশ্ন করেছেন। যার ধরণ ছিল মাসয়ালা জিজ্ঞাসার মতো। হযরত মাওলানা (মা.যি.) যথাযথ জবাব দিয়েছিলেন। নু'মান যায়েদ ও তার পত্নীকে সেসব আরব নাগরিকদের অন্তর্ভূক্ত মনে হয়েছে, যাদের চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গি খুবই ভারসাম্যপূর্ণ এবং খাঁটি ইসলামিক। তিনি আরবদের মধ্যে মিথ্যে স্বাধীনতা ও জাতীয়তাবাদের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে ঘোর বিরোধিতা পোষণ করতেন। সেখানে তিনি স্বপরিবারে শিক্ষা সম্পন্ন করছেন এবং নিজের যোগ্যতা অনুযায়ী ইসলামী চিন্তাধারা বিকাশে পুরোপুরি অংশ নিচ্ছেন।

পাশ্চাত্য সভ্যতা অনুকরণের ফলাফল

সংঘবদ্ধ সম্মিলিত ও সামাজিক জীবনে পাশ্চাত্য রীতিনীতির অনুকরণ, তাদের জীবনধারা, নিয়মকানুন ও জীবনপদ্ধতি গ্রহণ ইসলামিক সমাজব্যবস্থায় বিরাট সদূর প্রসারী প্রভাব ফেলে। বর্তমানে পশ্চিমা বিশ্ব এক চারিত্রিক কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত। যার কারণে তার দেহকায় বরাবরই ক্ষত-বিক্ষত হচ্ছে। আর আজ তার পঁচা-দুর্গন্ধ গোটা সমাজ ও পরিবেশে ছড়িয়ে পড়েছে। এই শ্বেত রোগের কারণ (যা প্রায় নিরাময় অযোগ্য) তাদের জাতিগত বিপথগামিতা এবং চারিত্রিক দীনতা। যা পশুত্ব ও হিংস্রতা

পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। তদুপরি এ অবস্থারও প্রকৃত এবং প্রথম কারণ ছিল নারীদের সীমা অতিরিক্ত স্বাধীনতা, সম্পূর্ণ পর্দাহীনতা, নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা ও মদ্যপান। কোন ইসলামিক রাষ্ট্রে যদি নারীদেরকে এমনই স্বাধীনতা দেওয়া হয়, পর্দাপ্রথা একেবারেই উঠিয়ে দেওয়া হয়, নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেলা উঠাবসার সুযোগ করে দেওয়া হয়, সহশিক্ষা চালু করা হয়, তবে এর পরিণতি চারিত্রিক বিক্ষিপ্ততা, যৌনবিকৃতি, জাতিগত বিচ্ছিন্নতা, কোর্ট ম্যারেজ, সকল চারিত্রিক ও ধর্মীয় সীমা এবং মূলনীতির সাথে বিদ্রোহ আর সংক্ষেপ ঐ চারিত্রিক কুষ্ঠরোগ ছাড়া আর কিছুই নয়, যা হুবহু একই কারণে পাশ্চাত্যবাসী ও পশ্চিমা বিশ্বকে আক্রমণ করেছে। আর আজ যেসব ইসলামী রাষ্ট্রে পাশ্চাত্য সভ্যতার আবেগময় অনুকরণ চলছে, যেখানে ইসলামের পর্দাপ্রথা সম্পূর্ণ উঠে গেছে, নারী-পুরুষের মেলামেশা উঠাবসার হয়েছে অবাধ সুযোগ। অধিকন্তু বই-পুস্তক, পত্র-পত্রিকা, সিনেমা-নাটক, টেলিভিশন, প্রবন্ধ-নিবন্ধ এবং শাসক শ্রেণীর পক্ষ থেকে তাদের সাহস বৃদ্ধি বরং দিকনির্দেশনা দেওয়া হচ্ছে, সেখানে এই কুষ্ঠরোগের প্রভাবক্রিয়া পূর্ণরূপে প্রকাশ পেতে শুরু করেছে। আর এটা কুদরতের অমোঘ বিধান, যার থেকে পলায়নের কোনও অবকাশ নেই।

ঘরোয়া পারিবারিক জীবনবিমুখতা ও এর মর্মান্তিক পরিণতি

আমি বিভিন্ন জাতি এবং সভ্যতা-সংস্কৃতির ইতিহাস পাঠ করেছি, গভীর মনোযোগিতা ও ধ্যান-তন্ময়তার সাথে। তারপর আমি এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে, দেশ, জাতি ও উম্মাহর পতন, তাদের ধ্বংস ও বিলীনতা এবং চরম উন্নত ও বিস্ময়কর মনমুগ্ধকারী সভ্যতা-সংস্কৃতির পতন আর দুনিয়ার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক কারণ তাদের পরিবার ব্যবস্থার বিক্ষিপ্ততা, পারিবারিক জীবনে মিতাচার ও ভারসাম্য না-থাকা, নারী-পুরুষের পারস্পরিক সম্পর্কে টানাপোড়েন, বিবাদ-বিশৃঙ্খলা, পারিবারিক ও গৃহস্থলী জীবনে নারীদের অনীহা, অমনোযোগিতা এবং এর দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে ভ্রুক্ষেপহীনতা। ইতিহাসে যথগুলো অধঃপতিত সভ্যতা এবং পশ্চাদগামীতা, অবক্ষয়, ধ্বংস ও বরবাদীর দিকে দ্রুত কদমে ধাবমান জাতি দৃষ্টিগোচর হয়, সেখানে অবশ্যই এই ব্যাধি বিস্তৃত দেখা যায় যে, নারীরা পারিবারিক জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণ, পলায়নপর এবং এর দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে পাশ কাটিয়ে যেতে শুরু করেছে। তারা স্নেহ-মমতার আগ্রহ-উদ্যম হারিয়ে ফেলেছে। সন্তান প্রতিপালন, তাদের সেবাযত্ন এবং নতুন প্রজন্মের পরিচর্যা-পৃষ্ঠপোষকতা

ও তাদের দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে অনাগ্রহ-অবহেলা শুরু করেছে। নিজের ঘরকে তৃপ্তি-সুখের ও শান্তির কুঞ্জ বানাতে উদাসীন হয়ে গেছে। যেখানে পুরুষের শান্তি-নিরাপত্তা, সুখ-স্বস্তি ও আরামের দৌলত সহজলভ্য হয়েছে, সেখানে সে ঘরে প্রবেশ করলে মনে হয়, যেন জান্নাতে প্রবেশ করছি। তদস্থলে তারা পুরুষের দায়িত্ব-কর্তব্য ও তাদের কর্মক্ষেত্রে সমান অংশগ্রহণ, তাদের সহকর্মী, সহযাত্রী, সহযোদ্ধা, প্রত্যেক ময়দানে তাদের সমানে সমানে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়ানো বরং জীবনের প্রতিটি শাখায় তাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ব্যাকুল আগ্রহে পাগল হয়ে গেছে। যার ফলে সেসব সমাজে মানসিক ও চিন্তাগত বিক্ষিপ্ততা, ব্যাপক অনিয়ম, উৎশৃঙ্খলতা এবং চারিত্রিক দীনতা ও যন্ত্রণাদগ্ধ পীড়া সৃষ্টি হয়ে গেছে। শেষ পরিণতি এই দাঁড়িয়েছে যে, ধ্বংস গহ্বরের দিকে তাদের ধাবমান পদক্ষেপ আরও তীব্র গতিশীল হয়েছে। এটাই প্রাচীন গ্রিকদের উপাখ্যান আর এটাই প্রাচীন রোমান ও পারস্যবাসীদের পতনের কিংবদন্তী। আজ আমার আশঙ্কা হচ্ছে, কবে নাগাদ যেন প্রাচ্য জাতিগুলোও এই মর্মন্তুদ পরিণতির শিকার হয়ে যায়। দুঃখ ও উদ্বেগের বিষয় হল, আমাদের প্রাচ্যের ইসলামিক সমাজে এর প্রভাব-প্রতিক্রিয়া ইতোমধ্যে প্রকাশ পেতে শুরু করেছে।

ইসলামী ও অনৈসলামিক পর্দাপ্রথা

মুসলমান পরিবার ও গোত্রগুলোতে (বিশেষত একান্নবর্তী পরিবারগুলোতে এবং যারা নিজেদেরকে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করে) এখনও পর্দা প্রথার অনেকটা প্রচলন রয়েছে। এখানে সেকথা বলব না যে, তা কতটুকু শরঈ ও ইসলামিক আর কতখানি প্রথাগত এবং কি কি কল্যাণের উপর ভিত্তিশীল। কতদূর জরুরী এবং কি পরিমাণ আমলযোগ্য। প্রথম প্রথম এতে অনেক বাড়াবাড়ি ছিল। এখন শিক্ষার প্রভাবে এবং সভ্যতা-সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের কারণে তাতে বিরাট শৈথিল্য এসে গেছে। আর কোনও কোনও উন্নত/অভিজাত” (!) বংশ থেকে তা একেবারে বিদায় হয়ে গেছে। পূর্বে মুসলিম নারী ও সম্ভ্রান্ত মেয়েরা ডুলি, ফ্যান্স বা পাল্কী ছাড়া ঘর থেকে বের হত না। ঘোড়ার গাড়ি, বগি-পাল্কী ইত্যাদিতেও পর্দা ঝুলানো থাকত। এখন টাঙ্গা, রিকশা সাইকেল, বাস ইত্যাদি সেসব সতর্কতা নিঃশেষ করে দিয়েছে। আর স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার প্রয়োজন তো এক্ষেত্রে আরও বেশি প্রশস্ততা সৃষ্টি করে দিয়েছে। কিন্তু বাইরের এই পর্দা সত্ত্বেও ঘরে শরী'অতের হুকুম মাফিক পর্দা মেনে চলা হয়

না। ভারতে (বাংলাদেশেও) মুসলমানগণ এক্ষেত্রে ব্যাপকভিত্তিক এবং উদারচিত্ততার সাথে কাজ করেছে এবং সেসব আত্মীয়-স্বজনের সাথে পর্দা পালনের প্রয়োজন বোধ করে নি, যাদের সাথে পর্দা করার নির্দেশ বা তাগিদ দিয়েছে শরী'অত। অধিকন্তু যাদের সাথে পর্দা মেনে না-চলা অবস্থায় এবং ভ্রুক্ষেপহীনতার বা কথিত ফ্রী-মাইণ্ডে চলায় অনেক অনেক চারিত্রিক দুর্ঘটনা ও কলঙ্কের আশঙ্কাও থাকে।

কন্যার বাগদানের পর শ্বশুর বাড়ির নারীদের সাথে পর্দা

কন্যার বাগদান বা সম্বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর শ্বশুর বাড়ির লোকজনের সাথে এমনকি সে ঘরের নারীদের সাথে পর্দা করার রীতি একান্ত ভারতীয়। অন্য কোনও দেশে এর প্রচলন নেই। এমতাবস্থায় সনাতন বংশগুলোতে মেয়েরা আপন খালা, ফুফু, মামি ও চাচীদের সাথের পর্দা করতে শুরু করে। যাদের ছেলেদের সঙ্গে তার বিয়ের সিদ্ধান্ত হয়েছে কিংবা তাদের মধ্যে বিয়ের কথাবার্তা চলছে।

পর্দাহীনতার প্রতিরোধ

শায়খ ইমাম বখ্‌শ ছিলেন কলকাতার বিশিষ্ট ধনাঢ্য ব্যবসায়ী। তিনি একবার সাইয়িদ আহমদ শহীদ রহ. কে দাওয়াত করলেন। খাবার পর্ব শেষে তিনি সাইয়িদ সাহেব রহ. এর কাছে নিবেদন করলেন, "হযরত! আমার অন্দরমহলে একটু তাশরীফ রাখুন।" সফরসঙ্গীগণ বললেন, আপনি আগে ভিতরে গিয়ে পর্দার ব্যবস্থা করে আসুন। অনন্তর তিনি ভিতরে গেলেন এবং ফিরে এসে বললেন, পর্দা হয়ে গেছে। সাইয়িদ সাহেব তার সঙ্গে অন্দর মহলে গেলেন। সেখানে সকল মহিলা গর্ব-আভিজাত্যের পোশাক পরে বিছানায় উপবিষ্ট ছিল। তিনি আকস্মাৎ তাদেরকে দেখে ভয় পেয়ে গেলেন এবং উভয় হাত নিজের চক্ষুযুগলের উপর রেখে "লা-হাওলা" পড়তে পড়তে বাইরে বেরিয়ে এলেন। মহিলারা শাইখ ইমাম বখ্‌শকে বলল– হযরত তার হস্তদ্বয় চক্ষুযুগলের উপর রেখে বাইরে চলে গেছেন? এখনকি হবে? একথা শুনে তিনি বাইরে আসলেন। সাইয়িদ সাহেব মৌলভী ইউসুফ সাহেবকে বললেন, "এরা পশুর মত।" তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, হযরত! কেন, কি হয়েছে? সাইয়িদ সাহেব বললেন, "শাইখ সাহেব আমাকে তার ঘরে নিয়ে গেলেন আর বললেন, পর্দার ব্যবস্থা হয়ে গেছে। আমি যখন সেখানে গেলাম, তখন দেখলাম– সব মহিলা এক বিছানায় বে-পর্দা হয়ে বসে আছে। আমি সেখানে থেকে বেরিয়ে চলে আসলাম।"

ঘরের বাইরে অনেক চেয়ার পাতা ছিল। একটি চেয়ারে সাইয়িদ সাহেব বসে পড়লেন। শাইখ ইমাম বখ্শও তার পাশে একটি চেয়ারে বসলেন। আর অন্যান্য চেয়ারে অন্যান্য লোকজন বসল। তিনি শাইখ ইমাম বখ্শের প্রতি মনোযোগী হয়ে বললেন, আপনাদের এদেশে পর্দা পালনের রীতি নেই। এখানকার লোকজন তার ভালমন্দ কিছুই বুঝে না। শাইখ ইমাম আরয করলেন, "আপনার লোকজনের কথামত আমি তখন ভেতরে গিয়েছিলাম; সেখানে পুরুষ ছাড়া কেউ ছিল না। আমি বিছানা বিছিয়ে তার উপর মেয়েদেরকে বসিয়ে বাইরে চলে এসেছি। আমি জানতাম, আপনি একে পর্দা বলেন।"

সাইয়িদ সাহেব বললেন, আপনি ভিতরে যান এবং মেয়েদেরকে ঘরের একদিকে বসিয়ে দরজার পর্দা ঝুলিয়ে দিন। তারপর আমরা এখানে বাইরে এসে আপনাকে পর্দার বাস্তবতা বুঝিয়ে বলব।"

এদেশে এমনও রেওয়াজ ছিল যে, চাকর-নওকর ও খাদেমরা অকুণ্ঠ দ্বিধাহীন অন্দরমহলে চলে যেত এবং যা কিছু দেওয়ার থাকত, তা দিয়ে আসত আর যা কিছু নেওয়ার থাকত, তা চেয়ে নিয়ে আসত। মহিলারা তাদের সাথে পর্দা পালন করত না।

শাইখ ইমাম বখ্শ অন্দরমহলে গেলেন এবং পর্দা করিয়ে বাইরে এলেন। সাইয়িদ সাহেব ভিতরে যাওয়ার সময় তার লোকদেরকে বললেন, মাওলানা আব্দুল হাই সাহেবকে ডেকে বসান। আমরা কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে আসছি। একথা বলে তিনি ভিতরে চলে গেলেন। লোকজন মাওলানা আব্দুল হাই সাহেবকে ডেকে এনে বসালেন। অল্প সময়ের মধ্যে তিনি ভিতর থেকে বাইরে তাশরীফ রাখলেন এবং শাইখ ইমাম বখ্শকে পর্দা পালনের উপকারীতা আর না-পালনের অপকারীতা ও ক্ষতির বর্ণনা দিয়ে বললেন, "পর্দা পালন না-করা কাফিরদের রীতি। এতে বড় বড় বিপদ-বিপর্যয় ও প্রচুর ক্ষতি রয়েছে। এটা আল্লাহ ও তার রাসূলের নাফরমানী এবং অবাধ্যতা। এসব মহাপাপ।" এ ধরনের বাক্য বললেন। শাইখ ইমাম বখশ আরয করলেন, "আমাদের এই সমগ্র দেশে কোথাও কারও ওখানে শরঈ পর্দা হয় না। সকল অভিজাত, ধনাঢ্য-দরিদ্র পরিবারের একই অবস্থা। এখন এককভাবে এই ব্যবস্থা করা কঠিন কাজ। আপনি দু'আ করুন, যাতে আল্লাহ পাক আমাদের সকল লোকজন থেকে এই বদ্বীনী ও অধর্মকে দূর করে দেন। নতুবা মনে হয় না যে, নারীরা তা মেনে চলবে।"

সাইয়িদ সাহেব মাওলানা আব্দুল হাই সাহেবকে বললেন, আপনি এখানে এ লোকদেরকে দু'দিন পর্যন্ত পর্দা সম্পর্কে ওয়াজ-নসীহত ও হিতোপদেশ শোনাতে থাকুন। মাওলানা বললেন, 'আমি প্রস্তুত আছি। যা আদেশ হবে, তাই পালন করে যাব। কিন্তু এখানকার নারীরা তো বিভিন্ন ধরনের ব্যাধি আক্রান্ত; কেবল এক পর্দা পালন না-করাই তো নয়। এরা শিরক-বিদ'আত কম করে কোথায়? আপনি তাদের জন্য দু'আ করুন আর হেদায়াত ও সুপথপ্রাপ্তি তো আল্লাহর ইচ্ছাধীন।

সাইয়িদ সাহেব রহ. খোলা মাথায় অত্যন্ত বিনয়-নম্রতার সাথে কায়মনোবাক্যে দু'আ করলেন এবং বললেন, ইনশাআল্লাহ! শাইখ ভাই! আপনারা সবাই দেখবেন, যে নিজ ঘরে পর্দা করাতে ভয় পায় এবং বলে– আমার দ্বারা এর ব্যবস্থা মুশকিল। সেই আপনিই স্বানন্দে খুশি মনে পর্দা পালন করবেন। আর যারা শিরক-বিদআতে লিপ্ত, তারা সবাই একত্ববাদ ও সুন্নাতের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। যখন মহান আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সাফল্যের সাথে পুনরায় এখানে ভালোয় ভালোয় নিয়ে আসবেন, তখন এই আপনারাই আমাদের কাছে বলবেন, আল্লাহ তাআলা এসব লোককে এমন হেদায়াত দান করেছেন। এরূপভাবে তিনি অনেক কথাই তখন বললেন।

নারীদের প্রতি

১লা এপ্রিল ১৯৯৫ খ্রিঃ কাতারের দোহায় সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় নারীদের উদ্দেশ্যেও একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। যেখানে পর্দার পুরোপুরি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল বরং চাদরের আড়ালে হওয়ার পরিবর্তে আমাদের মঞ্চের পেছনে যথারীতি দেয়াল ছিল আর মাইকের মধ্যেমে দেয়ালের পেছনে আওয়াজ পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

আমি ইসলামিক সমাজ, আচার-অনুষ্ঠান ও ইসলামিক জীবন পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করেছি। বলেছি, যে-সময় আরবগণ মরুময় সমাজ-সভ্যতা আর অর্থনৈতিক দিক থেকে নেহাৎ দরিদ্র ও পশ্চাদপদ অনুন্নত শহরগুলোতে বসবাস করত। অনেকেই থাকত তাবু-শিবিরে। খেজুর-খোর্মা, উটের গোশত ও দুধের উপর জীবন যাপন করত। যখন একদিকে বায়েন্তিনী সাম্রাজ্য (যা রোম সাম্রাজ্যের স্থলবর্তী ছিল এবং সভ্যতা-সংস্কৃতিতে উন্নতির উচ্চ শিখরে ছিল) আর অপরদিকে সাসানী (ইরান/পারস্য) সাম্রাজ্যকে জয় করল, যা ছিল সৌন্দর্য ও চাকচিক্য, জীবনোপকরণ ও বিলাসীতার চরম উৎকর্ষে– সেসময়

আরব বিজয়ীগণের আর তদপেক্ষা বেশি তাদের স্ত্রী-কন্যাদেরকে বিরাট পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছে। তারা তাদের জীবন যাত্রার মান, জীবনের উৎকর্ষতা, জীবনোপকরণ, সীমাহীন সৌন্দর্য-সৌকর্য ও ভোগ-বিলাসিতা প্রত্যক্ষ করেছে। এর অনেক ঘটনা শুনেছে এবং নমুনাও দেখেছে। তখন সময়টা মারাত্মক পরীক্ষার মুহূর্ত ছিল। তখন কি নারীদের ঠোটেও পানি এসে যেত। তাদের দৃষ্টিগুলো বিস্ময়াভিভূত হয়ে যেত এবং আপন স্বামীদের কাছে তারা আবদার করত, আমাদেরকেও এসব পরান। আমাদের ঘরগুলোও এভাবে সাজান। আমাদেরকেও জীবনের স্বাদ গ্রহণ এবং নিজের রূপ-গুণ দেখানোর অবকাশ দিন। সবই সম্ভব ছিল। কিন্তু সেসব ঈমানদার নারীর বিপুল কৃতিত্ব ও দান রয়েছে, যাকে মুসলিম বিশ্ব এবং আজকের প্রজন্মও ভুলতে পারে না। তারা এসবের প্রতি লাসলা ও মোহময় দৃষ্টিও তোলে নি। এগুলোকে নিজের জন্য মডেল ও অনুসরণযোগ্য মনে করে নি। তারা তাদের সেই সাদাসিধে অকৃত্রিম জীবনের উপর সন্তুষ্ট ও পরিতৃপ্ত ছিলেন। পর্দা, সংযত জীবন, অল্পেতুষ্টি ও ইসলামিক সভ্যতা, সামাজিকতা ও জীবন পদ্ধতিকে দৃঢ়হস্তে আকড়ে ধরেছেন এবং তার উপর অটল-অবিচল থেকেছেন। আজও তা-ই প্রয়োজন। আজও সেই পরীক্ষা সম্মুখে। যেখানে আমাদের আরব বোনদের গোটা মুসলিম বিশ্বের জন্য মডেল ও প্রেরণা হওয়া উচিত।

একটি সূক্ষ্ম বিষয়

বক্তৃতা শেষে মহিলাদের পক্ষ থেকে লিখিত বিভিন্ন প্রশ্ন আরবী ভাষায় আসতে থাকে। সভা পরিচালক তন্মধ্যে বাছাই করে করে হাতে দিতেন। আর এ অধম লেখক সেগুলোর জবাব দিতে থাকে। ইত্যাবসরে জনৈক মহিলা (সম্ভবত মৌখিকভাবে) প্রশ্ন করলেন, শাইখ! আপনি তো আমাদেরকে দেখতে পারেন না। কারণ, আমরা না-মাহরাম-পরনারী; আমরা কি আপনাকে দেখতে পারি? লেখক জবাবে বলল, আমার ছবি এখানে একাধিক দৈনিকে একাধিক পাতায় ছাপা হয়েছে, তা দেখে নিবেন।

নবুওয়াতে মুহাম্মাদীর দান

মানুষ কখনও তরঙ্গায়িত হয় এবং শিশুসুলভ নিষ্পাপতার সাথে মালিকের কাছে কিছু বলতে শুরু করে। এমনই তরঙ্গে আল্লামা ইকবাল রহ. মানুষের পক্ষ থেকে আপন প্রভুর দরবারে নিবেদন করেছিলে–

ترا خرابہ فرشتہ نہ کر سکی آباد

"আপনার ধ্বংসস্তুপ ফিরিস্তারা আবাদ করতে পারবে না।"

আজ যদি মুহাম্মাদ সা. এর এক নগন্য গোলাম নিবেদন করে, তবে কি অত্যূক্তি হবে– হে আমার প্রভু! তোমার প্রভুত্ব সত্য। তুমি মুহাম্মাদ সা. এর সৃষ্টিকর্তা এ সমগ্র বিশ্বচরাচরের স্রষ্টা ও প্রতিপালক এবং সকল কিছুর উপর কর্তৃত্ববান। কিন্তু তোমার বান্দাগণ এবং তোমার সৃষ্টিকুলের মধ্য হতে কেউ কি তোমার নাম এমনভাবে প্রসার করেছে এবং দুনিয়ার কোনায় কোনায় পৌঁছিয়েছে, যেভাবে তোমার প্রিয় বান্দা ও রাসূল মুহাম্মাদ সা. করেছেন? এটা কোনও বেয়াদবী বা ঔদ্ধত্য নয়। এতেও সেই আল্লাহর প্রশংসা-স্তুতি করা, যিনি হযরত মুহাম্মদ সা. এর মত পয়গাম্বর প্রেরণ করেছেন আর তাকে আপনার নামকে সমুন্নত ও দ্বীনকে সমুজ্জ্বল করার এই শক্তি ও তাওফীক দান করেছেন।

রাসূলে কারীম সা. বদর প্রান্তরে যখন তার চৌদ্দ-পনের বছরের পূর্ণ কামাই আল্লাহর দ্বীনের সাহায্যে উপস্থিত করলেন এবং ৩১৩ জনের ক্ষুদ্র একদল সাহাবাকে এক হাজার সশস্ত্র কাফিরের বিপরীতে এনে দাঁড় করিয়ে দিলেন, তখন মাটিতে কপাল রেখে আপন প্রভুর দরবারে একথাই বলেছিলেন যে, হে আল্লাহ! তুমি এই মুষ্টিমেয় লোকের এই দলকে আজ ধ্বংস করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নাও, তবে কিয়ামত পর্যন্ত তোমার এবাদত-আনুগত্য বাকী থাকবে না।

রাসূলে কারীম সা. একত্ববাদের যে বজ্র আওয়াজ তুলেছিলেন, এতে পৃথিবীর কোনও ধর্মমত, কোনও দর্শন এবং কোনও মন-মস্তিষ্ক প্রভাব লেশহীন থাকে নি। যখন থেকে পৃথিবী শুনেছে, মানুষের জন্য একমাত্র মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও সামনে মাথা নত করা লাঞ্ছনাকর ও লজ্জাজনক। আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম আ. এর সম্মুখে ফিরিশতাদের মস্তকাবনত করিয়েছেন এজন্যই যে, সর্বপ্রকার সিজদা যেন তার সন্তানের উপর হারাম হয়ে যায়। যেন তারা বুঝে নেয়, যখন এই কুদরতের কারখানার কর্মচারী ফিরিশতারদেরকে আমাদের সম্মুখে নতশীর করে দেওয়া হয়েছে, তখন আমাদের এই পৃথিবীর কোনও জিনিসের সামনে মস্তকাবনত হওয়া কবে ও কিভাবে শোভনীয় হতে পারে! যখন থেকে পৃথিবী তাওহীদের এ নিগুঢ়তা আর মানুষ তার মর্যাদা শুনেছে, তখন থেকে শিরক স্বয়ং নিজের দৃষ্টিতে নীচু ও অপদস্ত হয়ে গেছে। একে হীনম্মন্যতা ঘিরে ধরেছে। নবী মুহাম্মাদ সা. এর শুভাগমনের পর এই বাচনভঙ্গিতে আপনারা পার্থক্য উপলব্ধি করবেন। আজ তারা তাদের আমলের উপর খুশি নয়। তারা এর অনভিপ্রেত ও দার্শনিক ব্যাখ্যা দেয়। এতে একথাই প্রতিভাত হয় যে, একত্ববাদের

আওয়াজ মনের মধ্যে স্থান করে নিয়েছে। অধিকন্তু মুহাম্মাদ সা. এই ইলম ও ইয়াকীন (জ্ঞান ও বিশ্বাস) এর সঙ্গে সেই শক্তিও সৃষ্টি করে দেখিয়েছেন, যাতে রয়েছে শত সহস্র পুলিশ, লক্ষ কোটি আদালত এবং বিশোর্ধ্ব রাজত্ব থেকে অধিক শক্তি-ক্ষমতা অর্থাৎ হৃদয়ের শক্তি-মনোবল, কোনো কাজের আগ্রহ। গুনাহের প্রতি ঘৃণা এবং স্বয়ং নিজের আত্মসমালোচনা।

এটা সেই অসীম শক্তির কৃতিত্ব ছিল, যার ফলে সহসা একজন সাহাবী থেকে সামান্য একটি গুনাহ হয়ে গেলে তিনি অস্থির হয়ে গেলেন। তার মনপ্রাণ লজ্জা-অনুতাপে এতটুকু হয়ে গেল। অনন্তর তিনি দরবারে রেসালতে হাজির হলেন এবং আবেদন করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে পবিত্র করুন! নবীজী তার চেহারা মুবারক ঘুরিয়ে নিলেন। সে আবার ঐ দিকে এসে দাঁড়িয়ে গেল। নবীজী তদন্ত নিলেন, এর মাথা খারাপ হয়ে যায় নি তো? যখন জানা গেল, সে সুস্থ মানুষ, তখন নবীজী তাকে সাজা প্রদান করেন। কোন্ জিনিস তাঁদেরকে স্বেচ্ছায় শাস্তি গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেছে আর কোন্ জিনিস তাদেরকে স্বেচ্ছায় টেনে এনেছে?

আরও শুনুন! গামেদিয়া ছিলেন একজন অশিক্ষিত মহিলা, কোনও এক গ্রামে বসবাসকারিণী। একবার সে মারাত্মক পাপে লিপ্ত হয়ে গেল। না সেখানে প্রত্যক্ষকারী কেউ ছিল আর না শ্রবণকারী কেউ। কিন্তু তার মনে একটি ফাঁস ছিল, যা তাকে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে দিত না। পানাহারে তার স্বাদ লাগত না। সে খাবার খেতে বসলে তার মন বলত, তুমি নাপাক, অপবিত্র। পানি পান করত তো মন বলত, তুমি অপবিত্র। নাপাক অপবিত্রের আবার পানাহার কিসের? আগে তোমার পবিত্র হওয়া প্রয়োজন। এ পাপের পবিত্রতা দণ্ড ছাড়া সম্ভব নয়। তারপর সে নিজেই রাসূলে কারীম সা. এর দরবারে এসে হাজির হল এবং আবেদন করতে লাগল– তাকে যেন পবিত্র করে দেওয়া হয়। এজন্য সে পীড়াপীড়ি শুরু করল। কিন্তু নবীজী যখন জানতে পারলেন, তার পেটে বাচ্চা আছে, তখন বললেন, এই বাচ্চার কি অপরাধ? তার জীবন কেন তোমার সাথে বরবাদ হবে? যখন সে ভূমিষ্ঠ হবে, তখন এসো। লক্ষ্য করুন! অবশ্যই তার এতে কিছু সময় লেগেছে। সে কি পানাহার করে নি? জীবন কি তাকে বাঁচার আমন্ত্রণ জানায় নি? স্বয়ং পানাহারের স্বাদ কি বাঁচার আগ্রহ সৃষ্টি করে নি? তাকে কি নিভৃতে বুঝায় নি, যেন সে এখন নবীজীর দরবারে হাজির হওয়ার ইচ্ছা ত্যাগ করে। কিন্তু আল্লাহর এই খাঁটি বান্দী অবিচল রইল। কিছুদিন পর নবজাতক শিশুসহ নবীজীর খেদমতে এসে হাজির হল এবং নিবেদন করল, আমি এর থেকে

অবসর হয়ে গেছি। এখন কেন আমার পবিত্রতা বিলম্ব হবে? নবীজী বললেন– এখন থেকে দুগ্ধপান করাও। যখন দুগ্ধপান ছাড়াবে, তখন আসবে। আপনারা জানেন, এতে তার দুই বছর সময় তো অবশ্য লেগেছে। এই দুই বছর কত বড় পরীক্ষার ছিল? না পুলিশ ছিল, না ছিল পাহারাদারী, না মুচলেকা, না জামানত। কত চিন্তা, কল্পনাইনা তার মনে ভিড় জমিয়েছিল। নিশ্চয় শিশুর নিষ্পাপ চেহারা তাকে বাঁচার আহ্বান জানাচ্ছিল। তার মুচকি হাসি হয়তো বাঁচার স্বপ্ন-স্বাধ সৃষ্টি করেছিল। হয়তো শিশু তার নির্বাক ভাষায় বলছিল, আম্মা! আমি তো তোমারই কোলে প্রতিপালিত হব। তোমার হাত ধরে পথ চলব কিন্তু তার মন বলছিল– না, তোমার আম্মা অপবিত্র। তাকে সর্বপ্রথম পবিত্র হতে হবে। মনে গভীর বিশ্বাস ছিল, উভয় জগতের স্রষ্টা ও বিচারক মহান আল্লাহর কাছে যেতে হবে। সেখানের সাজা গুরুতর, মর্মন্তুদ। সে নবীজীর দরবারে পুনরায় এসে উপস্থিত হল। বলতে লাগল– হে আল্লাহর রাসূল সা.! এই দেখুন, এ শিশুর দুধ ছাড়ান হয়ে গেছে। সে রুটি খাওয়ার যোগ্য হয়ে গেছে। এখন আমার পবিত্রতায় বিলম্ব কিসের? অবশেষে আল্লাহর এই খাঁটি, সত্যবাদী ও দৃঢ়পদ বান্দীকে প্রস্ত রাঘাতে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হল। নবীজী সা. সুসংবাদের প্রতিশ্রুতি দান করেন। আরও বলেন, সে এমন খাঁটি তাওবা করেছে যে, তার একার তাওবা গোটা মদীনাবাসীকে ভাগ করে দেওয়া হলে, তা সকলের জন্য যথেষ্ট হবে।

আমি জিজ্ঞাসা করি, সে কী জিনিস, কী সে আকর্ষণ, যা হাতকড়া-বেড়ি ছাড়া, মুচলেকা ও জামানত ছাড়া, কোনও পুলিশ প্রহরা ছাড়া তাকে এভাবে নবীজীর দরবারে বারবার টেনে এনেছে এবং সাজা গ্রহণের জন্য পীড়াপীড়ি করিয়েছে? আজ হাজার হাজার লেখাপড়া জানা, যোগ্য, শিক্ষিত, বিদ্বান নারী-পুরুষ রয়েছে, যাদের বিদ্যা এবং বহুমুখী ক্ষতির নিশ্চয়তাও তাদেরকে অপকর্ম ও অন্যায়-অপরাধ থেকে ফেরাতে পারে না। এমনকি পারে না তাদেরকে ভাল ও সৎকাজের প্রতি আগ্রহী-অনুপ্রাণিত করতে। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সা. বিশ্ববাসীকে এই তিনটি দুর্লভ মুক্তাই দান করেছেন। (১) সঠিক জ্ঞান। (২) পূর্ণ বিশ্বাস। (৩) সৎকাজের আন্তরিক আগ্রহ। পৃথিবী না এর চেয়ে অধিক মূল্যবান মূলধন পেয়েছে আর না কেউ তার উপর এর চেয়ে বেশি অনুগ্রহ করেছে।

পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের গর্ব করা উচিত যে, আমাদের মানব জাতির মধ্যে একজন মহামানব জন্ম নিয়েছেন, যার দ্বারা মানবতার মাথা উঁচু এবং নাম উজ্জ্বল হয়েছে। তিনি যদি শুভাগমন না-করতেন, তবে পৃথিবীর চিত্র

কী হত? আর আমরা বিশ্বমানবতার শ্রেষ্ঠত্ব ও সম্মানের জন্য কাকে উপস্থিত করতাম? মুহাম্মাদ সা. বিশ্বমানবতার জন্য রহমত। মুহাম্মাদ সা. এই পৃথিবীর আলোকবর্তিকা ও মানবজাতির সম্মান। তিনি কোনও গোত্র ও জাতির তাল্লুক নয়। তার উপর কোনও রাষ্ট্রের ইজারাদারী নেই। তিনি সমগ্র পৃথিবীর, পুরো বিশ্বমানবতার গর্বের ধন। কেন আজকের পৃথিবীতে কোন মানুষ গর্ব ও আনন্দে বলে না, আমার ঐ জাতির সাথে সম্পর্ক আছে, যেখানে মুহাম্মাদ সা. এর মত সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব জন্ম নিয়েছেন।

আজ মানুষের কোন শ্রেণী আছে, যার উপর সরাসরি-মাধ্যমে অনুগ্রহ-দান নেই? কী নারীদের উপর তাঁর অনুগ্রহ নেই? আরে! তিনিই তো নারী অধিকারের কথা বলেছেন। তাদের জন্য হেদায়াত, দিক-নির্দেশনা ও ওছিয়ত করেছেন। তিনি ইরশাদ করেছেন, "জান্নাত মায়ের পদতলে।" কী দুর্বলদের উপর তার অনুগ্রহ নেই? তিনি তাদের সাহায্য-সহায়তা দানে ইরশাদ করেছেন– "মজলুমের বদ'দুআ থেকে বাঁচো। কেননা তার এবং আল্লাহর মাঝে পর্দা নেই।" আল্লাহ পাক বলেন, ভগ্নপ্রাণ মানুষের সাহায্য করো।" কী, শক্তিধর ও শাসকবর্গের উপর তার অনুগ্রহ নেই? নবী কারীম সা. তাদের অধিকার এবং দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কেও বলেছেন, সাথে সীমারেখাও বলে দিয়েছেন। ইনসাফকারী ও আল্লাহভীরু শাসকদের সম্পর্কে সুসংবাদ শুনিয়েছেন– ন্যায়পরায়ণ বাদশা আল্লাহর রহমতের ছায়াতলে থাকবে। কী, ব্যবসায়ীদের উপর তাঁর অনুগ্রহ নেই? তিনি ব্যবসার ফযীলত এবং এ পেশার মর্যাদা বর্ণনা করেছেন আর স্বয়ং ব্যবসা করে এ দলের সম্মান বাড়িয়েছেন। তিনি কি বলেন নি–"আমি এবং সত্যবাদী বিশ্বস্ত ধার্মিক ব্যবসায়ী জান্নাতে খুব কাছাকাছি থাকব।" তিনি কি শ্রমিদের উপর অনুগ্রহ করেন নি? তিনি জোর তাগিদ করেছেন– "তোমরা শ্রমিকের পারিশ্রমিক তার ঘাম শুকানোর পূর্বেই দিয়ে দাও।" জীব-জন্তুর উপর পর্যন্ত কি তার অনুগ্রহ নেই? তিনি ইরশাদ করেছেন– প্রত্যেক ঐ সৃষ্টিজীব, যার প্রাণ আছে এবং যার মধ্যে অনুভূতি ও জীবন আছে, তাকে আরাম দেওয়া, খাদ্য-পানি দেওয়াও সদকা। যেমন বলেছেন– فى كل ذات كبد حرى صدقة। পুরো মানব ভ্রাতৃত্বে কি তার অনুগ্রহ নেই? তিনি তো গভীর রাতে উঠে উঠে সাক্ষ্য দিতেন– انا شهيد ان العباد كلهم اخوة "প্রভূ হে! আমি সাক্ষী, তোমার প্রত্যেক বান্দা পরস্পর ভাই ভাই।" সমগ্র বিশ্বজগতের উপর কি তার অনুগ্রহ দান নেই? সর্বপ্রথম তো বিশ্বজাহানই

শুনেছে, আল্লাহ কোনও এক দেশ, বংশ, জাতি ও ভ্রাতৃত্বের নয়; সমগ্র বিশ্বজগৎ এবং পৃথিবীর সকল মানুষের। যেই পৃথিবীতে বলা হত আর্যদের প্রভূ, ইয়াহুদীদের প্রভু, মিসরীদের খোদা, ইরানীদের খোদা, সেখানে الحمد لله رب العالمين (সকল প্রশংসা উভয় জগতের পালনকর্তার জন্য)-এর বাস্তবতার ঘোষণা হয়েছে এবং একে নামাযের অংশ বানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

আমাদের পৃথিবীতে ডক্টর-দার্শনিক জন্ম নিয়েছে। জ্ঞানী, বিদ্বান-বুদ্ধিজীবীও জন্ম নিয়েছে। আরও জন্ম নিয়েছে কত কবি-সাহিত্যিক, বিজেতা ও বিশ্বজয়ী, রাজনৈতিক নেতা ও জাতীয় পথপ্রদর্শক, কত আবিষ্কারক ও সৃজনশীল বিজ্ঞানী। কিন্তু কার আগমনে ও জন্মে পৃথিবীতে সেই বসন্ত বাহার এসেছে, যা সৃষ্টি হয়েছে নবী-রাসূলগণের আগমনে। আর সবশেষে নবী মুহাম্মাদ সা. এর শুভাগমনে। কে তার সঙ্গে করে এমন বসন্ত, এমন শস্য-শ্যামলতা ও বরকত, এমন রহমত ও কল্যাণ, মানবজাতির জন্য এমন রত্নমানিক, ধন-দৌলত এবং বিশ্ব মানবতার জন্য এত অফুরন্ত নেয়ামত নিয়ে এসেছে, যা নিয়ে এসেছেন নবী মুহাম্মাদ সা.। চৌদ্দ শত বছরের মানব ইতিহাস পূর্ণ দৃঢ়তার সাথে তাঁকে সম্বোধন করে বলে–

سر سبز سبزہ ہو جو تیرا پائمال ہو
ٹھہرے تو جس شجر کے تلے وہ نہال ہو

মরুভূ হল শস্য-শ্যামল
তব পদধূলি পেয়ে,
তুমি দাঁড়ালে যে বৃক্ষছায়ায়
নাচিল সে সফল সুখী হয়ে।

অভ্যাস-চরিত্র, প্রথা-প্রচলন ও তার সংশোধন

বর্তমান যুগের বিবাহের জটিল-কুটিল প্রথা

বর্তমান সময়ে মুসলিম বিশ্বে সাধারণভাবে আর বিশেষত ভারত-বাংলাদেশে বিবাহ একটি মারাত্মক জটিল, দীর্ঘ রুসম-রেওয়াজ পালন, অত্যন্ত ব্যয়বহুল কাজ এবং প্রভাব-প্রতিপত্তি, বংশগৌরব, ধনাঢ্যতা, যশ-খ্যাতি ও আভিজাত্য প্রকাশের মাধ্যম হয়ে গেছে। এর সাদাসিধে, অনাড়ম্বরতা ও সহজতা প্রায় বিদায় হয়ে গেছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তো বিবাহ একটি কঠিন মসিবত, অস্থিরতা, লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও ভারী যন্ত্রণার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদের পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতা যতদূর, তাতে আধুনিক শিক্ষা ও অর্থনৈতিক বিপ্লব এর উপর বেশি প্রভাব বিস্তার করেনি। এর বাস্তবায়নে সে বড় কোনও সংস্কারকর্ম সম্পাদন করে নি। ভাল ভাল ধার্মিক ও শিক্ষিত পরিবারগুলোতে এখনও বিবাহ-শাদী অনেক ধুমধাম, আড়ম্বরতা ও জাঁকজমকের সাথে করা হয়। এক্ষেত্রে প্রভাব-প্রতিপত্তি ও নিজের আত্মীয়তা সম্পর্কের প্রশস্ততা প্রকাশের জন্য আজকাল এমন অনেক নতুন নতুন পন্থা চালু হয়েছে, যা পূর্বে কখনও প্রচলিত ছিল না। ওলীমা-বৌভাতও বিরাট আকারে করা হয়। এতে অবস্থা অনুযায়ী মন খুলে খরচ করা হয়। অনেক স্থানে এ ব্যয় হাজার হাজারের সীমা ছাড়িয়ে লাখ-লাখ টাকার উপরে চলে যায়। যাদের নিকট নগদ টাকা থাকে না, সে এজন্য ঋণ এমনকি সুদেও পর্যন্ত ঋণ গ্রহণ করে। সুনাম-সুখ্যাতি, লৌকিকতা-প্রদর্শনী, গর্ব-অহংকার, প্রতিযোগিতা-প্রতিদ্বন্দ্বিতার আগ্রহ-আবেগও এতে বিরাট কাজ করে। এ ব্যাপারে ভারত-বাংলাদেশের মুসলমানদের পদক্ষেপ বিশ্ব মুসলমান থেকে অগ্রসরমান।

রঙ্গ নাচ ও গান বাদ্যের প্রচলন

সে-সব বংশ ও পরিবারের কথা বাদ দিন, যারা কঠোরভাবে শরী'অত মেনে চলে কিংবা যা শুদ্ধি আন্দোলনগুলোর দ্বারা পূর্ব থেকেই প্রভাবিত। নৃত্যানুষ্ঠান, গান-বাদ্য আজকালকার বিয়ে উৎসবগুলোর এক অনিবার্য ও

আনন্দ প্রকাশের আলামত। অনেক পরিবারে বিয়ে অনুষ্ঠানের কয়েকদিন পূর্ব থেকে গান-বাদ্যের পর্ব শুরু হয়ে যায়। সুতরাং তজ্জন্য গায়ক-নায়ক, রসিক-নর্তকীরা বেশ কদিন আগেই জড়ো হয়ে যায়। পরিবারের মেয়েরাও তাতে অংশ নেয়। কয়েক দিন আগে থেকেই মাঝি-বৌ বসিয়ে দেওয়া হয় এবং তার পর্দা করিয়ে দেওয়া হয়। এখন অনেক জায়গায় গান-বাদ্যের স্থান রেকডিং-ভিডিও দখল করে নিয়েছে। প্রাচীন যুগে বিশেষভাবে রাজন্যবর্গ, নেত্রীবৃন্দ ও জমিদারদের বাড়িতে নৃত্যানুষ্ঠানের আয়োজন করা হত। এজন্য পেশাদার গায়ক-গায়িকা ও নর্তক-নর্তকীদের ভাড়া করে আনা হত এবং তাদের সেবা নেওয়া হত। এখন কিছু সংস্কারমূলক চেষ্টা-তদবীর ও শিক্ষার প্রভাবে আর কিছু অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা ও সমস্যার কারণে এসব অনেকটা হ্রাস পেয়েছে।

ভারতীয় মুসলমানদের বিয়ে-শাদীর স্থানীয় কিছু রীতি-নীতি

ভারতীয় মুসলমানদের বিয়ে-শাদীর কিছু রীতিনীতি আঞ্চলিক/ স্থানীয়ভাবে প্রচলিত। এগুলো সেখানকার মুসলমানদের বৈশিষ্ট্য হয়ে গেছে। অন্যান্য দেশ ও অঞ্চলের মুসলমান সে সম্পর্কে অনবগত। যেমন ভারতের কোনও কোনও প্রদেশে পাত্রপক্ষ থেকে কিছু আবদার ও প্রত্যাশা থাকে, যেগুলো পূরণ করা পাত্রীপক্ষের জন্য আবশ্যক গণ্য হয়ে থাকে। আবার এগুলোকে কোথাও কোথাও "তলক" প্রথা নামে অভিহিত। খোদ ভারতের সব অঞ্চলে এর প্রচলন নেই। আরব কিংবা তুর্কী মুসলমানদের পক্ষে বিষয়টি বুঝা কঠিন। তাদের বোধগম্য হয় না, এর বাস্তবতা কি? এর কি নৈতিক-চারিত্রিক কোনও বৈধতা হতে পারে? এখানে সে আলোচনার অবকাশ নেই যে, এর ফলে আজ কন্যাদের উপযুক্ত জোড়া ও বর পাওয়া এবং তাদের মাতা-পিতার জন্য তাদের দায়িত্ব থেকে মুক্তি পেতে কত কঠিন সমস্যার সৃষ্টি হয়ে গেছে? তারা জীবনকে কতখানি তিক্ত আর বিয়ে-শাদীকে কত ভয়াবহ আযাবে পরিণত করে ফেলেছে!

উল্লেখ্য যে, এই প্রবন্ধ রচনাকালে বিভিন্ন দৈনিকে একটি মর্মান্তিক ঘটনা পড়েছি। বিহার প্রদেশের একটি শহর "গায়া" এর জনৈক মুসলমান মার্কেটিং অফিসার আত্মহত্যা করেছে শুধু একারণে যে, সে তার চার কন্যার জন্য পাত্রপক্ষের চাহিদামতো যৌতুকের আবদার পূরণে ব্যর্থ ও অক্ষম ছিল। (সিদকে জাদীদ ঃ ৩ মার্চ, ১৯৭২ খ্রিঃ) যেসব কন্যা প্রত্যাশিত যৌতুক নিয়ে আসবে না, তাদেরকে জ্বালিয়ে দেওয়া কিংবা যে কোনও

পন্থায় মেরে ফেলার অসংখ্য ঘটনা প্রকাশ পাচ্ছে। ১৯৮৪ খ্রিষ্টাব্দে দিল্লিতে ছয়শ' দশ জন নারী পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। একটি নির্ভরযোগ্য জাতীয় দৈনিকের সংবাদ মতে দিল্লিতে এখন যৌতুকের জন্য প্রতি বার ঘণ্টায় একজন নববধূকে পুড়িয়ে মারা হয়।

অনুরূপভাবে কনে পক্ষ থেকে বৌ-ভাতের মতো এক বিশেষ ধরনের নিমন্ত্রণের প্রচলন অন্যান্য দেশে নেই। কনে পক্ষ থেকে প্রদত্ত বিবাহ উপহার প্রদর্শনী এবং বরদের শহরে ঘুরে বেড়ানো (যা অনেক ভাইদের অভ্যাস) এরও অন্যান্য দেশে পাত্তা নেই। এছাড়া বিয়ে-শাদীতে সেলামী, দর্শর ফী, সালাম করানো, বিবাহের নগর পয়নামা, শালী-দুলাভাইয়ের জটিল সম্পর্ক ও পরস্পর হাসি-কৌতুক, চতুর্থিয়া (আঞ্চলিক ভাষায় চাদরী/ ফিরুল্লাহ) ইত্যাদিসহ আরও বিশোর্ধ্ব প্রথা প্রচলন রয়েছে। যেগুলো এখনও ভারতীয় [ও বাংলাদেশের] বহু বংশ-পরিবারে প্রচলিত আছে। এসবের অনেকগুলো ভারতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। সম্ভবত এসবের পিছনে তাদের এ বিশ্বাস কাজ করে যে, বিবাহ-শাদী একটি আনন্দ উৎসব, একটি খোলা বিনোদন, হাস্য-রস ও প্রাণবন্ত ক্রীড়া-কৌতুকের মুহূর্ত, যেখানে বংশ-পরিবারের লোকজন এবং প্রিয় আত্মীয়-স্বজন তাদের জীবনের ধরাবাঁধা গতানুগতিক নিয়ম-রীতি ও একঘেয়ে চক্কর থেকে সামান্য সময়ের জন্যে মুক্তি পেয়ে এবং কিছুটা চারিত্রিক বন্ধনগুলো ও বাধ্যবাধকতাকে বাক্সবন্দি করে জীবনের স্বাদ গ্রহণ করে। এই চিন্তা-কল্পনা ভারতের অভ্যাস-রীতির সাথে খুবই সামঞ্জস্যপূর্ণ। যা সব সময় রঙঢঙ্গের প্রেমিক এবং বৈচিত্র ও আধুনিকতকতা, মিলমিশ, অনুরাগ এবং আমোদ-প্রমোদের আগ্রহী ছিল এবং যার প্রদর্শনী এখানকার মেলা, উৎসব ও প্রথা প্রচলনে করা হয়েছে।

বিয়ে পড়ানোর রীতি-নীতি

বিয়ের আসরের কর্মসূচির মধ্যে সাধারণত বর কনে পক্ষ থেকে দেওয়া নতুন জামা জোড়া পরে আসরের উঁচু দর্শনীয় মঞ্চে গিয়ে বসে। ভারতের অনেক স্থানে ফুলের মালা, মুক্তোর টোপর ও কাঁকন পরানোর প্রথাও আছে। শরী'অত পরিপালনকারী কোনো মুসলমান আদৌ যা পছন্দ করে না। বিয়ে পড়ানোর প্রথা যে কোনও আলেম কিংবা লেখাপড়া জানা মুসলমান সম্পন্ন করতে পারে; এর জন্য কাজী ডাকার আবশ্যকতা নেই। মুসলিম বাদশাদের যুগে সমগ্র দেশে এ ব্যবস্থাই চালু ছিল। তাদের আরেকটি জরুরী এবং মনোহারী উপহার দায়িত্বও ছিল বিয়ে পড়ানো। অধিক সুন্নাত পদ্ধতি হল,

কনের পিতা বা অন্য কোনও অভিভাবক বিয়ে পড়ানো। কেননা হযরত ফাতেমা রাযি. বিবাহ স্বয়ং তাঁর পিতা জনাব রাসূলে কারীম সা. হযরত আলী রাযি. এর সাথে পড়িয়েছেন। এমতাবস্থায় দু'জন সাক্ষী ও একজন উকিল কনের কাছে গিয়ে অবহিত করে– এত টাকা মহর ধার্য করে অমুক ছেলের সাথে তার বিবাহ দেওয়া হচ্ছে। ভারতে সাধারণত এর জবাব নীরবতার মাধ্যমে দেওয়া হয়। একে সন্তুষ্টির প্রমাণ এবং মঞ্জুরীর নামান্তর মনে করা হয়। এসব সাক্ষী ও উকিল সাধারণত বংশের লোক এবং কনের নিকটাত্মীয় হয়ে থাকে। এরপর বিবাহ পড়ানেওয়ালা (বিবাহ স্থাপক) উচ্চস্বরে কুরআনে কারীমের কিছু আয়াত কিছু হাদীস ও দু'আ সম্বলিত আরবী বাক্য পাঠ করে শোনান। যাকে বলা হয় বিবাহের খুতবা। এরপর ইজাব-কবুল (প্রস্তাব-সমর্থন) করানো হয়। যার বাক্য হয়ে থাকে– "আমি অমুক সাহেবের অমুক কন্যাকে তার পক্ষ থেকে এত টাকা মহরের উপর আপনার নিকট বিবাহ দিচ্ছি। আপনি কি কবুল করেছেন?" এর জবাবে বর কাছে থেকে শোনা যায় এতটুকু উঁচু আওয়াজে বলে– "আমি কবুল করলাম।" এরপর বিবাহ পাঠক ও উপস্থিত লোকজন দু'আর জন্য হাত ওঠান এবং দু'আ করেন– স্বামী-স্ত্রীতে মিলমিশ ও প্রীতি-ভালবাসা হোক। তাদের দাম্পত্য সফল, সুখী ও আনন্দঘন হোক। এ খুতবা সাধারণত আরবীতে পড়া হয়।

একটি মূর্খতার সংশোধন

আহমদ খাঁ কাকা একবার সাইয়িদ আহমদ শহীদ রহ. এর নিকট আরয করলেন, আমাদের এদেশে একটি প্রথা আছে, পাত্রীপক্ষ নগদ টাকা গ্রহণ করা ছাড়া কেউ তার কন্যাকে কারও পুত্রের সঙ্গে বিয়ে দেয় না। কেউ পাত্রপক্ষ থেকে শত টাকা, কেউ চার-পাঁচ শ' আর কেউ নেয় হাজার টাকা। গরীব পাত্রপক্ষ টাকার খোঁজে ভীষণ অস্থির হয়ে পড়ে। তাদের কন্যারা থাকে ঘরে বসে আর না হয় তাদের বিবাহ। এ এলাকার নারীরা আপনার কাছে হিতাকাঙ্ক্ষা ও ন্যায়বিচার প্রত্যাশা করে। তারা বলে, সাইয়িদ বাদশাকে আল্লাহ তা'আলা আমাদের ইমাম বানিয়েছেন। তিনি এসে যেন আল্লাহর জন্যে আমাদের কন্যাদের একটা ব্যবস্থা করেন এবং আমাদেরকে আযাব থেকে মুক্তি দেন।

একথা শুনে সাইয়িদ সাহেব দীর্ঘ সময় পর্যন্ত নীরব ধ্যানমগ্ন রইলেন। তারপর বললেন, তুমি ভালই করেছ! যে কথা তুমি আমাকে বললে, অবশ্যই আমি তার প্রতিবিধান করব ইনশা আল্লাহ। তুমি নিশ্চিত থাকো।

এটা বড়ই কুসংস্কার তোমাদের এদেশে। আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে এর থেকে নিস্কৃতি দিন এবং তোমাদের সকলকে পুরোপুরি মুসলমান ও সুন্নাতের খাঁটি অনুসারী বানিয়ে দিন।

সাইয়িদ সহেব সেদিনই এবং তার পরের দিনও মহল্লার সব লোকদের ডেকে সমতে করলেন। নরমভাবে ওয়াজ-নসীহত করলেন। বিবাহের কল্যাণ ও প্রয়োজনীয়তা এবং উক্ত কুসংস্কারের ক্ষতি ও অনিষ্টতা বুঝালেন। বললেন, তোমরা সকল মানুষ আমার হাতে হেদায়াত ও ইমামতের বাইআত নিয়েছ। গ্রহণ করেছে শরী'অতের যাবতীয় হুকুম-আহকাম, প্রত্যেক পাপ ও কুকর্ম থেকে তাওবা করেছ। সুতরাং আল্লাহ ও তার রাসূলের হুকুম মেনে এ পাপ থেকেও তাওবা করো। শরী'অতের বিধান মতে সানন্দে, স্ব-আগ্রহ আপন কন্যাদেরকে নিজের ভ্রাতৃত্ববোধে বিয়ে দিয়ে দাও। আল্লাহ ও তার রাসূল সা. এর হুকুমের বিরুদ্ধে টাকা নেওয়ার কুপ্রথা ত্যাগ করো। যদি তোমরা না-মান, তবে নিজের উপর বড়ই অবিচার হবে।

তাঁর এই বক্তব্য শুনে সকলেই সাদরে স্বতঃস্ফুর্তভাবে এই মূর্খতা থেকে তাওবা করল এবং আপন কন্যাদেরকে বিয়ে দিয়ে দেওয়ার অঙ্গিকার ব্যক্ত করল।

কনে বিদায়

যেসব মেয়ের বিয়ে-শাদী হয়ে যেত, তারাও অধীর প্রতীক্ষায় থাকত, পাঠান-জমিদারদের রেওয়াজমত বিদায় সংবর্ধনা হোক। এজন্য বছরের পর বছর বসে থাকত। এমনকি প্রৌঢ়া বৃদ্ধা হয়ে যেত। এতে সৃষ্টি হত নানা ধরনের সমস্যা ও অনিষ্টতা। মঞ্জুরায় আছে, বর্তমান কালে তাগিদ হয়েছে যেসব লোক নিজের কন্যাদেরকে বিয়ে দিয়ে দিয়েছে আর তারা সাবালিকা হয়ে গেছে, তাদেরকে নিজ নিজ স্বামীর ঘরে উঠিয়ে দিতে হবে। নির্দেশ জারী করা হয়েছে, যেসব সাবালিকা কন্যাদেরকে বিবাহের পরও তাদের স্বামীর ঘরে উঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে না, তাদের যেন অবহিত করা হয়। তাদের জন্য কর্মচারী নিয়োগ দেওয়া হয়েছে, যেসব পিতা-মাতা কিংবা অভিভাবক তাদের সাবালিকা কন্যাদেরকে উঠিয়ে দিচ্ছে না, তাদের থেকে সরকারীভাবে বল-প্রয়োগের মাধ্যমে উঠিয়ে দেওয়া হবে এবং তাদের স্বামীদের কাছে ন্যাস্ত করা হবে। হাফেয আব্দুল লতীফ সাহেব এবং খিজির খান কাবলী সহকর্মীদের সাথে এ কাজে নিয়োজিত হয়েছেন। গ্রাম-গঞ্জগুলোতে স্বামীদের

বৃত্তান্ত ও বিবরণ অনুযায়ী সে সব কন্যাকে উঠিয়ে দেওয়া হবে। এর কর্মপন্থা ছিল, যখন স্বামী (শরঈ) বিচারক/ আদালতের নিকট অভিযোগ দায়ের করত যে, অমুক গ্রাম বা স্থানে আমার সাবালিকা স্ত্রী রয়েছে, কিন্তু তাকে উঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে না। তখন কন্যার পিতাকে অন্যান্য শরঈ অভিভাবকদেরসহ তলব করা হত এবং ভালভাবে বুঝানো হত, যেন সে তার কন্যাকে উঠিয়ে দেয়। যদি সে মেনে নিত, তবে সে এজন্য কোন দিন ধার্য করে নিত। অন্যথায় বিচারক/ আদলতের পক্ষ থেকে একটি দিন ধার্য করে দেওয়া হত। সেদিন তার স্বামী হাফেয আব্দুল লতীফ কিংবা খিজির খান সাহেবকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে আপন স্ত্রীকে উঠিয়ে আনত।

বিধবার দ্বিতীয় বিয়ে এবং ভারতীয় মুসলমানদের ভিন্ন আচরণ

বিধবার দ্বিতীয় বিয়েকে শরী'অতের দৃষ্টিতে এবং মুসলিম সমাজ ও প্রচলনে কখনও দোষণীয় ও আপত্তিকর কাজ মনে করা হত না। এটা ছিল তাদের নবীর সুন্নাত। প্রত্যেক যুগেই বিশিষ্ট আলেমগণ, আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণ এবং বুযুর্গ-মাশাইখ ও শ্রদ্ধাভাজন শাসকবর্গ নির্দ্বিধায় বিধবা নারীদেরকে স্বয়ং বিয়ে করতেন। নিজের বিধবা বোন ও কন্যাদেরকে দ্বিতীয়বার বিয়ে দিতেন। ভারতের একাধিক তৈমুর বংশীয় কন্যা এবং মোঘল বংশের অনেক বেগম বিধবা হয়ে যাওয়ার পর দ্বিতীয় বিয়ে করেছেন। ইতিহাসের পাতায় তাদের নাম সম্মান ও শ্রদ্ধার সাথে লিখিত হয়েছে। আমরা যতদূর জানি, মুহাম্মদ শাহ থেকেই (১৭১৯ - ১৭৪৭ খ্রিষ্টাব্দ যেমনটি জানা যায় খানী খাঁর বর্ণনা থেকে) ভারতের অভিজাত, সম্ভ্রান্ত ও উঁচু বংশগুলোতে একে নিন্দনীয় ও দোষণীয় কাজ এবং নারীর মূল্যায়ণ, কৃতজ্ঞতা ও সম্মান পরিপন্থী মনে করা শুরু হয়। এমনকি যে ব্যক্তিই এর সাহস ও ধৃষ্টতা দেখাত, তার সঙ্গে বংশীয় সম্পর্ক ছিন্ন করা হত এবং তাকে চরম লাঞ্ছনার দৃষ্টিতে দেখা হত।

অনেক সময় এ ধরনের স্বামী-স্ত্রী উভয়কে দেশত্যাগে বাধ্য করা হত। তের হিজরী শতকের প্রথম দিকে উনিশ খ্রিষ্ট শতকের মধ্যভাগে ভারতের প্রসিদ্ধ সংস্কারক, সাধক ও ধর্মীয় নেতা হযরত সাইয়িদ আহমদ শহীদ রহ. রায়বেরলী এই ইসলাম বিরোধী মানসিকতার বিরুদ্ধে সংস্কার আন্দোলন পরিচালনা করেন। স্বয়ং এই কুপ্রথা ভেঙ্গে দিয়ে এবং তাঁর অন্যান্য বন্ধু ও ভক্ত-অনুরাগীগণ বাস্তবিক পদক্ষেপের মাধ্যমে এই মৃতপ্রাণ সুন্নাতকে পুনর্জীবিত এবং এই অলীক মানসিকতার কার্যকরী প্রত্যাখ্যান করেন। বুঝিয়ে

দেন যে, এ কাজ ভদ্রতা, সম্মান ও ঈমানী চেতনা পরিপন্থী। তখন থেকে এ কাজ মুসলিম বংশ ও পরিবারগুলোতে ততখানি নিন্দনীয় ও অশোভন থাকে নি, যতখানি ছিল দু'-এক শতক পূর্বে। অবশ্য এখনও অনেক বিধবা মুসলমান নারী স্বেচ্ছায় কিংবা কোনও বাধ্যবাধকতার কারণে দ্বিতীয় বিবাহ থেকে বিরত থাকে, কিন্তু দ্বিতীয় বিবাহের উল্লেখযোগ্য প্রচলন আছে।

বিধবা বিবাহ

বিধবার দ্বিতীয় বিবাহ মুসলমানদের এই ধর্মীয় ও চারিত্রিক অধঃপতনের যুগে যেখানে মুসলমান অভিজাত শ্রেণী পৌত্তলিকতা ও হিন্দু রীতিনীতিতে পুরোপুরি প্রভাবিত হয়ে পড়েছিল, অনেক স্থানে শরী'অত পরিপালনের পরিবর্তে প্রবৃত্তি, প্রথা-প্রচলন ও কুসংস্কারের দৌরাত্ম্য ছিল, বড় নির্লজ্জ, অশ্লীল, অশ্রাব্য কথা-কাজ আর ভদ্রতা-শিষ্টাচার পরিপন্থী বিষয়কে সম্মান ও ভদ্রতা জ্ঞান করা হত। খানী খাঁ তার যুগের শাসক মুহাম্মদ শাহ সম্পর্কে স্বীকার করেন যে,

هندوستاں میاں شرفاء اسلام کہ مراد از اصل مشائخ عرب است – ایں (عقد بوگاں) در هندوستان قبیح وعیب دانس تہ ترک رویہ آباء و اجداد کہ موافق حکم خدا مطابق شرع محمدی است نمودہ اند

হিজরী তের শতকের শুরু পর্যন্ত এই অপছন্দতা ও তুচ্ছতা, নিন্দা ও ঘৃণা মনের মধ্যে এমনভাবে বদ্ধমূল হয়ে ছিল, যেন তা ভারতীয় মুসলমানদের একটি অবিচ্ছেদ্য রীতিনীতিতে পরিণত হয়েছিল। এ বিষয়টি তখন কতখানি গুরুত্ব লাভ করেছিল আর এর বিরোধিতা কতটা কঠিন ছিল, এমনকি কোনো কোনো আলেম এই কু-প্রথার সমর্থন ও সহযোগিতায় নিয়োজিত ছিল এবং এর স্বপক্ষে কুরআন-হাদীস ও যৌক্তিক দলিলী প্রমাণও পেশ করত। এসবের সামান্য ধারণা দেওয়ার জন্য নিচে "বিধবা বিবাহ" সম্পর্কে একটি ফাতওয়া তলব এবং হিজরী শতকের একজন বিশিষ্ট আলেমের কলম থেকে লিখিত জবাব উদ্ধৃত করা হচ্ছে।

প্রশ্ন ঃ কিছু বিষয় ভারতে এ অঞ্চলের ধর্মীয় আলেম এবং ইসলামের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে প্রথম থেকে অদ্যাবধি প্রচলিত। বাহ্যত এগুলো শরী'অত বিরোধী। কিন্তু প্রথা-প্রচলন হিসেবে এসব বিষয় প্রত্যেক শহরের লোকদের মধ্যে রীতিনীতি বলে স্বীকৃতি পেয়েছে। মানুষ সে মতে কাজকর্ম করে। অধিকন্তু এসব রীতিনীতিকে মানুষ শরী'অতের উপর অগ্রাধিকার

দেয়। মোটকথা, সেসব বিষয়ের মধ্যে একটি বিষয় হচ্ছে, বিধবা নারীর দ্বিতীয় বিবাহকে মানুষ দোষণীয় মনে করে। তার দ্বিতীয় বিয়ে থেকে বিরত থাকে। এমনকি বিধবা নারী যদি দ্বিতীয় বিবাহে সম্মত হয়ে যায়, তা হলে তার অভিভাবক ভদ্রতা ও আত্মমর্যাদার দোহাই দিয়ে কখনও এটাকে বৈধ বলে মেনে নেয় না। সুতরাং ধর্মীয় আলেমগণ এবং অকাট্য শরী'অতের মুফতীগণ এ ব্যাপারে কি বলেন? দয়া করে এর যথার্থ জবাব জানিয়ে উপকৃত করুন। আল্লাহ আপনাদের উপর রহম করুন।

জবাব ঃ "আল-ইশ্‌বাহ ওয়ান্নাযায়ের" গ্রন্থে লিখা আছে, ষষ্ঠ আইন হচ্ছে, অভ্যাসরীতি একটি হুকুম। অর্থাৎ এর প্রতি লক্ষ্য রেখে শরী'আতের হুকুম জারী করা হয়। অর্থাৎ অভ্যাসকে ধর্তব্যে আনা শরী'অতের বিধানে শরঈভাবে প্রমাণিত। আইনের এ ধারাটি সাব্যস্ত হয়েছে রাসূলে কারীম সা. এর হাদীসের আলোকে। কেননা রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন, ما راه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن "অর্থাৎ যেসব বিষয়কে মুসলমানগণ (ইসলামী ব্যক্তিত্ব) উত্তম জ্ঞান করবে, আল্লাহর নিকটও তা উত্তম বলে বিবেচিত হবে।" আর হুদা রহ. "শরহে মুগনী" তে লিখেছেন, অভ্যাসরীতি বলতে উদ্দেশ্য সেসব বিষয়, যেগুলো মনে-প্রাণে স্থান করে নেয় বা বদ্ধমূল হয়ে যায়। আর তা সেসব বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত, যেগুলো একাধিকবার সুস্থ রুচিবান লোকদের নিকট গ্রহণযোগ্য হয়েছে।"

(উল্লেখ্য যে, এ স্থানে মুফতী সাহেব সেসব শাখা মাসয়ালা তুলে ধরেছেন, যেগুলোতে ফকীহগণ প্রচলনকে মানদণ্ড সাব্যস্ত করেছেন এবং তদনুযায়ী সিদ্ধান্ত প্রদান করেছেন।)

যখন এই পদক্ষেপের গুরুত্ব বর্ণনা করা হল এবং প্রচলন ও অভ্যাসরীতির অর্থ সুস্পষ্ট হল, আরও জানা গেল, অধিকাংশ মাসয়ালা এরই ভিত্তিতে উৎসারিত হয়েছে। অধিকন্তু প্রচলন শরী'অতের উপর প্রধান্য প্রাপ্ত। শর্ত হল, প্রচলন যেন কুরআন-হাদীসের সুস্পষ্ট নির্দেশনার পরিপন্থী না হয়। সুতরাং প্রথম অবস্থার ক্ষেত্রে জবাব হল, বিধবা নারী তার ঈমানী শক্তি বলে অধিক ধৈর্যশীলা এবং নিজের প্রবৃত্তির উপর প্রবল হয়ে যাবে যে, আত্মমর্যাদাবোধের কারণে দ্বিতীয় বিবাহ থেকে বিরত থাকবে এবং নিজের জন্য দ্বিতীয় বিবাহকে অবৈধ জ্ঞান করবে। কারণ, কাফিররা দ্বিতীয় স্বামীর সাথে বিবাহ আবদ্ধ হওয়াকে তিরস্কার করে এবং একে হীন ও নীচু জাতির বৈশিষ্ট্য বলে মনে করে। সম্মান-ভদ্রতা বিরোধী বলে। কাজেই এমতাবস্থায়

সেসব বিধবা নারীর জন্য আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে সুমহান মর্যাদা ও উঁচু সম্মান হবে আর সামগ্রিকভাবে এসব বিধবা নারীর হযরত রাসূলে কারীম সা. পুণ্যময়ী রমণীগণের অবস্থার সাথে মিল এবং তাদের অনুকরণের মর্যাদা লাভ হতে পারে। অবশ্য বিরত থাকার কারণে ভিন্নতা রয়েছে।

আর ধরে নিলাম, যদি বিধবা নারী দ্বিতীয় বিবাহে সম্মত হয়েও যায় আর তার অভিভাবকের পক্ষ থেকে নিষেধাজ্ঞা আসে, তা হলে এতেও শরী'অতের বিরোধিতা আবশ্যক হয় না। কেননা কোনো কোনো স্থানে কোনও কোনও বিষয়ে তার মধ্যে কাজ করা-না-করার ক্ষেত্রে আত্মমর্যাদাবোধ থাকে এবং ভদ্রতা ও সম্মানে আঘাত লাগে। নিজের প্রতি এমন বিশেষণ যুক্ত হওয়ার (বা এমন দোষে দুষ্ট হওয়ার) আশঙ্কা হয়, যা সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে নেহাৎ নিন্দনীয়। এমতাবস্থায় শরী'অতের সীমা অতিক্রম করাকে উলামায়ে কিরাম উত্তম সাব্যস্ত করেন। সুতরাং এ বিষয়টি সহীহ মুসলিম শরীফে উদ্ধৃত নিম্নোক্ত হাদীস থেকে চয়িত ও উৎসারিত। যথা–

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال سعد بن عباده : ولو وجدت مع اهلى رجلا، لم امسه حتى اتى بأرعة شهداء؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قال كلا والذى بعثك بالحق أن كنت اعاجله بالسيف قبل ذالك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اسمعوا إلى مايقول سيدكم إنه لغيور وانا اغير منه والله اغير منا

অর্থাৎ হযরত আবু হুরাইয়া রাযি. থেকে বর্ণিত আছে। সা'দ ইবনে উবাদাহ রাযি, বলেন– আমি যদি আমার স্ত্রীর সাথে কোনও পরপুরুষকে দেখতে পাই, তবে কি আমি চারজন স্বাক্ষী হাজির করা পর্যন্ত তার প্রতিবাদ করব না? রাসূলে কারীম সা. বললেন, হ্যাঁ তাই। সা'দ ইবনে উবাদাহ রাযি. বললেন, কখনও নয়। শপথ ঐ সত্তার, যিনি আপনাকে সত্যরূপে প্রেরণ করেছেন! আমি তার পূর্বেই এর প্রতিবিধান তরবারী দ্বারা করে ফেলব। অর্থাৎ তাকে হত্যা করব। তখন রাসূলুল্লাহ সা. বললেন, শোন, তোমাদের সর্দারের কথা! সে অত্যধিক আত্মমর্যাদাবোধের অধিকারী। আমি তার চেয়ে বেশি আত্মমর্যাদাবোধের অধিকারী আর আল্লাহ আমার চেয়েও বেশি আত্মমর্যাদাবোধ রাখেন।"

সহীহ বুখারী শরীফেও এ হাদীসখানা সামান্য হ্রাস-বৃদ্ধিসহ বর্ণিত হয়েছে। বলা বাহুল্য, এখানে সা'দ ইবনে উবাদাহ রাযি. আত্মমর্যাদাবোধের

নেহাৎ প্রবলতার কারণে হত্যার পথ গ্রহণ করেছেন। আর এস্থানে হত্যার পথ গ্রহণ শরী'অতের সীমা অতিক্রম করা। কিন্তু রাসূলে কারীম সা. তার প্রশংসা করেছেন এবং বলেছেন- সা'দ একজন আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন ব্যক্তি। আর আমি তার চেয়েও বেশি আত্মমর্যাদাবোধের অধিকারী এবং আল্লাহ পাক আমার চেয়েও অধিক আত্মমর্যাদাবোধের অধিকারী। অপর এক হাদীসে এসেছে, রাসূলে কারীম সা. আরও বলেছেন-

من غيرته حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن

অর্থাৎ আল্লাহ পাক তার আত্মমর্যাদাবোধ থেকেই প্রকাশ্য-গোপনীয় সর্বপ্রকার অশ্লীল-অশালীন কাজ-কর্মকে হারাম ঘোষণা করেছেন। সুতরাং যে অবস্থায় বিধাব নারীর বিবাহ নিছক বৈধ হবে; করা না-করা উভয়ই হবে সমান; প্রবৃত্তির তাড়না বা যুগ সময়ের অবস্থাচিত্র বিবেচনায় জরুরী হবে না। এমতাবস্থায় যদি অভিভাবকদের পক্ষ থেকে বাঁধা-নিষেধ আসে, তা হলে শরী'অতের সীমা লঙ্ঘনে এটা ঐ সা'দ ইবনে উবাদাহ রাযি. এর গৃহীত হত্যার পথ থেকে বড় হবে না।"

সৎকর্মশীল সংস্কার উলামায়ে কিরাম এহেন মানসিকতা এবং মূর্খতাসুলভ আত্মসম্ভ্রমবোধের বিরুদ্ধে নিজের মুখ ও কলম দ্বারা সংস্কার আন্দোলন চালিয়েছেন। খোদ হযরত শাহ আব্দুল আযীয রহ. উপরিউক্ত ফাতওয়ার শক্তিশালী প্রামাণ্য জবাব লিখেছেন এবং এর বিজ্ঞচিত প্রত্যাখ্যান করেছেন। তিনি ফার্সী ভাষায় বিধবা বিবাহের প্রমাণ, মর্যাদা ও উপকারীতা এবং একে হীন-নীচু কাজ জ্ঞানকারীদের তীব্র সমালোচনা, নিন্দা ও প্রত্যাখ্যানে একটি ফলপ্রসূ পুস্তিকা রচনা করেছেন। স্বয়ং হযরত সাইয়্যিদ সাহেব রহ. "সিরাতে মুস্তাকীম" গ্রন্থে এই মৃতপ্রাণ সুন্নাতকে পুনর্জীবিত করা ও এর প্রসারে জোর তাগিদ করেছেন। বিধবা বিবাহকে অর্থাৎ বিধবা নারীর দ্বিতীয় বিয়েকে নিন্দনীয় ও ঘৃণ্য কাজ মনে করাকে হিন্দুদের সংশ্রব-সাহচর্যের কুফল সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু যুগ যুগ ধরে পরিত্যক্ত এ সুন্নাতকে পুনর্জীবিত ও চালু করা এবং শতাব্দির অধিক কালের এ মূর্খতাপূর্ণ ধ্যান-ধারণার মূলোৎপাটনের জন্য এসব সামান্য কিছু রচনা, গ্রন্থনা, সংশোধনী পুস্তিকা ও উপদেশ-বক্তৃতা যথেষ্ট ছিল না। প্রয়োজন ছিল কোনও মহান ব্যক্তিত্ব ও যুগ সময়ের অনুসৃত নেতার স্বয়ং কার্যতঃভাবে এ সুন্নাত পুনর্জীবিত করার ও এই মূর্খাতপূর্ণ ধ্যান-ধারণার অপনোদন এবং এর এমন জোরল দাওয়াত প্রদান, যাতে এর নীচুতাবোধ ও নিকৃষ্টতা মন-মানস থেকে সম্পূর্ণ বেরিয়ে যায়। এর প্রসার ঘটে ব্যাপকভাবে। আল্লাহ

তা'আলা আরও অন্যান্য বিশাল বিশাল সংশোধনী ও সংস্কার কাজের সাথে এই বিশাল সংস্কার কর্মও হযরত সাইয়িদ রহ. এর হাতে নেন এবং অদৃশ্য থেকে এর রসদও ব্যবস্থা হয়েছে। যার প্রভাব শত শত পরিবার এবং হাজার হাজার কবরস্থ নারীর জীবনে পড়েছে।

গায়রুল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা এবং প্রয়োজনাদি পূরণের প্রত্যাশা

রোগ-ব্যাধি নিরাময়ের জন্য দেব-দেবী, মূর্তি ও তাগুতের (বা সকল অবাধ্য শয়তানের) নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা, সাধারণ মুসলমানদের মাঝে যার ব্যাপক প্রচলন হয়ে গেছে– এসব প্রকাশ্য শির্ক ও পথভ্রষ্টতা। খোদাইকৃত কিংবা অখোদাইকৃত পাথরের নিকট নিজের অভাব মোচন ও প্রয়োজনাদি পূরণের প্রার্থনা করা আল্লাহ তা'আলাকে সরাসরি অস্বীকার ও কুফরী। আল্লাহ পাক কোনও কোনও গোমরাহ ও পথভ্রষ্টদের অবস্থাচিত্র তুলে ধরে ইরশাদ করেন,

يريدون ان يتحاكموا إلى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلا بعيدا

"বিরোধীদের বিষয়কে তারা শয়তানের দিকে নিয়ে যেতে চায়। অথচ তাদের প্রতি নির্দেশ হয়েছে, যেন তারা ওকে মান্য না করে। পক্ষান্তরে শয়তান তাদেরকে প্রতারিত করে পথভ্রষ্ট করে ফেলতে পারে।" (সূরা নিসা– ৬০)

প্রায় মহিলারা নিজেদের চরম মূর্খতার কারণে গায়রুল্লাহ কাছে যে সাহায্য প্রার্থনা নিষিদ্ধ, তাতে লিপ্ত এবং সেসব কাল্পনিক নামসমূহে বিপদ-আপদ দূর করার দরখাস্ত করে। শিরক ও শিরকী রীতিনীতি পালনে ব্যতিবস্ত হয়ে ওঠে।

বসন্তরোগ

বিশেষত এই শেরকী আকীদা ও শেরকী কাজকর্ম ও প্রথা-প্রচলনের উপলব্ধি ও পরিদৃষ্ট হয়, যখন তাকে বসন্তরোগ [ভারতীয় নারীদের মাঝে যা সীতলা নামে পরিচিত। অর্থ, ঐ বসন্ত রোগ] আক্রমণ করে বসে। তখন ভাল-খারাপ সকল নারীকে এই গণমূর্খতা ও কুফরীতে আক্রান্ত দেখা যায়। এই শিরকের সূক্ষ্মতা থেকে মুক্ত-নিরাপদ এবং এর প্রথা প্রচলনগুলোর মধ্য হতে কোনও প্রথার প্রতি এসময় অগ্রসর হয় নি– এমন কোনও নারীকে পাওয়া কঠিনই বটে। তবে মহান আল্লাহ যাকে নিরাপদ রাখেন।

কাফিরদের উৎসব দিনের সম্মান প্রদর্শন এবং তাদের অভ্যাস রীতির অনুকরণ

অনুরূপভাবে হিন্দুদের উৎসব, পূজার দিনগুলোর সম্মান প্রদর্শন এবং ইয়াহুদীদের প্রচলিত প্রথার দিনসমূহ পালন করাও শিরক ও কুফরকে আবশ্যক করে। সুতরাং হিন্দুদের পূজার দিনগুলোতে অজ্ঞ মুসলমান বিশেষত তাদের স্ত্রীগণ হিন্দুদের প্রথা পালন করে এবং নিজের ঈদ উদযাপন করে। কাফিরদের উপহার উপঢৌকনের মতো নিজেদের পক্ষ থেকে আপন কন্যা ও বোনদেরকে সম্পূর্ণ মুশরিক-পৌত্তলিকদের ধাচে উপহার-উপঢৌকন প্রেরণ করে। নিজেদের হাড়ি-পাতিল, পাত্র-পেয়ালাগুলো (একেবারে কাফিরদের মত) রঙিন করে। লাল পায়েস ভরে ভরে প্রেরণ করে। এই উৎসবের দিন ও সময়গুলোর বিরাট যত্ন নেয়। এসবই শির্ক এবং ইসলাম ধর্মেও সাথে কুফরী।

পীর ও বিবিদের উদ্দেশ্যে রোযা রাখা

এরই মধ্যে নারীদের রোযাও রয়েছে। যা তারা পীর ও রাণীদের উদ্দেশ্যে রাখে। অধিকাংশ তার নাম নিজের পক্ষ থেকে বানিয়ে তাদের নামে তার নিয়তে রাখে। ইফতারের সময় প্রত্যেক রোযার জন্য বিশেষ পন্থা অবলম্বন করে। রোযার জন্য দিন-ক্ষণও ধার্য করে। নিজের লক্ষ্য উদ্দেশ্যগুলো সেসব রোযার সাথে সম্পৃক্ত করে। আর সেসব রোযার মাধ্যমে পীর ও রাণীদের নিকট নিজের প্রয়োজনাদী পূরণের প্রত্যাশা করে। মনে করে, তাদের পক্ষ থেকে আমাদের প্রয়োজনাদি পূরণ হয়। এটা ইবাদতে শির্ক; গায়রুল্লাহর ইবাদত ও দাসত্বের দোহাই দিয়ে নিজের প্রয়োজনাদি গাইরুল্লাহর কাছে যাঞ্চা করা। এ কাজের মন্দতা ভালভাবে বুঝা উচিত। হাদীসে কুদসীতে এসেছে, আল্লাহ তা'আলা বলেন– "রোযা কেবল আমার জন্য আর আমিই এর প্রতিদান দিব।" অর্থাৎ রোযা একান্তই আমার জন্য। এতে অন্য কারও আদৌ অংশীদারত্ব নেই। যদিও কোনও ইবাদতেই আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা জায়েয নেই। তবে রোযার বিশেষত্ব ও নির্দিষ্টতা এ ইবাদতের গুরুত্বের কারণে, তাই যত্ন সহকারে এ ইবাদতে শির্ককে প্রত্যাখ্যান করতে হবে।

এটা কেবলই একটি চাতুর্য ও ধৃষ্টতা। যেসব মহিলা (এ ইবাদতের নিকৃষ্টতা বর্ণনা করলে) বলে, আমরা এই রোযা রাখি আল্লাহর জন্য আর এর সাওয়াব পীরদেরকে সমর্পন করি– তারা যদি নিজ দাবীতে সত্যবাদী

হয়, তা হলে রোযাগুলোর জন্য দিন-তারিখ ধার্য করার প্রয়োজন কি?" আবার পানাহারে বিশেষত্ব এবং ইফতারে বিভিন্ন নিকৃষ্ট পন্থা ও শিষ্টাচার ঠিক করার প্রয়োজনই বা কি? অধিকাংশ সময় ইফতারকালে তারা হারাম কাজের শিকার হয়। কোনও হারাম দ্রব্য দ্বারা ইফতার করে। বিনা প্রয়োজনে হাত পাতে। ভিক্ষে চায় এবং এর দ্বারা ইফতার খোলে। নিজের প্রয়াজনাদী পূরণ ও অভাব মোচনকে এই হারাম কাজের সাথে সম্পৃক্ত মনে করে। এটা খোদ নিজেই পথভ্রষ্টতা এবং নিছক শয়তানের প্রবঞ্চনা। আল্লাহ্ তা'আলাই এসব বিষয় থেকে রক্ষাকারী। (মাকতূবঃ ৩/৪১)

অনুরূপভাবে সম্মানসূচক সিজদার নিষিদ্ধতা সম্পর্কে তাঁর একাধিক শক্তিশালী ও খোলা পত্র রয়েছে। তন্মধ্যে হতে কয়েকটি উদ্ধৃতি নিচে উল্লেখ করা হল। তিনি তার জনৈক মুরীদ মীর মুহাম্মদ নু'মানের নামে একবার পত্রে লিখেন–

"কোন কোনও ফিকাহবিদ যদিও শাসকবর্গের জন্য কুর্ণিশ বা সম্মানের সিজদাকে বৈধ সাব্যস্ত করেছেন, তথাপি মান্যবর প্রধান শাসকের জন্য যথোচিত হল, এ বিষয়ে মহান আল্লাহ্র দরবারে বিনয়-নম্রতার সাথে কাজ করা এবং এই চরম নমনীয়তা ও অপদস্থতাকে আল্লাহ্ ছাড়া কারও জন্য বৈধ জ্ঞান না করা। আল্লাহ্ পাক তাদের সম্মুখে একটি বিশ্বকে অনুগত করে দিয়েছেন এবং তাদের মুখাপেক্ষী বানিয়ে দিয়েছেন। এই সুমহান নেয়ামতের মূল্যায়ন করা উচিত। আর এরূপ পর্যায়ের বিনয়-নম্রতাকে যা চূড়ান্ত অক্ষমতা, দুর্বলতা ও অসহায়ত্বকে প্রকাশ করে, ঐ সুউচ্চ দরবারের জন্য সুনির্দিষ্ট রাখতে হবে। এখানে তার সঙ্গে কাউকে শরীক করবে না। যদিও একদল এ কাজের বৈধতা সাব্যস্ত করেছেন, কিন্তু সেসব শাসকদের স্বয়ং নিজের বিনয় ও শিষ্টাচারের কারণে এর অনুমতি না-দেওয়া কর্তব্য। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন–

هل جزاء الإحسان إلا الإحسان

"অনুগ্রহের প্রতিদান অনুগ্রহই হয়ে থাকে।" (মাকতূব ঃ ২/৯২)। হযরতের আরেক মুরীদ শাইখ নিযামুদ্দীন খানেসারীর পত্রে তিনি লিখেন– মানুষ বলেছে, তোমাদের কোনও কোনও খলীফাকে তাদের মুরীদগণ সিজদা করেন। তারা কদমবুছির উপরও সন্তুষ্ট হয় না। এ কাজের নিকৃষ্টতা ও জঘন্যতা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট। একে বন্ধ কর। আর নিষেধাজ্ঞায় পূর্ণ কঠোরতা ও গুরুত্বসহ কাজ করো। এ ধরনের কাজ থেকে বিরত থাকা

প্রত্যেক লোক থেকেই কাম্য। বিশেষত ঐ ব্যক্তি থেকে, যিনি নিজেকে আল্লাহর সৃষ্টির সেবায় ও পথপ্রদর্শনের আত্মনিয়োজিত করেছেন। এ ধরনের কাজ থেকে এ ব্যক্তির বিরত থাকা একটি গুরুতর প্রয়োজনাদির অন্তর্ভুক্ত। কারণ, তার অনুসারীগণ তার কাজ-কর্মের অনুকরণ করবে এবং বিপদে পতিত হবে।" (মাকতূব ঃ ১/২৯)।

নারীর জীবন-যাপন

আমাদের ইসলাম আল্লাহর অনুগ্রহ-দান

আল্লাহর শোকর! তিনি আমাদেরকে মুসলমান বানিয়েছেন। মুসলিম পরিবারে, মুসলমান ঘরে জন্ম দিয়েছেন এবং ঈমান নসীব করেছেন। আমরা ভদ্র ঘরে চোখ খুলেছি। তারপর আল্লাহ পাকের আরও অনুগ্রহ হল, ধর্মপ্রাণ ধর্মভীরু ঘরে আমাদের লালন-পালন হয়েছে। আরও বড় অনুগ্রহ করেছেন, তিনি পুরুষদের মাধ্যমে তাবলীগ ও দ্বীন প্রচারের কাজ শুরু করিয়েছেন। এর বরকত-কল্যাণধারা পৌঁছে গেছে ঘরে ঘরে। আর এখন তো আল্লাহর অপার অনুগ্রহে ঘরে ঘরে আমাদের মা-বোনেরা দ্বীন প্রচারের কাজ করছে। এর কল্যাণে আমরা আজ ভালমন্দ বুঝতে শুরু করেছি। হারাম-হালাল, পাপ-পুণ্য, জায়েয-নাজায়েয, বৈধ-অবৈধ, কোন কাজে আল্লাহ তা'আলা রাজি বা অসন্তুষ্ট হোন –তার কিছু বুঝ-জ্ঞান আমাদের হচ্ছে। কৌতুহলও জাগ্রত হয়েছে, এ জীবনে কোন্ কোন্ জিনিস আল্লাহ ও রাসূলের নিকট পছন্দনীয় আর কোন্ কোন্ জিনিস অপছন্দনীয়? সমাজ ব্যবস্থা কেমন হবে? আচার-অনুষ্ঠান কেমন হবে? ঘরে কিভাবে থাকতে হবে? পোশাক-পরিচ্ছদ কোন্‌টি শরীয়তসম্মত? কোনটি শরী'অত মাফিক? কোনটি শরী'অত বিরোধী? এসব বিষয় এখন ঘরে ঘরে চর্চা হচ্ছে। ধর্মীয় বই-পুস্তক পাঠ করা হচ্ছে। আমাদের ভারত-পাকিস্তানে তো আল্লাহর অনুগ্রহে এখন এসব কাজ অনেক বৃদ্ধি পাচ্ছে। দ্বীন-ধর্মের বুঝ-জ্ঞান সৃষ্টি হচ্ছে। এখানে যেসব পরিবার আগে থেকে বসবাস করছে, তাদের সম্পর্কে তো আমরা বলতে পারি না। কিন্তু এখন যেসব পরিবার বিশেষত গুজরাট এলাকার, তাদের মধ্যে অনেক বরকত রয়েছে। আমাদের গুজরাটের ভাইগণ, সূরত জেলা, ওড়োচ জেলা ইত্যাদির ভাইগণ তাবলীগের কাজ করছেন। অনেক মহিলারাও বাইআত হচ্ছে। নিযামুদ্দীন যেতে শুরু করেছে। আল্লাহ পাকের অপার অনুগ্রহ-দয়ায় এখানেও অনেক বরকত ও কল্যাণ রয়েছে।

পাশ্চাত্য সভ্যতার দর্শন "খাও-দাও ফুর্তি কর"

আপনারা সবাই এদেশে এসেছেন। কেউ নিজের স্বামীর সাথে, নিজের ভাইয়ের সাথে, নিজের পিতামাতার সাথে। এখানে দীর্ঘদিন যাবৎ বরং শত শত বছর ধরে আল্লাহর কোনও ভয়, লজ্জা-শরম, ভদ্রতা ও সভ্যতা নেই। এখানে কেবল একটিই কাজ রয়েছে "খাও দাও ফূর্তি কর।" সুতরাং তাদের ওখানে ইংরেজদের মধ্যে চর্চা হল, খাও দাও ফূর্তি কর, আমোদ-প্রমোদে মত্ত থাকো। এই মত্ততা, এই উন্মাদনা তাদের নিকট জীবনের মূলমন্ত্র। যাতে মানুষ মাতাল থাকবে, উন্মাদ-মত্ত থাকবে। মৃত্যুর কথা ভুলেও কখনও স্মরণ হবে না। ভাববেই না যে, আমাদেরকে মরতে হবে। আমাদেরকে আল্লাহর সামনে দণ্ডায়মান হতে হবে। এখানে মানুষ যে স্বাদ নিচ্ছে, যে উল্লাসে মেতে থাকছে, তার জবাব দিতে হবে। যে রঙতরঙ্গে নাচছে, তার সব কিছুর হিসাব দিতে হবে অক্ষরে অক্ষরে। এসব বিষয় এমনভাবে বিস্মৃত হয়ে গেছে যে, স্মরণ করালেও হুঁশ ফিরে না।

এ দুনিয়ায় তাদের জীবন দর্শন হল, মানুষ তার মৃত্যুকে ভুলে থাকবে। পরকালকে ভুলে থাকবে। আল্লাহ-রাসূলকে ত্যাগ করবে। কেবল উৎকৃষ্টতর সুস্বাদু খাবার-দাবার, উন্নততর পোশাক-পরিচ্ছদ, সুঠাম স্বাস্থ্য ও দীর্ঘস্থায়ী সুস্থতা লাভ, যৌবনেরর স্বাদ গ্রহণ আর ধন-সম্পদ ও ভোগ-বিলাসিতায় মাতাল-মত্ততাই স্মরণ রাখবে। ব্যাস, এটাই এখানের জীবন দর্শন। কিন্তু আল্লাহ পাকের অশেষ অনুগ্রহ-দয়ায় আমাদের সম্পর্ক যে ধর্মের সাথে, যে দেশের সাথে, যে লোকদের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক, ওঠাবসা ও চলাফেরা তাদের জীবন দর্শন, জীবন পদ্ধতি এটা নয়। তাদেরকে তো বলা হয়েছে, "দুনিয়া কাফিরদের জান্নাত আর মুসলমাদের জন্য জেলখানা।" জেলখানায় মানুষ উল্লাস ফূর্তি করে না। জেলখানায় মানুষ মুক্ত-স্বাধীন থাকে না। যেন ঘুরতে এসেছে, ব্যাস ঘুরাফেরা করে চলে যাবে। খেতে এসেছে তো খেয়ে চলে যাবে। মনে যা আসল, মনে যা চাইল, ব্যাস তাই করতে থাকবে। কোনও বাঁধা-নিষেধ নেই। কোনও বাধ্যবাধকতা নেই। জেলখানায় তো ঘুরাফেরার স্থানও সুনির্দিষ্ট আর খাবার-দাবারের পরিমাণও মাপাঝোপা। খেতে মন চায় একটা, পাওয়া যায় অন্যটা। পছন্দ থাকে একরকম, খাওয়ানো হয় অন্য কিছু। কখনও কিছু পরিধানের ইচ্ছে হয়, কখনও ভ্রমণ-বিনোদনের ইচ্ছে হয়, কখনও ইচ্ছে হয় নির্মল বাতাস খেতে। কিন্তু এটা তো চার দেয়ালের বন্দীশালা, এটা তো

জেলখানার কুঠরী, অন্ধকার প্রকোষ্ঠ। আর কাফিরের জন্য? ব্যাস! বিরাট এক হাই পার্ক, বিরাট এক উদ্যান, বিরাট এক বাগান। চাইলে শুতে পারে, চাইলে বসতে পারে, চাইলে হাটতে পারে, চাইলে ঘুরতে পারে, মনের যত স্বাদ মিটাতে পারে, চাইলে উলঙ্গও ঘুরতে পারে, চাইলে হৈ চৈ কোলাহল করতে পারে, চাইলে স্থির থাকতে পারে, ষাড়ের মতো চলতে পারে, পানাহার করতে পারে –বলার কেউ নেই। জিজ্ঞাসার কেউ নেই। সুতরাং "দুনিয়া কাফিরের জন্য জান্নাত আর মুমিনের জন্য জেলখানা।"

দুনিয়াতে থাক তুমি বিভূঁই-পথিকের মত

রাসূলে কারীম সা. ইরশাদ করেছেন

كن فى الدنيا كأنك غريب او عابر سبيل–

দুনিয়াতে এমনভাবে থাক, যেন তুমি বিভূঁই পরবাসী কিংবা পথচারী মুসাফির। যে মুসাফির, যে পথিক, কোথাও তার মন লাগে না। কোনও স্থানকে সে নিজের ঘর বানায়। কোনও স্টেশনে স্থির থেমে থাকে না। দেখে সবই। ছেড়ে যায় সব জায়গা। কিন্তু নিজের বাড়িঘর ভুলে না। নিজের ঠিকানা ভুলে না। নিজের দেশকে ভুলে না। কোথেকে যাচ্ছে, কোথায় কতদূর যাচ্ছে। আর যেখানে যাচ্ছে, সেখান থেকে কাজ শেষে তৎক্ষণাত ফিরে আসতে হবে। পাখি তো সারাদিন উড়ে বেড়ায়। যেমন– কবুতর, ময়না, টিয়া সবাই দিনভর উড়ে বেড়াতে থাকে এবং দিনভর নানা জায়গা থেকে আহার্য কুড়াতে থাকে। কিন্তু নিজের গন্তব্য ঠিকানাকে, নিজের বাসাকে ভুলে যায় না। যেখানেই উড়ে চলে যাক, সন্ধ্যায় ঠিক নিজের ঘরে ফিরে আসে। নির্জন কোনও গাছের শাখায়, ঐ পত্র-পল্লব আর খড়কুটোয় তৈরী বাসায়। দিনভর চাই কোনও রাজমহলে গিয়ে বসুক, কোনও ধনীক-বনিকের প্রসাদে উড়ে পড়ুক, কোনও সুউচ্চ অট্টালিকার উপরে নিজের আহার্য খুঁজে বেড়াক, সন্ধ্যা হতেই নিজের ঐ খড়কুটোর বাসা স্মরণ হয়ে গেল। মনে পড়ল বাচ্চাদের কথা। ব্যাস, তৎক্ষণাৎ সেখানে উড়ে চলে আসে। মুমিনের অবস্থাও এরূপ। দুনিয়ায় মুমিন সারাদিন ঘুরাফেরা করতে থাকবে। কাজকর্ম করবে। দোকানে বসবে। দশ-বারো ঘণ্টা ডিউটি করবে। কিন্তু তার আসল বাসস্থান ভুলবে না। তার করবস্থানের নির্জন খুপড়িকে ভুলবে না। সেখানে তাকে শত শত, হাজার হাজার বছর ঘুমাতে হবে। সে পরকাল বিস্মৃত হবে না। সুতরাং যখন সন্ধ্যা হল অর্থাৎ যখনই দুনিয়ার কাজকর্ম শেষ হয়ে এল, তখন নিজের আসল বাসস্থানের পথ ধরল।

মুসলমান যেন তার আসল নিবাস না ভুলে

মুসলমানদের জীবন এমনই হওয়া উচিত। আমাদের জন্য ভারত, বাংলাদেশ, ফ্রান্স, জার্মানী এবং বড় বড় দেশ আমেরিকা, কানাডা সবই সমান। আমরা যেখানেই থাকি, নিজের "সাঁজের ঘর" "সন্ধ্যা নিবাস" (কবরদেশ) যেন ভুলে না-যাই। চাই সেটা রাজপ্রাসাদ, রঙমহল আর বিলাস ভবন কিংবা ঝুপড়ি-খুপড়ি কুড়ে ঘরই হোক। কিন্তু আমাদের মন আল্লাহর প্রতি নিবিষ্ট থাকতে হবে। আমাদের দেহ-কায় যেখানেই থাকুক, আমরা যেন কখনও আসল নিবাস "সাঁজের ঘর" না-ভুলি। যেখানে আমাদেরকে বছরের পর বছর, যুগ যুগ ধরে থাকতে হবে, এটা ঐ কবরের নির্জনাবাস। যেখানে আছে অন্ধকার। ঐ কবরস্থান, যা নিভৃত স্থানে কিংবা ভুতুড়ে ঝোপ-জঙ্গলে, শহরের লোকায় জনবসতী থেকে বহু দূরে। যেখানে না শহরের/পাড়ার শিশুদের খেলাধূলা-হৈচৈ শোনা যায় আর না বড়দের কোলাহল। সেখানে তো আছে মানুষ আর তার আমল। যেসব নামায একটু-আধটু পড়েছে, যে কালেমাগুলো পড়েছে, দু'আ-দরূদ পড়েছে, ওখানে সেগুলোই কাজে আসবে। এসবের প্রতিই সেখানে দৃষ্টি নিবদ্ধ হবে, মনোযোগ হবে। এসবই সেখানকার বিছানা-বালিশ, এগুলোই সেখানের খাট-পালঙ্ক। তা-ই প্রদীপ-বাতি। এসবই সেখানের আলোকবর্তিকা, সেখানের অবকাশ ও প্রশস্ততা। নতুবা সেটা নির্জন সংকীর্ণ এক খুপড়ি মাত্র। যেখানে মানুষ পার্শ্ব ফেরাতে বা এপাশ-ওপাশ করতে পারবে না। সেখানে যা কিছুই উপকারে আসবে, তা ঈমানের নূর ও আলো, আল্লাহর নাম কাজে আসবে। জীবনে আল্লাহ পাকের সাথে যে সম্পর্ক স্থাপন করা হয়েছে, তা কাজে আসবে। আজ এখানে যদি নামাযে মন বসে থাকে, তবে সেখানে মন খুশি ও প্রফুল্ল হবে। আর যদি কালিমা, নামায, ঈমানের বিষয়ে মন না-বসে, মানসিকতা সব সময় ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত থাকে বরং ঐ পোশাক-পরিচ্ছদে, স্বর্ণালঙ্কারে, পানাহারে, ভোগ-বিলাসে, বাড়ি-গাড়িতে যদি মন ডুবে থাকে, তা হলে সেখানে থাকবে ভয়-ভীতি। "সেখানে তো এসবের কোনও জিনিসই বিদ্যমান থাকবে না। এসব জিনিস আর কি থাকবে– সেখানে বাবাও সাহায্যের জন্য, মাও সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য, কন্যাও সেবার জন্য, পুত্রও সদ্ব্যবহারের জন্য উপস্থিত থাকবে না।" সেখানে না-থাকবে মায়ের স্নেহ-মমতা, না পিতার দয়া-অনুগ্রহ আর না-থাকবে সন্তানের সৌভাগ্য না কন্যাদেও সেবা-শুশ্রূষা। সেখানে থাকবে

কেবল ঐ এক আল্লাহর নাম। সেখানে আল্লাহর নামই উপকারে আসবে। ঈমানের জ্যোতির্ময় আলোই কাজে আসবে। নামায-রোযার নূর কাজে আসবে। কুরআনের আলো কাজে আসবে। আর যে আল্লাহর যিকির করেছে, ইবাদত করেছে, ব্যাস সেদিন সেখানে তা-ই কাজে আসবে।

হাদীস শরীফে আছে, "কবর জান্নাতের উদ্যানসমূহের একটি উদ্যান অথবা জাহান্নামের গর্তসমূহের একটি গর্ত।" উপকারী যেসব জিনিস রয়েছে, সেখানে স্বয়ং কিছু নয়। এ জগতের নেক আমলগুলোই সেখানে উদ্যান হয়ে যাবে। যেসব নেক আমলের দ্বারা জান্নাতে বাতাস প্রবাহিত হবে। হাসীসে এসেছে, "কবরে জান্নাতের জানালা খুলে দেওয়া হবে। সেখানে তাদের নিকট আগে থেকেই জান্নাতের বাতাসের স্পর্শ লাগবে। সুগন্ধি আসবে।" এতে বুঝা যায়, এটাই আমাদের ঠিকানা। হাদীস শরীফে আরও এসেছে, মুত্যুর সময় এবং মৃত্যুর পরে সে তার জান্নাতের বাসস্থান দেখতে পাবে। দেখে নিবে, তার ঠিকানা জান্নাত নাকি জাহান্নাম। হাদীস শরীফে আরও আছে, "কারও যদি নেক আমল থাকে, সঠিক ঈমান নিয়ে কেউ মারা যায়, তা হলে তাকে বলা হবে- نم كنومة العروس ঘুমাও; যেভাবে বর ঘুমায়! অন্যথায় হতাশ উদ্ভ্রান্তের মতো।

কবরের ভাবনাই আসল ভাবনা

এ ঘরের চিন্তা-ফিকির করা উচিত। যেসব জিনিস সেখানে কাজে আসবে, তার চিন্তা করা উচিত। সেখানের অবস্থা হল এরূপ যে, শৈশবের আসবাবপত্র যৌবনে কাজে আসে না। যৌবনের আসবাবপত্র বার্ধক্যে কাজে আসে না। শৈশবের কাপড়-চোপড় যৌবনে পরা যায় না আর যৌবনের কাপড়-চোপড় বুড়াকালে পরা শোভা পায় না। তা তো ছিল যৌবনের সৌখিনতা। বুড়াকালের কাপড় হয় ভিন্ন রকমের। আর আজ তো দু'মাস পূর্বের কাপড় এখন কাজে আসে না। এখানে ইউরোপের উপর তো এমন বিপদ চেপে বসেছে এবং এর ফলে গোটা বিশ্বে মাস দু'মাসে ফ্যাশন বদলাতে থাকে। প্রথম ফ্যাশন অনুযায়ী যেসব কাপড় তৈরী করা হয়েছিল, ফ্যাশন পরিবর্তনের পর সেগুলোই এখন ওল্ড মডেলের; একেবারে পুরনো জীর্ণশীর্ণ মনে হয়। সেসব পরিধান করে চলাফেরা, বিয়ে-শাদীতে যাওয়া দোষণীয় মনে করা হয়। এমন অর্থহীন সভ্যতা হকচকিতকারী, বিমুখকারী এবং দ্রুত পরিবর্তনশীল -এর উপর যদি মানুষ মন লাগায়, দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে, তা হলে এর চেয়ে নির্বোধ আর কে হতে পারে?

হযরত ইবরাহীম আ. এর ঘটনা

হযরত ইবরাহীম আ. যখন তারকা দেখলেন, বললেন– এটা বড় চমৎকার। বিস্ময়ের কিছু নয় যে, এটাই বিশ্বস্রষ্টা। আর যখন তারকা অদৃশ্য হয়ে গেল এবং ডুবে গেল, তখন তিনি বললেন, এটা তো কিছুই নয়। এর মোটেই ভরসা নেই। তারপর চাঁদ দেখে বললেন, সুবহানাল্লাহ্! চাঁদের কী উপমা! কেমন আলো! গোটা পৃথিবী আলোকিত। গোটা পৃথিবীতে চাঁদের আলো ছেয়ে আছে। তিনি বললেন, সম্ভবত এটাই সৃষ্টিকর্তা হবে। এরপর চাঁদ ডুবে গেলে তিনি বলতে লাগলেন, এটাও কিছুই নয়। তারও কিছুই সাধ্য নেই। এরও কোনও ভরসা নেই। তারপর যখন সূর্যোদয় হল আর তিনি এর উজ্জ্বল আলো দেখলেন এবং দিন হল, তখন বলতে লাগলেন, বাহ্! এর চেয়ে বেশি উজ্জ্বল কোনও আলোই তো নেই। তারকাও এর সম্মুখে তুচ্ছ। চাঁদও এর সামনে লজ্জিত। সুতরাং এ সূর্যই সূর্য। এর দ্বিতীয়টি আর নেই। অনন্তর যখন সূর্যও অস্ত যেতে লাগল, তখন তিনি বলতে লাগলেন– لاأحب الافلين আমি এরূপ অদৃশ্যমান, এরূপ অস্তগমনকারী, এরূপ অর্থহীন এবং মুখ-চক্ষু বন্ধকারীর সঙ্গে আমার মন লাগাতে পারি না। এগুলোতে মনোযোগ দিতে পারি না। যার সাথে মন লাগব, যাতে মনোযোগ দিব, তা হতে হবে "চিরঞ্জীব, চিরন্তন। "তিনি হবেন অনাদী অনন্ত সত্তা, সদা সর্বদা সঙ্গে বিদ্যমান।"

হযরত ইবরাহীম আ. এর শিক্ষা স্মরণ রাখুন

হযরত ইবরাহীম আ. যিনি আমাদের আদি পিতা ও পূর্বপুরুষ, আমাদের পয়গম্বর এবং সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মাদ সা. এর ঊর্ধ্বতন দাদা, তিনি্ শিক্ষা দিয়েছেন– যা কিছু হবে নশ্বর, ভঙ্গুর, অস্থায়ী, অর্থহীন এবং চক্ষু প্রত্যাবর্তনকারী, তার সাথ মন লাগাবে না! তার প্রতি মনোযোগ দিবে না। যৌবনও এরূপ ধন আর শক্তিও তদ্রুপ, জীবনও তদ্রুপ, দুনিয়াও তদ্রুপ এবং ফ্যাশনও তদ্রুপ। এদের প্রত্যেকটিই মুখ পরিবর্তনকারী, নশ্বর-অস্থায়ী, সঙ্গত্যাগকারী, বিকৃতিযোগ্য, ভঙ্গুর, অকৃতজ্ঞ, অর্থহীন, প্রবঞ্চনা; এসবের সাথে মন লাগানোর চেয়ে বড় নির্বুদ্ধিতা আর নেই। কেউ যদি ভাবে, তারুণ্যই তারুণ্যের কাজ করা উচিত। কোনও কিছুর তোয়াক্কা না-করা উচিত। এই তারুণ্য, এই যৌবন আর ফিরে আসবে না। যখন বার্ধক্য আসতে থাকবে, এই রূপ-জৌলশ থাকবে না। এই আকার-আকৃতি; এই রঙ-লাবণ্য থাকবে না। তখন আমাদের উপলব্ধি হবে, আমারা এই

অকৃতজ্ঞ তারুণ্যের কারণে ঐ রহমান ও রাহীম, পরম করুণাময় ও অতিশয় দয়ালু আল্লাহ তা'আলার অবাধ্যতা করেছি। আল্লাহর রহমত, তার দয়া-অনুগ্রহ কখনও সঙ্গ ছাড়ে না। তা সব সময়ই উপকারে আসে। তা আলোয়-অন্ধকারে, ধনাঢ্য কি দারিদ্র্যে, যৌবনে কি বার্ধক্যে, স্বদেশে ও প্রবাসে সর্বত্র সর্বদা সাথে থাকে। الله معكم আল্লাহ তোমাদের সঙ্গে আছেন। আল্লাহ পাক বলেন, যদি তোমরা তিনজন হও, তবে চতুর্থজন আল্লাহ; তোমরা চারজন হলে পঞ্চমজন আল্লাহ। কম হও বা বেশি, ঘরে থাক কিংবা বাজারে, আল্লাহ সর্বত্রই সঙ্গে থাকেন। আল্লাহ তা'আলা সব জায়গায় সবসময় বিরাজমান। প্রত্যেককেই দেখেন। প্রত্যেকেরই সাহায্য করেন। তিনি সবকিছু প্রত্যক্ষকারী, সকলের সাহায্যকারী। আল্লাহ পাক বলেন– وإذا سألك عبادى عنى فانى قريب

আমার বান্দা যখন আমার সম্পর্কে আপনাকে জিজ্ঞাসা করে, আল্লাহ কোথায়? দূরে না নিকটে? আপনি বলে দিন, নিশ্চয়ই আমি নিকটে। তিনি প্রত্যেক আহ্বানকারী, প্রত্যক প্রার্থনাকারী ও প্রত্যেক যাঞ্চাকারীর ডাক শোনেন। সুতরাং এমন আল্লাহর সাথে, এমন দয়াময় প্রভূর সাথে, এমন করুণাময় মালিকের সাথে, এমন স্নেহশীল, এমন দয়াপরবশ, এমন দাতা, এমন ত্রাতা, এমন সাহায্যকারী, এমন সহায়তাকারী, এমন ক্ষমাশীল, এমন সহনশীল, এমন রক্ষক, এমন পরিত্রাণকারী, এমন শক্তিদাতা, আশ্রয়দাতা আল্লাহর সাথে মন লাগাবেন নাকি আপনার অকৃতজ্ঞ যৌবনের, না ভঙ্গুর রূপ-লাবণ্যের, না অকৃতজ্ঞ সঙ্গী-সাথীদের, নাকি অকৃতজ্ঞ বন্ধুদের, না মিথ্যা রচনাকারী বোন, বান্ধবী ও সমবয়সী নারীদের এবং এমন ফ্যাশন ও চাকচিক্যের সাথে, যা সকালে আছে তো সন্ধ্যায় অস্তিত্বহীন আর সন্ধ্যায় আছে তো সকালে বিলীন, তার সাথে মন দিয়ে আল্লাহর অবাধ্যতা করবেন! এর চেয়ে বড় নির্বুদ্ধিতা ও মূর্খতা আর কি হতে পারে! ঐ আল্লাহকে কেন ভালবাসবেন না, কেন তার প্রতি মনোনিবেশ করবেন না, যিনি সর্বদাই আমাদের সঙ্গে আছেন। এখানেও তিনি কাজে আসবেন। কবরেও তার সাহায্য-ক্ষমা কাজে আসবে। আর মৃত্যুর পর হাশর মাঠে তো কেবল তিনি থাকবেন; অপর কেউই তো নেই। অতএব আমার বোনেরা! আমার মায়েরা! ঐ আল্লাহর সাথে সুসম্পর্ক তৈরী করা উচিত, তার সাথে নিবিড় প্রেম সৃষ্টি করা উচিত। তার সাথে এমন চিন-পরিচয় ও ঘনিষ্টতা গড়ে তোলা প্রয়োজন, তার উপর এমন ভরসা ও আস্থা-বিশ্বাস হওয়া উচিত,

তদ্রূপ তার সঙ্গে এমন সম্পর্ক থাকা উচিত, যাতে মানুষের সব সময় একই চিন্তা থাকে, সর্বদা উৎসাহ-উদ্দীপনা থাকে, আমাদের সঙ্গে আল্লাহ আছেন। কেউ আমাদের কি বিকৃতি ঘটাতে পারে? আমাদের ধন-সম্পদ যদি কেউ ছিনিয়েও নেয়, তবুও তো আমাদের ঈমান রয়েছে, তা কেউ ছিনিয়ে নেয় নি; কভু নিতেও পারে না। যদি আমাদের যৌবন, আমাদের তারুণ্য নিঃশেষ হয়ে যায়, তবু ঈমান তো নিঃশেষ হয় নি। আল্লাহর সামিপ্য; আল্লাহর নৈকট্য তো ছুটে যায় নি। ধন-সম্পদ যদি মুখ ঢেকে ফেলে এবং অকৃতজ্ঞতা করে, যদি স্বামীও অবমূল্যায়ণ করে, যদি সঙ্গী-সাথীরাও অকৃতজ্ঞতা করে, তবু কোন দুঃখ নেই, কোনও কষ্ট নেই। আমাদের আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন। সুতরাং সবকিছুই আমাদের সাথে আছে। গোটা বিশ্ব আমাদের সঙ্গে আছে।

বাদশাকে পেলে তো সবই পেলাম

আমার ভগ্নিগণ ও মুসলিম রমণীগণ! একটি ঘটনা আছে, একবার এক বাদশা খুশির আতিশয্যে প্রজাদেরকে ঘোষণা দিলেন– আজ যে লোক যে জিনিসেই হাত রাখবে, সেটিই তার হয়ে যাবে। বাদশার অনেক বড় আনন্দের মুহূর্ত ছিল। হয়তো কোন পুত্র জন্ম হয়েছিল কিংবা কোন দেশ জয়ের সুসংবাদ এসেছিল। কাজেই তিনি খুশির আতিশয্যে বলে ফেললেন– যে জিনিসে যে হাত রাখবে, সেটি তার হবে এবং তার মালিকানাধীন হয়ে যাবে। ব্যাস, আর দেরি কিসের! সকলেই তৈরী হয়ে গেল। সেখানে যেসব দাস-দাসী, মন্ত্রী-আমলা, রক্ষী এবং রাজ্যের যত কর্মচারী-কর্মকর্তা উপস্থিত ছিল, সবাই তৈরী হয়ে গেল। এবার কেউ বাদশার সিংহাসনের উপর হাত রাখল, কেউ হাত রাখল বিছানার উপর– যা অনেক উন্নত, দামী স্বর্ণরূপার তৈরী ছিল। কেউ হাত রাখল উন্নত ঝাড়বাতির উপর আবার কেউ হাত রাখল বাদশার রাজমুকুটের ওপর। বাদশা বললেন, নিয়ে নাও। মুকুটও খুলে দিয়ে দিলেন। সিংহাসনও দিয়ে দিলেন। ঝাড়বাতিও দিয়ে দিলেন– যা ছিল খাঁটি মুক্তার তৈরী, তাও দিয়ে দিলেন। একটি গোলাম পাশেই দাঁড়িয়েছিল। সে কিছুই বলল না। মূর্তির মত ঠাঁই দাঁড়িয়েছিল সে। বাদশা বললেন– কী তোমার বিশ্বাস হল না আমার কথা! দেখছনা যেলোক যে জিনিসে হাত রাখছে, সেটি তার হয়ে যাচ্ছে। সে বলল, বাস্তব সত্যি সত্যি কি তাই? সে বাদশাকে আবেগপ্রবণ করে তুলল। যেন বাদশা আরও শক্ত দাবী করেন, হ্যাঁ। সত্যিই তাই। নিশ্চয়ই তাই। যার উপর আজ হাত

রাখবে, তাই তোমার হয়ে যাবে। বাদশা বললেন, এই আল্লাহর বান্দা কি দেখে না– যে যার উপর হাত রাখছে, সেটি তার হয়ে গেছে! তোমার কি এখনও সন্দেহ আছে? নির্দেশ লিখে দেওয়ার কি প্রয়োজন আছে! বাদশাদের কথার কি ধর্তব্য নেই। সাধারণ মানুষের কথা একরকম আর বাদশাদের কথাই ভিন্ন। মানুষের কথায় অন্যথা হতে পারে; বাদশাদের কথায় নয়। কথাকে বাদশার কাছ থেকে আরও পাকা, আরও সুদৃঢ় করে নিল। ঘোষণা করিয়ে নিল আরও কয়েকবার। তারপর সে গোলাম বলল, এদের সকলেই নির্বোধ। এদের কেউ মুকুট নিয়েছে, সে সিংহাসন পায় নি। কেউ সিংহাসন নিয়েছে, সে মুকুট পায় নি। কেউ মুক্তা নিয়ে হিরা পায় নি। কেউ হিরা নিয়ে মুক্তা পায় নি। কেউ ঘোড়া নিলে তার পাল্কী হাতছাড়া হয়েছে। কেউ পাল্কী নিলে ঘোড়া তার হয় নি। আবার যদি কেউ ঘোড়া নিয়েছে, তার জন্য ভূমি প্রয়োজন। সেসব তো তারা হারিয়েছে। সুতরাং এরা সবাই নির্বোধ, বেওকুফ। তারা একটি জিনিস নিলে হাজার জিনিস হারিয়েছে। হাজার জিনিস থেকে বঞ্চিত হয়েছে। আর আমাকে আল্লাহ পাক বোধশক্তি দিয়েছেন আমি বাদশার মাথায় হাত রাখলাম, এখন মাথায় মুকুটও নেই। যদি মুকুট থাকত, তবে সে মুকুট হাতে আসত। এখন তো কোনও আবরণই র‌্ইল না। বাদশার মাথা খোলা রয়েছে। এর উপর আমি হাত রাখলাম, আমি একেই নিলাম। কেননা যে ব্যক্তি বাদশাকে নিল, যে বাদশাকে পেল সে মুকুটও পেল, সিংহাসনও পেল। ঘোড়াও তার হল আবার ময়ূরও হাতে এল। সে গৃহও পেল আবার গৃহ সামগ্রীও। সে টাকা-পয়সাও পেল। ইজ্জত-সম্মানও নসীব হল। জুটল হিরে-জহরত, খাদ্য-পানীয়। লাভ হল শক্তি-ক্ষমতাও।

আমাদের উপমাও এরূপ হওয়া উচিত। আজ তো কেউ জীবন দেয় ফ্যাশনের ওপর। কেউ জীবন বিলায় পোশাক-পরিচ্ছদের ওপর। কেউ নিবেদিতপ্রাণ বাড়ি-গাড়ীর ওপর। কেউ চেয়ার বা পদমর্যাদার ওপর, কেউ যৌবনের ওপর, কেউ স্বামীর প্রেম-ভালাবাসায়, কেউ টাকা-পয়সার লোভ-লালসায়, ধন সম্পদের মোহ-মায়ায়, কেউ আধুনিকতা ও নতুন সভ্যতার ওপর। আর মুসলিম রমণীদের, মুসলমান নারীদের তো কেবল এক আল্লাহর সন্ধানকারী হওয়া উচিত। আল্লাহর ভালবাসা লাভের চেষ্টা-সাধনা করা উচিত। যাতে আল্লাহ পাকের সাহায্যের দৃষ্টি তার প্রতি নিবন্ধ হয়ে যায়। তা হলে সবকিছুই তার হয়ে যাবে।

রাণী, আগে মুরগী পালুন!

মুজাদ্দেদী বংশের প্রবীন এক বুযুর্গ শাহ্ মুহাম্মাদ ইয়াকুব সাহেব মুজাদ্দেদী বিভিন্ন গল্প-কাহিনীতে অনেক উঁচু উঁচু বিষয় বুঝাতেন। তিনি একটি গল্প শুনিয়েছেন, যা আমি প্রায় মহিলাদের সভায় শুনিয়ে থাকি। ভূপালে এক সময় বেগমদের যুগ ছিল। বিরাট অস্থির ও উদ্বিগ্নপ্রাণ এক বেগম ছিল। এক পীর সাহেবের নিকট এসে তিনি বলতে লাগলেন, পীর সাহেব! আমি বিরাট পেরেশানীতে আছি। আমার স্বামী আমাকে জিজ্ঞাসাও করে না। আগে তো সে আমার দিকে খুব লক্ষ্য রাখত। কিন্তু এখন তার মন আমার থেকে উঠে গেছে। আমার ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। সন্তানরাও আমার খেয়াল করে না। যত্ন নেয় না। স্বামীর দৃষ্টি কি উঠে গেছে; গোটা পৃথিবীর দৃষ্টিই উঠে গেছে। আমি বিরাট অস্থির-উদ্বিগ্ন। হযরত! আমার জন্য দু'আ করুন। তিনি মহিলার পূর্ণ রামকাহিনীই শুনলেন আর বলতে লাগলেন, "রাণী! আগে মুরগি পালুন!" এবার সে আরও অস্থির হয়ে পড়ল পীর সাহেবের আবার কী হয়ে গেল। কাল পর্যন্ত তো ভালই শুনতেন। আজ উল্টা-পাল্টা শুনছেন! তখন তিনি একটু জোরে-শোরে ডেকে বললেন– না, হযরত! আমি বলছি, আমার জন্য দু'আ করুন। আমি খুব পেরেশানীতে আছি। পীর সাহেব তো কানে কম শুনতেন না। পীর সাহেব ক্ষীণ স্বরে বললেন, রাণী! আমি বলছি, আগে মুরগী পালুন। এবার রাণী আরও বেশি উদ্বিগ্ন-অস্থির হয়ে পড়ল যে, পীর সাহেবের আজ কী হয়ে গেল! আমি তো তাঁর কাছে দু'আর জন্য বলছি। আর মুরগী তো ঘরে ঘরেই পালা হয়। তবে আমার মুরগী পালনের দ্বারা কি উপকার হবে? আমার তো না ডিমের প্রয়োজন আছে আর না খাবারের অভাব আছে। মাশাআল্লাহ! প্রতিদিন কুরমা-পোলাও, বিরিয়ানী এবং ডিমের কত কি রান্না হয়। সুতরাং মুরগী পালন তো সাধারণ মানুষ করছেই; মন চাইলে বাজার থেকে খরিদ করিয়ে আনব। কিন্তু পীর সাহেবের আজ কী হল! প্রত্যেক কথার জবাবে তিনি শুধু "মুরগী পালুন! মুরগী পালুন!" বলছেন। সুতরাং রাণী আর চুপ থাকতে পারলেন না। বলতে লাগলেন, পীর সাহেব! আমি বলছিলাম, আমি অনেক পেরেশানীতে আছি। আপনি আমার জন্য দু'আ করুন। আর আপনি বরাবরই বলছেন, মুরগী পালুন! মুরগী পালুন! আমি ব্যাপারখানা কী বুঝতেই পারছি না? আপনি একটু ভাল করে বুঝিয়ে বলুন। তখন পীর সাহেব বললেন, রাণী মহোদয়! একটি ঘটনা আছে। ঘটনা দ্বারা বিষয়টি

ভালভাবে হৃদয়ঙ্গম হয়ে যাবে। এক স্থানে পাশাপাশি দুটি ঘর ছিল। একটি ধনীর ঘর। তারা পানাহার করত খুশিমতো সব। ছিল তাদের বিরাট বিত্ত-বৈভব এবং ভোগ-বিলাসিতা। আর অন্যটি ছিল গরীবের ঘর। বেচারা ছিল অস্থির-পেরেশান অবস্থায়। তাদের মধ্যখানে ছিল একটি দেয়াল। আর দেয়ালে ছিল একটি জানালা। সুতরাং যখন ঐ গরীব ঘরে কোনও মেহমান এসে হাজির হত, তখন এই গরীব ঘরের গৃহকর্তী জানালা খুলে মুখ ভেতরে নিয়ে তার প্রতিবেশী গৃহকর্তীকে বলত, ঘরে অসময়ে মেহমান এসে পড়েছে। এখন আর কিছু করা তো সম্ভব নয়; একটি ডিমই দিন। অন্তত একটি ডিমই ভেজে দেওয়া যাক। তখন সে ডিম দিয়ে দিত। একবার হয়েছে, দু'বার হয়েছে, চারবার হয়েছে। কয়েকবার হয়েছে তারপর একদিন রেগে বিরক্ত হয়ে বলতে লাগল, আপামনি! আজই একটা মুরগী পালা শুরু করো। সমস্যা কেটে যাবে। স্বচ্ছলতা ও সম্বল যোগাড় হয়ে যাবে। তুমি তো প্রতিদিন ডিম চেয়ে হাত পাত– তা আর করতে হবে না। কাজেই রাণী মহোদয়! আমি আপনাকে তা-ই বলছি, আল্লাহর সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তুলুন। আল্লাহর কাছে দু'আ করতে শিখুন। তার কাছেই যাচনা করুন। সব সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে।

সকল কাজের উৎসশক্তি আল্লাহর সাথে সুসম্পর্ক

এখন আমি কোন্ কোন্ জিনিসের জন্য দু'আ করব। তুমি আজ বলছ, স্বামী অসন্তুষ্ট। কাল বলবে, ছেলে অসন্তুষ্ট আর পরশু বলবে, আমার স্বাস্থ্য ভাল যাচ্ছে না। পীর সাহেব! আমার জন্য দু'আ করুন।

যদি তোমরা বাইরে ঘুরাফেরা শুরু কর, বাজারে মনমত্ত রাখতে থাক, তা হলে ঘরের সেই সুখ-শান্তি বিলীন হয়ে যাবে। এরপর বাাজরে ঘুরাফেরাকারীর নারীদের মতো তোমাদের মন-প্রাণও অস্থির-বিষণ্ন হতে থাকবে। এটা কেনা হল না; ওটা কেনা হল না। অমুক দোকানে এই মাল দেখেছিলাম। অমুক দোকানে এই জিনিস দেখেছিলাম। অমুক হার এত টাকায় পাওয়া যায়। সব সময় অস্থির পেরেশান থাকবে। মন অস্থির, প্রাণ অস্থির, মেধা-মনন অস্থির। ঘরে মন বসে না। সন্ধ্যায় মুক্ত বাতাস খেতে বেরিয়ে পড়লে আর দোকানে দোকানে ঘুরতে থাকলে– এটা মুসলমান নারীদের কাজ নয়।

আল্লাহ তা'আলা তার রাসূল সা. এর পত্নীদের জন্য যা কিছু পছন্দ করেছেন, তা-ই নিজের বেছে নেওয়া উচিত। সেটাই আমাদের জন্য আদর্শ নমুনা। তা-ই অনুকরণযোগ্য বিষয়।

ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى

প্রাক ইসলামের যুগ, যা বর্বরতা ও মুর্খতার যুগ, সে যুগের নারীদের অঙ্গভঙ্গি, রঙঢঙ, সাজসজ্জা গ্রহণ কর না। নামায পড়। যাকাত দাও। নামাযের জন্য স্থান নির্ধারণ কর। জায়গা পবিত্র-পরিচ্ছন্ন রাখ। সেখানে তাসবীহ পড়তে পার। কুরআন-কিতাব পড়তে পার। নিজ সন্তানদেরকে দ্বীন-ধর্মের কথা শিখাতে পার। যে সময় বাঁচবে, তাতে স্বামীর সেবা কর। সন্তানদের শিক্ষা-দীক্ষায় সময় ব্যয় কর।

ভারত থেকে যেসব পরিবার এখানে চলে এসেছে, তাদের ঘরের পরিবেশ তাবলীগী (প্রচারধর্মী) হতে হবে। ধর্মীয় হতে হবে। তবেই তারা দ্বীন প্রতিষ্ঠিত রাখতে পারবে। মুসলমান হয়ে টিকে থাকবে। যদি ঘরগুলোতে সেই ইসলামী জীবন না-থাকে, তা হলে হাজারবার ওয়াজ-নসীহত করা হল, হাজারবার আমাদের ভাইয়েরা চিল্লায় গেল এবং হাজার হাজার শিশুদের শিক্ষা-দীক্ষা দেওয়া হল, তাতে কাজ হবে না। সেজন্য ঘরের পরিবেশ পুরোপুরি ইসলামিক হওয়া প্রয়োজন।

হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইলিয়াছ রহ., মাওলানা ইফসুফ রহ., মাওলানা শাইখুল হাদীস সাহেব রহ., তাদের মায়েদের ঘটনা আপনারা পড়ুন। তারা কেমন এবাদতকারিণী, দুনিয়াবিমুখ রাবেয়া বসীর মতো ছিলেন। তাদের রাত কিভাবে পার হত; দিন কিভাবে কাটত, দিনে কত পারা কুআন তিলাওয়াত করতেন। রমাযানে তাদের সাহসিকতা দেখুন। তাতে পুরুষদের মাথাও লজ্জায় নত হয়ে যায়। এসব মহিয়সী নারী এত এবাদত-বন্দেগী করেছেন, যার দিকে আমাদের চিন্তাও যায় না। এরই সুফলে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে এমন সুসন্তান দান করেছেন, যাদের দ্বারা গোটা বিশ্বের অনেক দেশ তাদের আলোয় আলোকিত হচ্ছে। হাজার হাজার, লাখ লাখ মানুষের সংশোধন হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। এসব ছিল তাদের সময়ের বরকত। তাদের নিয়তের বরকত, তাদের এখলাছের এবং আল্লাহর সাথে তাদের সুসম্পর্কের বরকত।

আজ যেসব সন্তান মাতৃকোলে পালিত হয়, সুস্পষ্ট বুঝা যায় সে সন্তান কেমন হবে। যেমন কোল তেমন সন্তান। যখন সে মায়ের মুখে আল্লাহর নাম শুন না, যখন সে ঘরে তিলাওয়াতের আওয়াজ শুনবে না, নিজের ঘরে নেককাজ ও পুণ্যের কথা শুনবে না, তখন বাইরে বের হলে এর কোনও আছর ও প্রভাব থাকবে না।

মায়ের দায়িত্ব ও অধিকার সংরক্ষণ

ব্যাস, আমার বোনোরা! আমলের জন্য এতটুকু কথাই যথেষ্ট। পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় কর। স্বামীর অধিকার রক্ষা কর। সন্তানের অধিকার পূর্ণ কর। আল্লাহর অধিকার রক্ষা কর আর অনাড়ম্বর সাদাসিধে জীবন যাপন কর। সাদাসিধে জীবনোপকরণ গ্রহণ কর। তা হলে তোমরা এদেশে শান্তি লাভ করতে পারবে। তোমরা তাবলীগ কর, তা হলে অন্যান্য নারীরাও তা দেখে বলবে, এই তো অনুস্মরণীয় আদর্শ। অন্যথায় তোমাদের আগমণ বড় বিপজ্জনক আর আজ আশঙ্কা হচ্ছে, তোমরা যেন একেবারে হারিয়ে না-যাও, ধ্বংস হয়ে না-যাও। এখানে যে নতুন সভ্যতার জোয়ার বইছে, আল্লাহ না করুন! তোমরাও তাতে ডুবে না-যাও! কাজেই তোমাদের জীবন অবশ্যই সাদাসিধে অনাড়ম্বর হতে হবে। তা হলে আল্লাহ তা'আলা তোমায় দয়া-অনুগ্রহ করবেন। অনাবিল সুখ ও শান্তির জীবন দান করবেন। রিযিকে ও ধনে জনে বরকত হবে। ভাল ও সৎ সন্তান জন্ম হবে। আর যদি এখানে এসে তোমাদের সততা, সাদাসিধে, অনাড়ম্বরতা নিঃশেষ হয়ে যায় এবং সেই অপচয়, সেই অপব্যয়, সেই ফ্যাশনপূজা, সেই উদাসীনতা, সেই বিনোদনপ্রিয়তা, উল্লাস-উন্মত্ততা, সেই একই আবেদন আর সেই তাদেরই অনুকরণ-অনুসরণ চলতে থাকে, তবে এ জীবন মুক্ত-অবাধ হয়ে যাবে। ঘর পরিণত হবে জাহান্নামের অগ্নিগর্ভে। নিজ নিজ স্বামী সন্তানদেরকে তাবলীগের প্রেরণা দাও। তাদের সাহস যোগাও। বলো, তোমরা তাবলীগে যাও। দ্বীনের প্রচারে বের হও। আমরা ঘর সামলে রাখব। তোমাদের কোনও দুর্ভাবনার প্রয়োজন নেই। আমরা সব শিশুর খেয়াল রাখব। তোমরা তাবলীগী ও দ্বীন প্রচারের সম্মেলনে অংশগ্রহণ কর। ঈমান, ইসলাম ও তাকওয়া ভরা জীবন গঠন কর। আল্লাহ তা'আলা সন্তুষ্ট হবেন। তিনি তোমাদের রক্ষণাবেক্ষণও করবেন।

আমি একটু পূর্বেই আল্লাহর নেক বান্দাদের উদাহরণ দিয়েছিলাম। মাওলানা ইলিয়াছ রহ. এর মাতার জীবনী পড়ুন। কত কত অজীফা, দু'আ দরূদ তিনি দিনরাত পড়তেন –আশ্চর্য লাগত, আল্লাহ আকবার। এত পরিমাণে আল্লাহর যিকির! মাওলানা ইফসুফ রহ. এর মাতা, হযরত শাইখুল হাদীস রহ. এর সুযোগ্য কন্যা, যিনি মাওলানা ইফসুফ রহ. এর সহধর্মীনী, এই সকল পুণ্যময়ী রমণীদের জীবনালেখ্য পড়লে জানা যায়, তারা দুনিয়ার প্রতি মন-দিল মোটেও লাগান নি। তারা প্রতিনিয়ত ভাবতেন, আমাদেরকে অন্য কোথাও যেতে হবে। দুনিয়া ছাড়তে হবে। রোগে ক্লীষ্ট

হয়েছেন, তবু মেহমানদের খাতির-যত্নে অভাবনীয় বিস্ময়করভাবে সদা সজাগ ছিলেন। এ বংশের ছোট ছোট শিশুরা এবাদত করে। আল্লাহর যিকির পৃথকভাবে করে। শিশুদের প্রতিপালন, শিক্ষা-দীক্ষা পৃথকভাবে করে। তাদের ঘর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র। না আছে সেখানে সতেজ হাওয়া আর না আনন্দ-ভ্রমণের কোনও সুযোগ যে, কোথাও ঘুরতে চলে যাবে।

স্বয়ং আমার মরহুমা আম্মাজানের কথা। যার ইন্তিকালের এখনও এক বছর পার হয় নি। আমি আম্মাজানের যৌবনের অবস্থা দেখেছি। সত্যিই তার ঈমানের সামনে, তার ইয়াকিন-দৃঢ়বিশ্বাসের সামনে, তার নামাযের সামনে নিজের নামাযকে এনে দাঁড় করাতে লজ্জাবোধ হয়। কেননা আল্লাহ তা'আলা তাকে দু'আ ও যাঞ্চা করার যে আগ্রহ-প্রেরণা দান করেছিলেন এবং ইসলামের সমুন্নতির জন্য আপন সন্তানদেরকে, চাই সে উপার্জন করুক বা না-করুক, কিন্তু সে আল্লাহর দ্বীনের খেদমত করবে। আল্লাহ তাদেরকে বাধ্যগত করবেন। তাদের মাধ্যমে আমাদেরকেও বিনীত করুন। সেকালেও আল্লাহপাক তাঁকে অনেক অনেক নেয়ামত দিয়েছেন। সহজ-সরল স্বচ্ছল তুষ্ট গৃহিনী ছিলেন তিনি। আল্লাহ তা'আলা কখনও কারও মুখাপেক্ষী করেন নি। এ ঘরের মেয়ে এমন আরেক ঘরে এসেছে, যেখানে ছিল ইলম-আমল, ছিল ইজ্জত-সম্মান সবকিছুই। তবে তাঁর মধ্যে আমি যা দেখেছি, এই দুনিয়ায় কখনও তাঁর মন বসে নি। সুতরাং তাঁর একটি পংক্তি আছে :

اپنا وطن عدم ہے جاکر وہیں بسیں گے

"নিজের ঘর তো বিলীন, বাস করিব ওখানে গিয়ে।"

মনে হত, তিনি পরবাসে বিভূঁই পড়ে আছেন। কোনও কাজেই তার মন বসে না। তার মন বসত কেবল নামাযে ও দু'আ-দরূদে। যখন কোন পেরেশানী বা দুঃখ বোধ হয়েছে, তিনি দু'আ করেছেন। বাকী সব কিছুর সঙ্গে সম্পর্ক রেখেছেন নাম মাত্র; একেবারে আইনগত সম্পর্ক।

মা ও প্রতিপালনকারী নারীর দায়িত্ব-কর্তব্য

ইসলামের দুটি ময়দান এমন, যেখানে নারীরা অগ্রসর। এ দুটি ময়দানে তারা যে কৃতিত্ব স্থাপন করতে পারে এবং এর মাধ্যমে তারা মুসলিম উম্মাহর বংশধারাই শুধু নয় বরং ঈমান ও আকীদাগত, চারিত্রিক, মানসিক, মানবিক এবং সভ্যতা-সাংস্কৃতিক ক্রমধারা অক্ষুণ্ন রাখায় যে মৌলিক পদক্ষেপ নিতে পারে, তা তাদেরই একান্ত বিষয়। আর সর্বকালে সর্বযুগে কেবল তাদের সাহায্য-সহায়তাই নয় বরং তাদের দায়-দায়িত্ব

গ্রহণ ও তার যথার্থ বাস্তবায়ন ছাড়া এই পরোক্ষ ক্রমধারা (যা এই উম্মতের প্রকৃত মূল্য এবং তার প্রয়োজনীয়তা ও উপকারীতার প্রমাণ) অটুট থাকতে পারে না।

সে দুটি ময়দানের একটি হল, নতুন প্রজন্মকে সঠিক ধর্মীয় শিক্ষা ও দীক্ষা দানের প্রাথমিক কাজ এবং তার মন-মানসে, মেধা-মননে ইসলামের আসল রূপরেখা অঙ্কিত করা। একে গভীরভাবে বদ্ধমূল ও সুদৃঢ় বানানো। দ্বিতীয়ত ইসলামী সভ্যতা-সাংস্কৃতি ও সামাজিকতা সংরক্ষণ এবং নতুন প্রজন্মকে অনৈসলামিক সভ্যতা-সাংস্কৃতি, সামাজিকতা ও সমাজ ব্যবস্থার প্রভাব থেকে রক্ষা করা।

আমাদের ভাষা-পরিভাষায় যখন সে কথা ব্যক্ত করা হয় অর্থাৎ "অমুক অভ্যাস-রীতি। আকীদা-বিশ্বাস কিংবা সভ্যতা বা সৌন্দর্য বা দুর্বলতা মেধা-মননে বদ্ধমূল হয়ে গেছে। এখন তা উৎপাটন করা যাবে না।" তখন বলা হয়, "এটা গোড়ায় জড়িয়ে আছে অর্থাৎ অন্তর-আত্মায় বদ্ধমূল হয়ে আছে।" আর বলা বাহুল্য যে, এই গোড়া মা এবং ঘরের স্নেহময়ী ও মুরব্বী রমণীদের মাধ্যমেই শিশুদেরকে প্রাথমিক বোধ-জ্ঞানের সময় ঘরেই দেওয়া যেতে পারে। অভিজ্ঞ শিক্ষক, প্রশিক্ষক ও মনোস্তত্ত্ব বিশেষজ্ঞগণ খুব জোর দিয়ে বলেছেন, শিশুর মেধা-মননের সাদা ফলকে প্রাথমিক (শৈশবে) যে চিত্র অঙ্কিত হয়ে থাকে, তা কখনও নিশ্চিহ্ন হয় না। যদিও তাকে অস্তিত্বহীন নিশ্চিহ্ন ধারণা করা হোক, কিন্তু মূলত তা বিলীন বা নিশ্চিহ্ন হয় না। চাপা পড়ে যায়। আর সময়মত পুনরায় জেগে উঠে। এই বাস্তবতাকে স্বীকার করে নেওয়ার পর মাতাগণ এবং শিশুর লালন-পালনকারী অভিভাবকের দায়-দায়িত্ব বহুগুণে বেড়ে যায়। যা ঐ সাদা ফলকে খুব সহজে ভাল ভাল চিত্র অঙ্কন করতে পারে এবং যাকে কোনও শাক্তি, কোনও শিক্ষা-দীক্ষা তত সহজে বিলীন বা নিশ্চিহ্ন করতে পারে না।

মা ও শিশুর লালন-পালনকারী নারীগণ এবং ঘরের অন্যান্য রমনীগণ, যারা সম্পর্কে বড় এবং ঘরের মধ্যে প্রভাবশালী ও শ্রদ্ধাভাজন হয়ে থাকে– তাদের দায়িত্ব-কর্তব্য কেবল এতটুকুই নয় যে, তারা শিশুদেরকে আল্লাহ ও রাসূলের নাম শিখিয়ে দিবে, কালেমা মুখস্থ করিয়ে দিবে আর যখন সময় বা বয়স হবে, তখন নামায পড়তে শিখিয়ে দিবে রবং তারা যেন কুরআনে কারীম পড়তে পারে, উর্দূ পড়ারও যোগ্য হয়ে ওঠে –এ দায়িত্বও তাদের। হিন্দী ভাষা ও হস্তলিপির দাপটের যুগে যখন লাখ লাখ মুসলমান শিশু উর্দূ একটি চরণও পড়তে এবং নিজের নাম পর্যন্ত লেখার যোগ্য হত না,

এমনকি নিজের নাম মুখে উচ্চারণ করা ও বলার যোগ্যতা তাদের মধ্যে হত না, যার ডজন ডজন উদাহরণ ইন্টারভিউ অনুষ্ঠানসমূহ, স্কুল-কলেজে ভর্তি এবং চাকুরীর জন্য দরখাস্ত প্রদানের মুহূর্তে দেখা গেছে। যার বেশিরভাগ ঘরের মধ্যে উর্দূ লেখাপড়ার যোগ্যতা তৈরী এবং ইসলামের ইতিহাস, নবী-রাসূল, সাহাবায়ে কিরাম, আযওয়াজে মুতাহ্হারাত পুণ্যবতী (নবী পত্নীগণ), আহলে বাইত ও ইসলামের পথপ্রদর্শক ইমামগণের নামসমূহ অবগত করানোর কাজে আলস্য-উদাসীনতার পরিণতি।

এছাড়া আরও জরুরী প্রয়োজন হল, সেসব শিশুর মনেপ্রাণে কুফর-শিরকের প্রতি ঘৃণা, একত্ববাদের প্রতি অনুরাগ-আকর্ষণ, এর উপর গৌরব বোধ, ইসলামিক সম্বন্ধ এবং মুসলামন হওয়া ও বলায় আনন্দ-সম্মানের উপলব্ধি, ধর্মীয় মূল্যবোধ ও সম্ভ্রমবোধ, আল্লাহর আনুগত্য, আল্লাহর সর্বশেষ নবী ও রাসূল মুহাম্মাদ সা. এর সাথে প্রেম-ভালবাসা ও গভীর অনুরাগ, পাপাচার থেকে ঘৃণা-বিতৃষ্ণা, পার্থিব উন্নতিকেই জীবনের অভীষ্ট সাফল্য ও উন্নতির প্রমাণ মনে না-করা, সততা ও সত্যবাদিরতার অভ্যাস, সেবা ও আত্মনিবেদনের আগ্রহ, সৃষ্টির সেবা ও স্বদেশ প্রেমের প্রেরণা সৃষ্টি ইত্যাদিও তাদেরই কর্তব্য এবং তাদেরই করণীয় কাজ। এসব কাজ যদি শৈশবে এবং ঘরের মধ্যে না হয়, তবে পৃথিবীর বিশাল বিশাল শিক্ষালয়, বড় বড় জ্ঞান-গবেষণাগার এবং সরকারী ও বিশ্বমানের কোনও পশিক্ষণ কেন্দ্রই তা করতে পারে না আর না এই অভীষ্ট সফল হতে পারে।

পরিষ্কারভাবে আরও বলতে হয় যে, যতক্ষণ পর্যন্ত মুসলমান শিশুদেরকে পৌত্তিলকতা ও কুফর-শিরক থেকে চাই তা কোনও বহির্দেশ বা আন্তঃরাষ্ট্রীয় কল্পকিচ্ছা (Mythology) ও পাঠ্যসূচি (Text books) এর মাধ্যমে হোক কিংবা রেডিও, টেলিভিশন বা প্রবন্ধ-নিবন্ধের মাধ্যমে হোক অথবা খোদ মুসলমানদের আপন দ্বীন-ধর্ম সম্পর্কে অজ্ঞতা এবং দুনিয়াদার ও পেশাদার গোষ্ঠীর প্রভাবে হোক –সর্বোপরি ঐ পৌত্তিলকতা ও কুফর-শিরকের প্রতি যদি এরূপ ঘৃণা ও বিতৃষ্ণা সৃষ্টি না হয়, যেরূপ হয় নোংরা দুগর্ন্ধময় জিনিসের প্রতি– তা হলে তাদের ঈমানের সুরক্ষা হতে পারে না। তাদের সঠিক আকীদায় বিশ্বাসী মুসলমান হওয়ার নিশ্চয়তা দেওয়া যেতে পারে না। এই তরবিয়ত, এই শিক্ষা-দীক্ষা, এই ভালবাসা ও ঘৃণা, যা মানুষের স্বভাব-বৈশিষ্ট্য এবং পঞ্চইন্দ্রিয়ের সাথে নতুন এক বৈশিষ্টের রূপ ধারণ করে –এসব মুসলমান বংশগুলোর মিরাছ, তাদের বংশানুক্রমিক উত্তরাধিকার সম্পদ। মুসলমান প্রজন্মগুলোর আকীদাগত এবং পরোক্ষ সেতু-বন্ধনের রহস্য হয়ে

আছে। আর যতক্ষণ পর্যন্ত একাজগুলো প্রতিটি ঘরে ঘরে মা, ঘরের বড় বোন ও সম্ভ্রান্ত প্রবীন মহিলাদের মাধ্যমে সম্পাদন না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত বড় থেকে বড় কোন প্রভাবময় মাওয়ায়েয-উপদেশগ্রন্থ, অতি প্রতিক্রিয়াশীল বই-পুস্তক, ধর্মীয় আরবী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সুযোগ্য শিক্ষক-অধ্যাপকদের মাধ্যমেও এতে সফলতা পাওয়া মুশকিল।

কন্যাদের লালন-পালনে প্রতিযোগিতা ও সমান অধিকার দান

ইসলামের প্রভাবে মানুষের মন-মানসে মহাবিপ্লব সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। যে কন্যা সন্তান পূর্বকালে বংশ ও পরিবারের জন্য এবং অভিজাত নেতা শ্রেণীর লোকদের দৃষ্টিতে লজ্জা ও অপমানের কারণ ছিল, (এমনকি কোনও কোনও গোত্রে তাকে জীবন পুঁতে রাখারও প্রচলন ছিল) আজ সেই কন্যারা এমন প্রিয় ও স্নেহভাজন হয়ে গিয়েছে, যার লালন-পালন, শিক্ষা-দীক্ষা ও তত্ত্বাবধানের জন্য পরস্পর প্রতিযোগিতা সৃষ্টি হয়ে গেছে। মুসলমান সবাই সমান ছিল। সকলেই সমান অধিকার রাখত। কারও উপর কারও প্রাধান্য বা শ্রেষ্ঠত্ব যদি হত, তবে তা হত শিক্ষাগত ও কার্যতঃ কোনও মর্যাদা-বৈশিষ্ট্য এবং কোনও যৌক্তিক মৌলিকতার ভিত্তিতে। যখন রাসূলে কারীম সা. মক্কা থেকে প্রত্যাবর্তনের মনোস্থ করলেন, তখন সাইয়িদুনা হামযা রাযি. এর শিশুকন্যা 'উমামা' চাচা চাচা ডাকতে ডাকতে নবীজীর পিছু ধরে।

হযরত আলী রাযি. তাকে উঠিয়ে নিলেন এবং হযরত ফাতেমা রাযি. কে সমর্পন করলেন। বললেন, দেখো! এ চাচার মেয়ে। এখন হযরত আলী, যায়েদ ও জাফর রাযি. এর মধ্যে এ নিয়ে তর্ক-বিতর্ক হতে লাগল। হযরত আলী রাযি. বললেন, তাকে আমি গ্রহণ করছি। এ আমার চাচাতো বোন। হযরত জাফর রাযি. বললেন, এ আমারও চাচাতো বোন। তাছাড়া ওর খালা আমার বিবাহাধীন। হযরত যায়েদ রাযি. বললেন, (ইসলামের সম্পর্ক হিসেবে) এ আমার ভাতিজি। এরপর রাসূলে কারীম সা. হযরত জাফর রাযি. এর পক্ষে সিদ্ধান্ত দিলেন। বললেন, যেহেতু শিশুটির খালা তার ঘরে আছে আর খালা মায়ের স্থানে হয়ে থাকে। (তাই ওখানে তার বেশি আরাম হবে)। হযরত আলী রাযি. কে নবী কারীম সা. মনোরঞ্জনের জন্য বললেন, "তুমি আমার থেকে আর আমি তোমার থেকে।" হযরত জাফের রাযি. কে বললেন, "তুমি চরিত্র ও আকৃতি উভয় দিক দিয়ে আমার সদৃশ। হযরত যায়েদ রাযি. কে বললেন, 'তুমি আমার ভাই এবং আমার মুক্ত দাস।"

মুসলিম সমাজে নারীদের সম্মান এবং শিশুর লালন-পালনে তাদের হাত

মুসলমান ঘর ও পরিবারসমূহে সর্বকালে নারীকে শ্রদ্ধা ও সম্মানের চোখে দেখা হয়েছে। সাধারণত ঘরের যাবতীয় শৃঙ্খলা-ব্যবস্থাপনা তাদের উপর ন্যাস্ত থাকে। তার মালিকানা সত্ব, বেচাকেনার অধিকার এবং অনেক ধরনের আইনী অধিকার রয়েছে। শিশুকালে সন্তানের শিক্ষা-দীক্ষা সাধারণত তাদেরই তত্ত্বাবধানে হয়ে থাকে। সম্ভ্রান্তদের মধ্যে এবং প্রাচীন বংশগুলোতে কোনও না কোনও শিক্ষিত নারী কিংবা প্রবীন বৃদ্ধা শিশুদেরকে কুরআনে কারীম ও অন্যান্য ধর্মীয় বিষয়াদি শিক্ষা দিত। পাড়া-মহল্লা ও আশপাশের প্রতিবেশি শিশুরা তার কাছে পড়তে আসত। ওখানে ভাল একটি মক্তব বা ছোট-খাট মাদরাসা হয়ে যেত। আজ পর্যন্ত কোথাও কোথাও সে নিয়ম চালু আছে। ধর্মীয় শিক্ষার সাথে সাথে তারা শিশুদেরকে সেলাই, কারুকাজ, কারিগরি, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা, রান্না-বান্না ও খাবার পরিবেশন প্রভৃতিও শিক্ষা দিত।

জ্ঞান অর্জন নারী-পুরুষ সকলের উপর ফরয

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبين

محمد و اله واصحابه اجمعين – ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدين – اما بعد

আমার প্রিয় বোন ও কন্যারা! আমি খুবই আনন্দিত। আজ আমি এখানে এসে এই শিক্ষামূলক তৎপরতা দেখতে পাচ্ছি, যা বিশেষভাবে আমাদের শিশু কন্যা ও নারী সমাজের জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে। বস্তুত একটি পরিবার যেমন নারীদের ছাড়া অসম্পূর্ণ, এমনকি তাকে পরিবার বলাও যথার্থ নয়। উম্মতের অবস্থাও তদ্রুপ। যদি তাতে শিক্ষা-দীক্ষা, উন্নতি-অগ্রগতি, বুঝ-জ্ঞান, চরিত্র-সভ্যতা ইত্যাদি শুধু পুরুষদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, তা হলে এ উম্মতকে সচেতন উম্মত, সচেতন জাতি, জীবন্ত উম্মত বলা কঠিন। এ বিষয়ে সবসময়ই লক্ষ্য রাখা হয়েছে। ইলামের সূচনা লগ্ন থেকে কন্যা এবং নারীদেরকেও শিক্ষাদীক্ষা ও ইসলামের প্রশিক্ষণে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে–

طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة

ইলম অন্বেষণ করা, ইলমের উপর শ্রমসাধনা করা ও ইলম হাসিল করা প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর উপর ফরয। সুতরাং ইসলামের গোটা

ব্যবস্থাপনা, এর ধর্মীয় ব্যবস্থা, এর চিন্তা-দর্শন, এর চরিত্রনীতি এবং এর প্রতিপালন-পৃষ্ঠপোষকতার সঠিক অর্থ বাস্তবায়িত হতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত খোদ আমাদের উম্মতের, আমাদের জাতির মুসলমি নারী ও কন্যাগণ এতে সম্পৃক্ত না হবে এবং তারা প্রয়োজনীয় পরিমাণ ইলম অর্জন না করবে। নারী-পুরুষ উভয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট আসমানী শিক্ষা সম্পর্কে অবগত না হবে। এটা হবে একমুখী চেষ্টা ও একমুখী নীতি, যার দ্বারা কোনও একটি জাতি ও উম্মত তো দূরের কথা– একটি শহরও চলতে পারে না। একটি মহল্লাও সংশোধন হতে পারে না। এজন্য প্রয়োজন নারী-পুরুষ প্রত্যেকের জ্ঞানার্জন। কাজেই ইলম অন্বেষণ করা প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর উপর ফরয।

ঘরের পরিবেশ স্ত্রী-কন্যাদের হাতেগড়া

আমাদের পুরো সমাজব্যবস্থা বরং জীবনব্যবস্থা ও ধর্মীয় নিয়ম-শৃঙ্খলা পর্যন্ত আমাদের স্ত্রী-কন্যাদের তথা নারীজাতির ইসলামিক জ্ঞানার্জন ছাড়া চলতে পারে না। আর ঘরের যে অবস্থা-পরিবেশ হয়ে থাকে, তা তো আমাদের স্ত্রী-কন্যাদের হাতে গড়া, সাজানো-গুছানা। সুতরাং ঘরে যদি ইসলামিক পরিবেশ না থাকে, ধর্মীয় শিক্ষা-দীক্ষা না থাকে, ইসলামিক চরিত্র-নৈতিকতা না থাকে, তবে তো আদৌ এ প্রজন্মের ইসলামিক দীক্ষা লাভ হতে পারে না। কাজেই আমরা ইতিহাসের পাতায় দেখতে পাই, সর্বকালেই এর গুরুত্ব ও যত্ন নেওয়া হয়েছে। উম্মতের নারীসমাজও সব সময় কেবল সে জ্ঞান সম্পর্কে ওয়াকিবহালই নয় বরং ইলম ও জ্ঞান প্রসারকারীও ছিল। জীবনী ও স্মারক গ্রন্থাবলীতে এমন এমন নারী ও স্ত্রী-কন্যাদের নাম পাওয়া যায়, যারা বড় পণ্ডিৎ ও বিজ্ঞ আলেমা ছিলেন। যাদের কারণে বংশের পর বংশ, প্রজন্মের পর প্রজন্ম বরং তৎকালীন গোটা জাতি দ্বীন-ধর্ম সম্পর্কে অবগত ছিল। দ্বীনের উপর আমলব্রতি ও সক্রিয় ছিল। তাদের কর্মকীর্তি আপনারা পড়ে দেখুন। এমনকি অনেক বংশ ও প্রজন্মের ঈমান রক্ষা করেছেন নারীগণ। কেননা তারা প্রথম থেকেই শিশু কন্যাদেরকে এমন শিক্ষা-দীক্ষা দিয়েছেন এবং ইসলামিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ জাগ্রত এবং গ্রথিত করে দিয়েছেন। আর সত্য বলতে মনের গহীন কোনে, হৃদয়তন্ত্রীতে, অন্তরের ভিটে-মাটিতে, বুকের জমিনে বীজ বপন করেছেন। এই বীজ বপন, অঙ্কুর উদগমন ঘরের মেয়েরাই করতে পারে। আর যখন সে বীজ, যখন সে অঙ্কুর শেকড় মেলে দৃঢ় হয়ে যায়, পত্র-পল্লবিত হয়ে যায়, তখন তাকে শক্তি-প্রশাসনও উপড়ে ফেলতে পারে না। এমন শত সহস্র দৃষ্টান্ত রয়েছে, যেখানে মা-বোনের কাছে পাওয়া শিক্ষা, তাদের নিকট পড়া

সবক, তাদের কাছ থেকে শেখা দ্বীন, তাদের জাগিয়ে তোলা চেতনা বড় বড় মুজাহিদগণের অটল-অবিচলতা ও দৃঢ়পদতার কারণ হয়েছে। আপনারা যদি এর তদন্ত করেন, সামান্য রিসার্চ ও তত্ত্বানুসন্ধানের মাধ্যমে কাজ নেন, তবে জানতে পারবেন, বস্তুত তাদের মধ্যে যে দৃঢ়তা, অটল-অবিচলতা ও আগ্রহ-চেতনা সৃষ্টি হয়েছে, তা তাদের মায়েদের অবদান। এরও অসংখ্য উদহারণ রয়েছে, ইসলামে বড় বড় উঁচু মাপের এমন বহু আলেম-উলামা গত হয়েছেন, যাদের উপর তাদের মায়েদের প্রভাব সবচেয়ে বেশি পড়েছিল। তাদের মায়েরা তাদেরকে জীবনের অন্তিম সময় পর্যন্ত ইসলামের উপর অবিচল থাকার শক্তি, সাহস, চেতনা ও প্রেরণা দিয়েছেন। এ বিষয়ে পৃথক বহু বই-পুস্তক রয়েছে। যাতে দেখা যায়, অনেক সময় তারা আল্লাহর রাহে জীবন দানের জন্য উদ্বুদ্ধ করেছেন। আপন কলিজার টুকরো সন্তানদেরকে চরম বিপদে-আশঙ্কায় নিক্ষেপ করেছেন। তাদের সাহস যুগিয়েছেন এবং তাদের মধ্যে আত্মসম্ভ্রমবোধ জাগিয়েছেন, তিরস্কার করেছেন– তোমরা দ্বীনের জন্য কেন কাজ করছ না? দ্বীনের জন্য কুরবানী থাকা প্রয়োজন। এর জন্য সবকিছুই কুরবানী করে দেওয়া উচিত। এর বহু দৃষ্টান্ত আমাদের ইতিহাসে পাওয়া যায়। কতিপয় বড় বড় মনীষী ও বড় বড় মুজাহিদ এমনও জন্মেছিলেন, প্রথম প্রথম তাদের মধ্যে যে জিহাদী প্রেরণ জাগ্রত হয়েছে, ইসলামের জন্য কুরবানী দেওয়ার, আত্মত্যাগ স্বীকারের যে চেতনা সৃষ্টি হয়েছে এবং ইসলামের তরে নিবেদিতপ্রাণ ও কুরবান হয়ে যাওয়ার যে সাহস ও তীব্র বাসনা জন্মেছে, তা তাদের মায়েদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণেরই ফল ছিল। তাই অধিকাংশ আল্লাহওয়ালাদের জীবনকর্মে, মুজাহিদগণের জীবনীতে এবং দিগ্বিজয় বীরদের জীবনালোখ্যে তাদের মায়েদের মৌলিক ভিত্তিমূলক কৃতিত্ব পরিলক্ষিত হবে। স্বয়ং তারাই স্বীকার করেছেন, সর্বপ্রথম আমাদের কর্ণকুহরে একথা আমাদের মায়েদের মাধ্যমে পৌঁছেছে। তারা আমাদের মধ্যে ধর্মীয় মূল্যবোধ, দ্বীনের সম্ভ্রমবোধ জাগ্রত করেছেন। আর অনেক ক্ষেত্রে তো ধর্মীয় মূল্যবোধ সৃষ্টিতে আমাদের স্ত্রী-কন্যা ও নারীদের ভূমিকাই বেশি।

আল্লাহ তা'আলা কবুল করুন। উত্তম প্রতিদান দান করুন। আর আজ নতুন প্রজন্মের জন্য চিন্তাগত ধর্মান্তরের যে আশঙ্কা সৃষ্টি হচ্ছে, আমি বাড়িয়ে বলছি না– এর থেকে বাঁচতে সবচেয়ে বড় ভূমিকা হবে মায়ের। এর অসংখ্য দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। কোনও স্নেহময়ী মাতা, মায়ের কোনও বাক্য এক নতুন প্রাণ সঞ্চার করে দিয়েছে। কুরবানী দেওয়া, ত্যাগ-

তিতিক্ষা, আত্মত্যাগ এবং নিজেকে বিরাট শঙ্কায় ফেলতে উদ্বুদ্ধ করেছে। এরও অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়।

আল্লাহর শোকরিয়া জ্ঞাপন করি। আমার প্রিয়জন, হিতাকাঙ্ক্ষী ও বন্ধুদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। ইনশাআল্লাহ্ অদূর ভবিষ্যতে এমন এক শ্রেণী তৈরী হবে, যারা মুসলমানদের আগামী প্রজন্মের দ্বীন ঈমান ও চরিত্র সংরক্ষণের দায়িত্ব পালন করবে। আর সে শ্রেণী হতে পারে কেবল নারীদের, আমাদের স্ত্রী-কন্যাদের, আমাদের মা-বোনদের। আল্লাহ তা'আলা একে উন্নতি দান করুন। একে অধিক উপকারী, ফলপ্রসূ ও কল্যাণকর বানিয়ে দিন। কবুল করুন তাদের মেহনতকে, তাদের শ্রমসাধনাকে, তাদের ত্যাগ-তিতিক্ষা ও কুরবানীগুলোকে। তাদের কল্যাণের ধারাকে এবং তাদের কন্যাদেরকে, যারা এতে অংশগ্রহণ করেছে আল্লাহ তা'আলা একে স্থিতি-স্থায়িত্ব দান করুন। একে বেশি থেকে বেশি উপকারী করুন।

দু'টি উপদেশ

শেষান্তে একটি বিষয় বলতে চাই। দুটি কথা, ওছিয়াত হিসেবে, উপদেশ স্বরূপ, পরামর্শ হিসেবে। আপনারা যত কিছুই শোনেন-বুঝেন, **প্রথমত** আপনারা নিজের নিয়ত ঠিক রাখবেন। এখানে এসে আপনারা কেবল নিজের স্বামী-সংসারের আয় বাড়াচ্ছেন, নিশ্চয় আপনাদের মনে তা নয়। সতর্কতাস্বরূপ বলছি, ভাই! আমাদের স্বামী চার-পাঁচ শ' ডলার কামাই করছে। এখান থেকে পাওয়া যাচ্ছে দুই শ' ডলার। ভালই তো, ছয় সাত শ' ডলার হয়ে গেল। না, কখনও এ নিয়ত রাখবেন না। আপনারা মনে করবেন, মুসলমান কচি ছেলেমেয়েদের নিষ্পাপ আত্মাকে বাঁচানোর জন্য এবং দ্বীনের পথে পরিচালিত করার জন্য আল্লাহ তা'আলা আপনাকে এই সুযোগ করে দিয়েছেন। প্রতিদিন নাহয় তো সপ্তাহে কিংবা মাসে অন্তত নিজের নিয়তের জরিপ নিন। নিয়ত কি শিক্ষা দানের, খেদমতের, ইবাদতের না কামাই রোজগার করার?

দ্বিতীয়ত এসব শিশুদেরকে একত্ববাদ ও আল্লাহভীতির সবক দিবেন অবশ্যই। কথায় কথায়, কোনও বাহানায় কিংবা কোনও গল্প-কাহিনী শুনিয়ে, যার দ্বারা তাওহীদ ও একাত্ববাদের আকীদা-বিশ্বাস মজবুত হয়। মহিলাদের মধ্যে শির্ক অনেক। বাচ্চাদের সামান্য শরীর খারাপ করলে আর নিরাময়ে সামান্য বিলম্ব হলেই ব্যাস, তৎক্ষণাৎ শুরু হয়– "অমুক মাঝারের মাটি নিয়ে এসো, অমুক বুযুর্গের দরবারে যাও। (অমুক ফকীর, দরগাহ বা দরবেশের

কাছে যাও)। এটা-ওটা মান্নত মান। কাজেই মহিলাদের মধ্যে বিশেষভাবে শিক্ষা এবং সঠিক শিক্ষার প্রয়োজন। তাদের অন্তঃকরণে দৃঢ়ভাবে গেঁথে দিবে, আল্লাহ ছাড়া অপর কেউ উপকার বা ক্ষতি সাধন করতে পারে না। তা ছাড়া তাদের মনে আল্লাহর ভয় জন্মানোর চেষ্টা করুন। জাহান্নামের ভয়-ভীতি আর জান্নাতের আগ্রহ-প্রত্যাশা অনেক অনেক উপকারী। এটা বিরাট কাজে আসবে। মনের মধ্যে যদি আল্লাহর ভয় জন্মে আর পরকালের জিজ্ঞাসাবাদ ও হিসাবকিতাবের অকাট্য বিশ্বাস সৃষ্টি হয়, তবে এই ইলম অনেক উপকারে আসবে। জীবনের পদে পদে, প্রত্যেক মোড়ে মোড়ে প্রতি মুহূর্তে তা এসে হাত ধরবে। সেই বারণ করবে। সেই ভীতি প্রদর্শন করবে। ব্যাস, এ দুটি কথা আমার ওছিয়ত বা উপদেশ বা পরামর্শ হিসেবে কিংবা আহ্বান হিসেবে রইল। আপনারা এগুলো স্মরণ রাখুন।

মুসলিম উম্মাহর মায়েদের প্রতি একটি পয়গাম

আজ আমি একজন জীবনী রচয়িতা হিসেবে বলছি। এটা প্রশংশার কথা নয়। তবে নিজের কথার একটু ভারত্ব সৃষ্টির জন্য বলছি। আল্লাহ পাকের হুকুম এবং তার মর্যাদা অনুযায়ী লেখার যেসব বিষয়বস্তু রয়েছে, তন্মধ্যে বিশেষত জীবনী রচনার বিষয়ে আমায় দান করা হয়েছে আকর্ষণ-শক্তি। আমার বড় সৌভাগ্য যে, আমি বুযুর্গানে দ্বীন ও আল্লাহওয়ালাদের জীবনচরিত অনেক পড়েছি। আরবীতে, ফার্সীতে এবং উর্দূ ভাষায়ও। আর তাদের জীবনচরিত পাঠ করেছি, যাদের ব্যাপারে সমগ্র পৃথবী একমত যে, তারা আল্লাহর মাকবুল ও প্রিয়পাত্র ছিলেন। আর যদি বলা হয়, তারা উম্মতের হিরা-জহরত, তবে কি তাদের অপমান হবে! তারা উম্মতের গর্ব। আর এটা উম্মতের ও দ্বীনের সত্যতার প্রমাণ স্বরূপ। তাদের মধ্যে যতগুলো বড় বড় নাম নেওয়া যায়, তন্মধ্যে রয়েছে হযরত আব্দুল কাদির জিলানী রহ. এর নাম আর ভারতে এলে হযরত খাজা নিযামুদ্দীন আউলিয়া রহ. এর নাম। আমি কেবল তাদের দু'জনের নামই এখানে উল্লেখ করলাম। এই দুই মহান বুযুর্গের জীবনী আমি পড়েছি। তাদের যারপরনাই নির্ভরযোগ্য উৎসসমূহে এবং আমার সম্পর্ক যেহেতু নদওয়াতুল উলামা ও এর গ্রন্থাগারের সাথে, এজন্য তাদের বই-পুস্তক পড়ার সুযোগ আমার যথেষ্ট হয়েছে। বড় বড় জ্ঞানী-গুণীদের যার সুযোগ হয় নি। আমি তাঁদের দুজন সম্পর্কে পরিষ্কার বলতে পারি, তাদের উপর যে মৌলিক এবং সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়েছে, তা তাদের মায়েদের।

হযরত আব্দুল কাদির জিলানী রহ. যখন বাগদাদের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন, যাতে সেখানে এসে দ্বীনী শিক্ষা হাসিল করতে পারেন। বলা বাহুল্য, বাগদাদ তৎকালীন সময়ে গোটা মুসলিম বিশ্বের কেবল খেলাফতের কেন্দ্রস্থলই ছিল না বরং সবচেয়ে বড় দারুল উলূম ও দারুল ইলম (বিদ্যালয়-মহাবিদ্যালয়) ছিল। জ্ঞান-গবেষণার কেন্দ্র ছিল। আত্মশুদ্ধি-আধ্যাত্মিকতার কেন্দ্রস্থল ছিল। উঁচু স্তরের পীর-মুর্শিদ ও মুরব্বীগণ বিদ্যমান ছিলেন সেখানে। শিক্ষা-দীক্ষার এমন সুব্যবস্থা সেখানে ছিল, যা অন্য কোথাও ছিল না। আর খেলাফতের ছায়া ছিল ওখানে। এ ঘটনা ইতিহাসের কিতাবে লিখা আছে। যখন হযরত আব্দুল কাদির জিলানী রহ. রওনা হচ্ছেন, তখন তার মা বললেন, 'শোন বৎস! আমি তোমাকে একটি উপদেশ দিচ্ছি, কখনও মিথ্যা বলবে না। সুতরাং ঘটনায় লিখা আছে, তার কাফেলা চলতে লাগল। সে যুগে কাফেলায় দলবেঁধে সফর করা হত। আগের সে যুগে ছিনতাই, লুটতরাজও হত। পথিমধ্যে ডাকাতও পড়ত। সুতরাং একদল ডাকাত তার কাফেলার উপর আক্রমণ করল। কিন্তু আল্লাহই জানেন, ডাকাতদল কেন কাফেলার প্রত্যেককে ডেকে-ডেকে প্রথমে জিজ্ঞাসা করল, তোমার কাছে কী আছে? কিন্তু জবাবে প্রত্যেকেই বলল, আমার কাছে কিছুই নেই। আমি একেবারে শূন্যহস্ত। তারপর ডাকাতদল অনুসন্ধান চালাত এবং দেখত তার কাছে কী ধন-সম্পদ আছে আর সবকিছু হাতরিয়ে নিত। আবার তাকে অপদস্তও করত এবং শাস্তিও দিত। ব্যাস, সকলের সাথে এরূপই চলতে থাকে তার কাফেলার লোকদের সঙ্গে। এমনকি কিছু লোক হযরত আব্দুল কাদির জিলানী রহ. এর নিকটেও আসে এবং বলে, কিছু আছে তোমার কাছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ আছে! আমার নিকট কিছু স্বর্ণমুদ্রা আছে। যা আমার মা থলেতে ভরে সিলিয়ে দিয়েছিলেন, সেগুলো আছে। ইতিহাস লিখে, কেবল এই একটি বাক্যের কারণে পুরা ডাকাতদল, তাদের সবাই তাওবা করে নিল। আহ! আহ! এতটুকু ছেলে!! সবাই মিথ্যা বলে আর এ সত্য কথা বলছে। সে-ও তো বলতে পারত, আমার কাছেও কিছু নেই। আর তার আকার-আকৃতি, পোশাক-পরিচ্ছদ দেখে তো পরিষ্কার বুঝা যায়, সে কোনও বড় ঘরের ছেলে নয়। অথচ সে স্পষ্ট বলে দিল, আমার কাছে এই সম্পদ আছে। তারপর!!

তারপর ডাকাতদল সম্পদও ফিরিয়ে দিল এবং নিজেদের দুষ্কৃতি-ডাকাতির পথও ত্যাগ করল। গ্রহণ করল ঈমান। এটা ঐতিহাসিক একটি ঘটনা। আপনারা প্রায় বুযুর্গের জীবনচরিতে দেখতে পাবেন, তাদের শিক্ষা-

দীক্ষায় সবচেয়ে বড় ভূমিকা ছিল মায়ের, তাদের বড় বোনের, তাদের পরিবারের লোকজনের। রাসূলে কারীম সা. এর প্রতি এমন গভীর প্রেম-ভালবাসা, যা অপর কারও প্রতি হবে না, তাঁর নামে প্রতিটি মানুষেরক ব্যাকুল হয়ে যাওয়া, চরম সম্মানের সাথে তার নাম উচ্চারণ করা এবং একেই বরকতময় ও কল্যাণকর মনে করা সবই ঘরের পরিবেশ থেকে জন্ম নেয়। অনুরূপভাবে খোলাফায়ে রাশেদীনের প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি, সম্মান ও সুধারণা পোষণ এবং তারা সুযোগ্য ছিলেন, খেলাফতের এই ক্রমধারাই সঠিক ইত্যাদি আকীদা-বিশ্বাসগুলো ঘরেই সৃষ্টি হয়। তারপর পাপাচার ও খারাপ কাজ থেকে দূরে থাকা এবং ঘৃণা পোষণ কোনও চারিত্রিক শিক্ষা সৃষ্টি করতে পারে না। এটাও গৃহশিক্ষা সৃষ্টি করে। কারও মন ভাঙা অনুচিত। অবিচার-বেইনসাফী করা অনুচিত। কোনও বুযুর্গ বা বড়র সাথে বেয়াদবী করবে না। শরী'অত পরিপন্থী কোনও কাজ করবে না– এসব এমন বিষয়, যা কোনও যুক্তি-প্রমাণ ও দর্শনে সৃষ্টি হয় না; ঘরের পরিবেশ থেকে সৃষ্টি হয়। মা-বাবার বলা-বলির দ্বারা সৃষ্টি হয়। এসবের মধ্যে সবচেয়ে বড় যে বিষয়, তা হল, শিরকের প্রতি ঘৃণা থাকতে হবে। শিরকের যত রূপরেখা হতে পারে, যেমন– আল্লাহ ছাড়া কাউকে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, জগতস্বামী, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডায় কর্তৃত্ববান এবং লাভ-লোকসান, ক্ষতি-উপকারের মালিক মনে করা ইত্যাদি সব ধরনের শিরকের ঘৃণা পোষণ করতে হবে। এসব নিছক দলীল-প্রমাণ দ্বারা নির্গমন হয় না। উৎসাহমূলক, প্রকাশ্য ও পরোক্ষভাবে এ ধরনের আলোচনা, কথাবার্তা ঘরের মধ্যে সর্বদা হতে হবে। শৈশব থেকেই হযরত ইবরাহীম আ. এর ঘটনাবলী যেমন, তিনি সব ধরনের শিরককে প্রত্যাখ্যান করে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে পছন্দ করেছেন, আর আল্লাহ তা'আলা সে অগ্নিকেই তার জন্য রহমত বানিয়ে দিয়েছেন।

এ ঘটনা এমনভাবে শোনাবেন, যাতে শিশুদের মনে খোঁদাই হয়ে যায়। এ শিরকের প্রতি ঘৃণা জন্মে। এরপর আল্লাহ পাক আরও তাওফীক দিন। যাতে বিদ'আত-কুসংস্কারের প্রতি ঘৃণা হয়। আজ আমাদের দেশে কি সব হচ্ছে? বিশ্ববিদ্যালয় কি নেই? সে লোক কি নেই, যে ইউরোপ-আমেরিকা গমন করে এবং সেখানের উন্নতি-অগ্রগতি প্রত্যক্ষ করে? কিন্তু কিরনাটক বেতার কেন্দ্র থেকে সামান্য সময়ের জন্য উর্দূ ভাষা সম্প্রচার করা হল, কিছু সংবাদ উর্দূতে পরিবেশন করা হল, এতে এতই ক্রোধ-উত্তেজনা এসে গেল যে, চল্লিশজন মানুষ নিহত হয়ে গেল! এই মানসিকতা কোত্থেকে তৈরী হল? কোথায় গেল সেসব বিশ্ববিদ্যালয়? কোথায় গেল সেসব দার্শনিকের

এ্যাথেক্স ডিপার্টমেন্ট। কোথায় সেসব রচনাবলী ইউরোপের বড় বড় চরিত্রজ্ঞানী ও প্রকৃতিবিদ আর ভারতের বড় বড় লেখক যোগীদের? উর্দূ ভাষা বলা এবং তা কানে পড়ার কারণে এমন সাজা দেওয়া হল যে, বহু লোকের রক্তস্রোত বয়ে গেল। বাধ্য হয়ে সরকারকে সেখানে হস্তক্ষেপ করতে হল। তা ছাড়া এ ধরনের আরও যতগুলো ঘটনা রয়েছে, শিশুদের উপর হাত তোলা, শিশু নির্যাতন এমনকি যেসব কাজ ভাষায় ব্যক্ত করার মতো নয়, তা হয়ে যাওয়া এবং এই যে দাঙ্গা-হাঙ্গামা হচ্ছে, তাতে যে শোষণ-তোষণ, খুন-খারাবী, হত্যা-লুটতরাজ ও মানবতা বিদ্বেষের বিষ-বাষ্প পাওয়া যায় –এসব কিসের পরিণতি? আমি পরিষ্কারভাবে বলছি– এসবের কারণ, আমাদের ঘরগুলোতে মুসলমানের হোক চাই হিন্দুদের, তাদেরকে সে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে না, সেই ঈমানী প্রশিক্ষণ ও চারিত্রিক দীক্ষা দেওয়া হচ্ছে না, যার ফলে শিশুরা যখন মাতৃকোলে প্রতিপালিত হয়ে যুবক হবে, তখন তার মন-মানসে সেসবই বদ্ধমূল থাকবে এবং অন্তর-আত্মায়, হৃদয় মানসপটে সেসব জিনিস গেঁথে থাকবে। আজ যেসব ভুল-ত্রুটি পরিলক্ষিত হচ্ছে, সেগুলো গোড়ার ভুল। আজ গোড়া থেকেই সেসব জিনিস গেঁথে দেওয়া হয় না। অন্তরে পবিত্র-পরিচ্ছন্ন জিনিস বদ্ধমূল করা হয় না, যার ফলে মন্দতা ও অনিষ্টতার প্রতি ঘৃণা জন্মাবে। শোষণ-তোষণের প্রতি তাদের ঘৃণা জন্মাবে, মানুষকে কষ্ট দিতে, মানুষের মন ভাঙতে, মানুষের অধিকার হরণ করতে প্রাণ কেঁপে উঠবে। এদেশে অনেক দরবেশ-বুযুর্গ গত হয়েছেন। তাদের জীবনচরিত পাঠ করুন। এ বীজ সর্বপ্রথম এবং সূচনাতে তাদের ঘরেই রোপিত হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা এখানেও এরূপ বংশ-পরিবার সৃষ্টি করেছেন, বুযুর্গ-দরবেশের পরিবার সৃষ্টি করেছেন এবং আলোক উলামাদের বংশ সৃষ্টি করেছেন, যেখানে প্রথম থেকে এসব বিষয়ে আগ্রহ-প্রেরণা সৃষ্টি করা হয়। আমি আপনাদের সামনে বলতে চাই, আমার শৈশব থেকে যে দুটি বিষয়ের লক্ষ্য রাখা হয়েছে, আমার শিক্ষা-দীক্ষায় আমি তার অনুগ্রহের দান। আমি 'কাওয়ানে যিন্দেগী' গ্রন্থে একথা লিখেছিও। আর আপনাদেরকেও বলছি, প্রথমত কোনও হারাম লোকমা-কোনও হারাম খাবার যেন আমার পেটে না-ঢুকে। দ্বিতীয়ত আমি যেন কারও মনে কষ্ট না-দিই। আজ এরই অভাব। আপনারা যা কিছু দেখতে পাচ্ছেন এবং এদেশের যে অধঃপতন দেখতে পাচ্ছেন এবং সেসব কর্মকাণ্ড, সেসব পদক্ষেপ-অপতৎপরতা –যা মানবতা বিরোধী, যা ভদ্রতা-সভ্যতা বিরোধী, যা মানবীয় স্বভাব বিরোধী এসব যা

কিছু আজ হচ্ছে, এগুলো তারই পরিণতি অর্থাৎ ঘরের শিক্ষা আজ বিলুপ্ত হয়ে গেছে এবং সকল শিক্ষা-দীক্ষা স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে। সংবাদপত্র থেকে শিখবে। যা কিছু শিখতে হয় কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পড়বে ও শিখবে। ঘরে স্বভাব-চরিত্র, নীতি-নৈতিকতার কোনও কথা এরূপ বলা হয় না। মাশাআল্লাহ! কিন্তু হয়তো শতকরা দশ কি পাঁচটি ঘর এমন পাওয়া যাবে, যেখানে শৈশব থেকেই আকীদা-বিশ্বাস শুদ্ধ-সংশোধন করা, আল্লাহর প্রতি ভয়, তার রাসূল সা. এর সাথে ভালবাসা সৃষ্টি করা, মানুষের সম্মান প্রদর্শন এবং মিথ্যা, প্রতারণা ও শঠতা থেকে বাঁচার শিক্ষা দান, আল্লাহর নিকট দু'আ-প্রার্থনা করা, যাচনা করা, একেই কার্যকরী-ফলপ্রসূ মনে করা, একজন মানুষ চাই সে কোন ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণী, পেশা ও মানেরই হোক, তার মনে কষ্ট না দেওয়া বরং তার সাহায্য করা ইত্যাদির দীক্ষা দেওয়া হয়। আজ এসব বিষয় ওঠে গেছে। প্রথমত দেখুন! আজ এমন সব ঘটনা ঘটে, যদ্দরুন বিশ্বাস করাই কঠিন হয়, কোন শিশু তার খাবার অপরকে অধিক ক্ষুধার্ত বলে দিয়ে দিবে ও খাইয়ে দিবে। আর আত্মত্যাগ ও আত্মনিবেদনের যেসব ঘটনা বিভিন্ন খানকাতে পরিলক্ষিত হওয়ার কথা ছিল, সেসব গৃহশিক্ষারই সুফল।

নারীগণ লক্ষ্য রাখবেন, নতুন প্রজন্মের লালন-পালন ও তত্ত্বাবধান করতে হবে। তাদেরকে সঠিক দীক্ষা দিতে হবে। তাদের আকীদাগুলোও শুধরে দিতে হবে। তাদরে স্বভাব-চরিত্রও সংশোধন করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে তাদের মন-মানসিকতাও গড়ে দিতে হবে। দেখুন, মানসিকতা গড়ার ব্যাপার। আমি হৃদয়-মানসপটের যে কথা বলেছি, আমি যে গোড়ার কথা বলেছি, একটি জিনিস হল জ্ঞান হওয়া আরেকটি জিনিস হল, মন হওয়া ও মানসিকতা হওয়া– আসল রাজত্ব যার। আর পৃথিবীতে যা ভাল-মন্দ সৃষ্টি করে, তা জ্ঞান হওয়া নয়। জ্ঞান তৈরীকারী লোকদের ইতিহাস আমি পড়েছি। আমি ইউনানী ইতিহাস পড়েছি। ইরানের ইতিহাস পড়েছি। চরম উৎকর্ষতার যুগে কি ছিল চারিত্রিক অবস্থা, কেউ বর্ণনা করতে পারে না।

কিন্তু মূলত তাদের আকীদাগুলো সুদৃঢ় করতে হবে। ভাল ও খারাপ হওয়ার উপলব্ধি জন্মগতভাবে, সহজাতভাবে সৃষ্টি করতে হবে। এতে যেন কষ্ট-ক্লেশের প্রয়োজন না হয়। আপনাআপনি ঘৃণা আসুক। খারাপের প্রতি ঘৃণাই না হোক। আমি অক্ষমতা প্রকাশ করে বলছি, এর প্রতি ঘৃণা আসুক যে, তুমি কিসের নাম নিয়েছ! তাওবা! তাওবা! ভবিষ্যতে আর বলবে না! অর্থাৎ শিশু শিশুকে বলবে, বন্ধু বন্ধুকে বলবে, তুমি এখন কী নাম মুখে

নিয়েছ; ভবিষ্যতে আমি আর তা শুনতে চাই না। তুমি চুরির নাম নিয়েছ! তুমি জুলুমের নাম নিয়েছ। তুমি ছুরি চালানোর, খঞ্জর ঢুকানোর নাম নিয়েছ, তুমি অপমান করার নাম নিয়েছ। আমি এসব কথা শুনতে পারি না; শুনতে চাই না।

আর এমন নারীর জন্ম হবে, যার নিজেরও গুনাহের প্রতি ঘৃণাবোধ থাকবে, ভ্রান্ত আকীদাগুলোর প্রতি ঘৃনাবোধ থাকবে। অধিকন্তু কখনও সুযোগ পেলে মানুষের মধ্যেও এর অনিষ্টতা ও ঘৃণাবোধ জাগাবে। আল্লাহ তা'আলা সবাইকে সে তাওফীক দান করুন এবং সাফল্যমণ্ডিত করুন। আমীন।

ওয়ালীআল্লাহদের মা

সুলতানুল মাশাইখ হযরত খাজা নিযামুদ্দীন আউলিয়া রহ.

হযরত নিযামুদ্দীন আউলিয়া রহ. এর বয়স তখন পাঁচ বছর। সহসা পিতৃছায়া উঠে গেল মাথা থেকে। তার মা ছিলেন সমকালের একজন পুণ্যময়ী ও আল্লাহওয়ালা রমণী। তিনি এই ইয়াতীম রত্নটির লালন-পালন এবং ধর্মীয় শিক্ষা ও চারিত্রিক দীক্ষার ব্যবস্থা করেন অসীম সাহসিকতা আর পিতৃস্নেহের সাথে। যখন সম্মানের পাগড়ি পরিধানের সময় হল, তিনি তখন মায়ের কাছে এসে বললেন, মুহতারাম উস্তাদ পাগড়ি প্রদানের আদেশ করেছেন। আমি পাগড়ি আনব কোত্থেকে? মমতাময়ী মা বললেন, বাবা শান্ত হও! মন স্থির রাখ। আমি এর ব্যবস্থা করব। সুতরাং তিনি তুলা ক্রয় করে প্রথমে সুতা বানালেন, তারপর দ্রুত পাগড়ি প্রস্তুত করে দিলেন। মা জননী এ উপলক্ষ্যে সানন্দে দেশের অনেক আলেম, নেনকার বুযুর্গদের দাওয়াত করলেন।

হযরত খাজা রহ. বললেন, আমার আম্মাজানের নিয়ম ছিল, যেদিন আমাদের ঘরে রান্নার কিছুই থাকত না, সেদিন আম্মাজান বলতেন– আজ আমরা সবাই আল্লাহর মেহমান। একথা শুনে আমার বেশ আনন্দ হত। সহসা একদিন আল্লাহর কোনও বান্দা ঘরে এসে এক ঝুড়ি আটা দিয়ে গেলেন। ফলে তা দিয়ে পর পর বেশ কয়েকদিন রুটি তৈরি হতে থাকে। আমি সঙ্কোচে এতটুকু হয়ে গেলাম। তীব্রভাবে আকাঙ্ক্ষা করতে লাগলাম– আমার মা জননী কবে বলবেন, আজ আমরা সবাই আল্লাহর মেহমান। অবশেষে একদিন ফুরিয়ে গেল সে আটা। আর আম্মাজান বললেন, আজ আমরা সবাই আল্লাহর মেহমান। একথা শুনে আমার মধ্যে এত আবেগ-উচ্ছাস ও আনন্দ ঠিকরে পড়ল যে, তা ভাষায় ব্যক্ত করার নয়।

একদিন খাজা সাহেব রহ. তাঁর মায়ের মৃত্যুর কথা বর্ণনা করলেন। কথায় কথায় হঠাৎ তাঁর এত কান্না পেয়েছিল যে, তাঁর কথাগুলো পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল না। তখন তিনি আবৃত্তি করেন,

افسوس ولم کہ ہیچ تدبیر نہ کرد
شبہائے وصال را زنجیر نہ کرد

(আক্ষেপ! শত কষ্ট-দুঃখ বুকে
যায় নি করা কোনও তদবীর,
গেল না তারে বাঁধা ওরে
টানিয়া শিকল-জিঞ্জীর ।)

হযরত খাজা সাহেব রহ. বলেন, একদিন নতুন চাঁদ দেখে মায়ের কাছে হাজির হলাম। পদচুম্বন করলাম তাঁর। যথারীতি নতুন চাঁদের শুভেচ্ছা জানালাম তাকে। তিনি বললেন, পরের মাসে চাঁদ উঠলে কার পদচুম্বন করবে? আমি বুঝে ফেললাম, তাঁর মৃত্যুর সময় নিকটবর্তী। ভারাক্রান্ত হয়ে গেল আমার মন। কাঁদতে শুরু করলাম আমি। বললাম, সম্মানিতা মা জননী! এই নিঃস্ব-অসহায়কে আপনি কার হাতে ন্যস্ত করছেন? মা বললেন, এর জবাব আগামী দিন দিব। আমি বললাম, আজ এখন কেন দিচ্ছেন না? এরপর তিনি বললেন, যাও! আজ রাতটা শাইখ নাজীবুদ্দীন রহ. এর ওখানে কাটাও। আমি তাঁর কথামত সেখানে গেলাম। শেষ রাতে প্রায় সকাল বেলা তাঁর খাদেমা দৌড়ে এসে বলল– জননী তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। আমি জানতে চাইলাম, তিনি ভাল আছেন তো? বলল, হ্যাঁ! আমি যখন মায়ের খেদমতে এসে হাজির হলাম, তখন তিনি বললেন– কাল তুমি আমাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করেছিলে, আমি তার জবাব দেওয়ার অঙ্গিকার করেছিলাম। এখন আমি তার জবাব দিচ্ছি। মনোযোগ দিয়ে শোন! এরপর বললেন, তোমার ডান হাত কোনটি? আমি ডান হাত বাড়িয়ে দিলাম। তিনি আমার হাত তার হাতের মুঠোয় নিলেন। বললেন, "হে আল্লাহ! আমি একে তোমার দায়িত্বে ন্যস্ত করছি।" একথা বলা মাত্র তার প্রাণবায়ূ বেরিয়ে গেল আল্লাহর সান্নিধ্যে। আমি এজন্য মহান আল্লাহর অশেষ শোকরিয়া করলাম। মনে মনে বললাম, আমার মা যদি স্বর্ণ-মুক্তায় ভরা একটি ঘর রেখে যেতেন, তাতে আমার এত বেশি আনন্দ হত না।

হযরত সাইয়িদ আহমদ শহীদ রায়বেরলী রহ.

এমন মা পৃথিবীতে খুব কমই আছেন, যিনি আপন পুত্রের জীবন পরীক্ষায় পূর্ণ অবতীর্ণ হয়েছেন। নিজ হাতে বিদায় দিয়েছেন মৃত্যুর জন্য। আল্লাহ তা'আলা এমন মা-ই দিয়েছিলেন হযরত সাইয়িদ শহীদ রহ.কে। যিনি ছিলেন হযরত আসমা রাযি. এর পথিকৃৎ। একবার এক যুদ্ধ চলাকালে সাইয়িদ সাহেব আগ্রহ প্রকাশ করলেন, তিনি এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবেন। কিন্তু গৃহপরিচারিকা তাকে যেতে দিল না কিছুতেই। মা জননী তখন নামায

পড়ছিলেন। সাইয়িদ সাহেব ছিলেন অপেক্ষায় দণ্ডায়মান– মা সালাম ফিরালে পরে গিয়ে অনুমতি চাইবেন। তিনি সালাম ফিরানোর, গৃহপরিচারিকাকে বললেন, বুয়া! আহমদের প্রতি তোমার অবশ্যই মহব্বত আছে। কিন্তু আমার মতো আদৌ নয়। এটা বারণ করার সময় ছিল না। যাও বেটা! আল্লাহর নাম নিয়ে যাও। কিন্তু সাবধান! পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে না। অন্যথায় তোমার মুখ দেখব না।

হযরত মাওলানা ফযলুর রহমান গঞ্জেমুরাদাবাদী রহ.

হযরত মাওলানা ফযলুর রহমান গঞ্জেমুরাদাবাদী রহ. এর মা ছিলেন বড় যাহেদ, তাওয়াক্কুলওয়ালা, দুনিয়াবিমুখ ও আল্লাহর উপর নির্ভরশীল রমণী। তিনি বলেন, আমার বয়স তখন বার/তের বছর, আমার সম্মানিতা আব্বাজান ইন্তিকাল করলেন। হাতে যে টাকা-পয়সা ও পুঁজি ছিল, কিছুদিনের মধ্যে তা খরচ হয়ে গেল। ভারী সঙ্কটে পড়ে গেলাম আমরা। আম্মাজান যতদিন দৈন্যদশা ছিল বাড়ির গেট বন্ধ রাখেন। বাড়ির ভিতর যে গাছ ছিল, তার পাতালতা ছিড়ে সিদ্ধ করে খেয়ে নিতেন। কাউকে নিজের অবস্থা সম্পর্কে জানতেই দিতেন না। অথচ আত্মীয়-স্বজনের অনেকেই ছিলেন, যারা সাহায্য করতেন। কিন্তু তার এটা পছন্দ ছিল না।

হযরত মাওলানা ইলিয়াছ সাহেব কান্ধেলবী রহ.

মাওলানা ইলিয়াছ রহ. ছিলেন কান্ধেলা, মুযাফ্ফর নগর জেলার এক প্রসিদ্ধ সম্ভ্রান্ত বংশের বিশিষ্ট এক বুযুর্গ। সেসময় কান্ধালার এই বংশ ছিল দ্বীনের প্রাণকেন্দ্র। উজ্জ্বল ফোয়ারা। এ বংশের পুরুষ তো ভাল, নারীদের দীনদারী-ধার্মিকতা, ইবাদত-বন্দেগী, রাত্রিজাগরণ, যিকির ও তিলাওয়াতের ঘটনাবলী এবং তাদের মা'মূলাত (আমলের নিয়মতান্ত্রিকতা) এ যুগের হীনম্মন্য দুর্বলপ্রাণ লোকদের কল্পনারও অনেক ঊর্ধ্বে। ঘরের মধ্যে নারীরা সাধারণত নফল নামাযেও কুরআন শুনত মন দিয়ে। রমাযান শরীফে কুরআনে কারীম পঠন-পাঠনের বিস্ময়কর বসন্ত বিরাজ করত। জায়গায় জায়গায় ঘরে ঘরে কুরআনে কারীম থাকত। পড়া হত দীর্ঘ সময় পর্যন্ত। মহিলাদের এত বেশি ইলম-জ্ঞান ও আগ্রহ ছিল, যার ফলে তারা কুরআনে কারীম পড়ে পড়ে স্বাদ গ্রহণ করত। নামাযে এতই নিমগ্নতা ও ধ্যান-তন্ময়তা ছিল, যার ফলে অনেক সময় কোনও কোনও নারীর ঘরে পর্দার ব্যবস্থা করা, এমনকি ঘটনা-দূর্ঘটনায় ঘরে মানুষের আসা-যাওয়ারও অনুভূতি থাকত না।

কুরআনে কারীম তরজমা ও উর্দূ তাফসীরসহ, মাযাহেরে হক, মাশারিকুল আনওয়ার, হিসনে হাসীন ইত্যাদি ছিল নারীদের সর্বোচ্চ নেসাব (পাঠ্যসূচি)। বংশ-পরিবাররে যার ব্যাপক প্রচলন ছিল। সেসময় ঘরের ভেতর-বাইরের বৈঠক ও মিলনমেলাগুলো সতজে-প্রাণবন্ত ছিল হযরত সাইয়িদ সাহেব রহ. এবং হযরত আব্দুল আযীয রহ. এর বংশও পরিবারের ঘটনাবলী চর্চায়। সেসব বুযুর্গদের ঘটনাগুলো ছিল পুরুষ ও নারীদের মুখে মুখে। মায়েরা, বোনেরা এবং গৃহপরিচারিকা নারীরা শিশুদেরকে তোতা-মীনার কাল্পনিক মিথ্যে কিচ্ছা-কাহিনীর পরিবর্তে শোনাতেন এসব আত্মশুদ্ধি ও আধ্যাত্মিক ঘটনাবলী। হযরত মাওলা ইলিয়াছ রহ. একদিন এ ধরনের অবস্থাবলী আলোচনার পর বলেন, এই তো ছিল মাতৃকোল, যেখানে আমরা বেড়ে উঠেছি। আজ এমন মায়ের কোল কোথায় পাওয়া যাবে?

হযরতের নানী বিবি আমাতুর রহমান – যিনি ছিলেন মাওলানা মুযাফ্ফর হুসাইন রহ. এর কন্যা। যাকে তাঁর বংশে সাধারণত "উম্মী বী" নামে ডাকা হত, তিনি ছিলেন একজন রাবেয়া চরিত্রের নারী। শেষ বয়সে তার অবস্থা হয়েছিল এমন যে, তিনি কখনও নিজে খাবার চেয়ে খেতেন না। কেউ এনে রেখে দিলে খেয়ে নিতেন। ঘর ছিল বড়। কাজের চাপ এবং অধিক ব্যস্ততার কারণে কারও খেয়াল না-হলে ক্ষুধার্ত বসে থাকতেন। একবার কেউ বলল– আপনি এরূপ দুর্বল-নিঃস্ব অবস্থায় থাকেন কিভাবে? তখন তিনি বললেন, আল-হামদু লিল্লাহ! (আল্লাহর শোকর) আমি তাসবীহ-তাহলীলের দ্বারা আহার করে নিই।

স্বয়ং মাওলানার মাতা মহোদয় খুবই ভাল হাফেযায়ে কুরআন ছিলেন। তিনি কুরআনে হিফয করেছিলেন বিয়ের পর। আর এতই ইয়াদ ছিল, কোনও সাধারণ হাফেয তার সম্মুখে দাঁড়াতে পারত না। নিয়ম ছিল, রমাযানে প্রতিদিন পূর্ণ কুরআন শরীফ এবং অতিরিক্ত দশ পারা পড়ে নিতেন। পড়া এত চালু ছিল যে, ঘর-দুয়ারের কাজকর্ম ও ব্যবস্থাপনায় বিঘ্ন ঘটত না বরং তিলাওয়াতের সময়ও হাতে কোনো কাজ চালিয়ে যাওয়ার অভ্যাস ছিল। এসব পুণ্যময়ী ঈমানদীপ্ত রমণীদের ঈমান-আমল, আখলাক-চরিত্র ও জীবনধারার সুফলে তাদের প্রভাবময় সংশ্রবের অবারিত কল্যাণে হযরত মাওলানা ইলিয়াছ রহ. এর মতো বুযুর্গ তৈরি হয়েছেন, যার মাধ্যমে বিশ্ব মুসলিম উম্মাহর বিরাট উপকার এবং প্রভূত কল্যাণ সাধিত হয়েছে।

সমকালের প্রসিদ্ধ কবি ডাঃ স্যার মুহাম্মদ ইকবাল রহ, যার কবিতাগুলো ঈমানী চেতনা আর অন্তর্জ্বালায় পরিপূর্ণ। যিনি তাঁর সেসব

কবিতার মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহকে এনে দিয়েছেন নতুন জীবন। দান করেছেন নতুন স্বপ্ন, আশা-ভরসা আর হৃদয়োত্তাপ। তিনি তার সকল উন্নতি, জাগরণ, ঈমানী চেতনা আর অন্তর্জ্বালা ও দহনকে ভাবতেন আপন মায়ের লালন-পালন এবং পবিত্র গর্ভের সুফল। বলতেন, আমার মধ্যে ঈমান ও এশকের যে জ্বলন-অগ্নিস্ফুলিঙ্গ আছে, তা আমার মায়ের শিক্ষাদীক্ষার ফসল। আমি যা কিছু পেয়েছি, সবই তার কোল এবং তার শিক্ষাদীক্ষায় পেয়েছি। এই অমূল্য ধন-রত্ন পাওয়া যায় ঈমানদার ধর্মানুরাগী মায়ের দীক্ষার কোল থেকে। কলেজ-ইউনিভার্সিটিগুলো থেকে নয়। তিনি সেকথাই বলেছেন নিম্নোক্ত কবিতায়।

مرا داد ایں پرور جنونے
نگاہ مادر پاک اندرونے

زمکتب و چشم ودل نتواں گرفتن
کہ مکتب نیست جز سحر وفسونے

আমার মুহতারামা আম্মাজান (খাইরুন নিসা রহ.)

[উল্লেখ্য যে, হযরত মাওলানা আবুল হাসান আলী মিয়া রহ. তাঁর সম্মানিতা মা মহিয়সী রমণী খায়রুন নিসা রহ. এর সংক্ষিপ্ত জীবনী "যিকরে খয়ের" নামে রচনা করেছেন। নিচে তারই গুরুত্বপূর্ণ কিছু অংশ সংযোজন করা হচ্ছে। হযরত মাওলানার একটি চমৎকার শিরোনাম চয়ন "আউলিয়াদের মা"। এটা তার নিজের ওয়ালী হওয়ার স্বরগোতুক্তি নয়। তিনি নিজেকে একজন ওয়ালী মনে করে তাঁর (মায়ের) আলোচনা করেন নি। কিন্তু এই অধম লেখক এই সংযোজনকে জরুরী মনে করছি। কারণ, হযরত মাওলানা রহ. এর আম্মাজান নিশ্চিত সমকালের একজন বিশিষ্ট কামেল শাইখের মা ছিলেন। আর তাঁর আলোচনা উক্ত শিরোনামের অধীনে আসাই উচিত ছিল।

তিনি বলেন, আমার নানা সাহেবের ছিল দুই পুত্র ও পাঁচ কন্যা। আমার (হযরত মাওলানা) বড় মামা সাহেবের নাম ছিল সাইয়িদ আহমদ সাঈদ। ছোট মামা মৌলভী হাফেয সাইয়িদ উবাইদুল্লাহ সাহেব। আমার মা ছিলেন বোনদের মধ্যে চতুর্থ। তিন বোন ছিল তার বড় আর এক বোন ছোট, নানাজীর জীবদ্দশায়ই তার ইন্তিকাল হয়ে গিয়েছিল। আমার আম্মাজান জন্মগ্রহণ করেন ১৮৭৮ খ্রিঃ/ ১২৯৫ হিজরীতে। তার নাম রাখা হয় খাইরুন্ নিসা। আম্মাজান কয়েকবার বলেছেন এবং সবাই এর সমর্থন অকুণ্ঠ

করেছেন যে, নানাজীর নিজ সন্তানদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি মহব্বত-স্নেহ ও মিল ছিল তার সঙ্গে। বলতেন, কোনও ভাল কিতাব আসলে আমাকে দেখতে দিতেন। আলোচনা করতেন আমার সাথে। আর এটাই ছিল তার সবচেয়ে বড় মনোযোগ ও স্নেহ-মহব্বতের নিদর্শন। বলতেন, আব্বাজান যখন তাহাজ্জুদের সময় উপরতলা থেকে নেমে মসজিদে যেতেন, তখন আমার চোখ খুলে যেত। আমি এবং আমার আরেক বোন সালেহা বিবি দুজনেই আম্মাজনের কাছে উপরতলায় চলে যেতাম। সেখানে তার সাথে নফল পড়তাম এবং লিপ্ত থাকতাম যিকির-আযকার ইত্যাদিতে। আমাদের অপর বোন এবং অন্যান্য সাহোদরদের এতে ভারী ঈর্ষা হত। তারাও চেষ্টা করত এজন্য। কিন্তু প্রায়ই তাদের চোখ খুলত না।

মুহতারাম আম্মাজানের রান্না-বান্না, সেলাই ইত্যাদির প্রতি জন্মগত আগ্রহ ছিল। তিনি এসব ক্ষেত্রে উস্তাদসূলভ দক্ষতা রাখতেন। তাঁর রুচি-মানসিকতা শুরু থেকেই সৃজনশীলতা, নতুন নতুন আবিষ্কার-উদ্ভাবন/তথ্য উপাথ্য বের করা এবং নতুন নতুন অভিজ্ঞতা অর্জনে অভ্যস্ত ছিল। তাকে এসব কাজে বংশের মধ্যে একজন আবিষ্কারক ও একধরনের মুজতাহিদ জ্ঞান করা হত। নানাজীর মানসিকতায়ও (বুযুর্গ ও সাদাসিধে ভাবের সাথে) সূক্ষ্মদর্শিতা ও হাস্যরস ছিল। সুচারু-সুশৃঙ্খল ও ভারসাম্য জিনিস তার পছন্দনীয় ছিল। এজন্য নানা সাহেবও তার দ্বারা প্রায় সময় এ ধরনের কাজ করাতেন। নানা সাহেবের একটি আবা, যা তিনি ঈদের সময় পরতেন– আজও আমাদের হাতে বিদ্যমান আছে। যার উপর আম্মাজানের হস্ত মুবারকের রেশমী কাজ করা আছে। তা দেখে এখনও মনে হয় যেন বড় কোনও হস্তশিল্পী এইমাত্র কাজ শেষ করে ওঠেছেন।

শিক্ষা ও অধ্যায়ন

খান্দানে মেয়েদের শিক্ষাদীক্ষার প্রচলন খুবই সীমিত ও নির্দিষ্ট পর্যায়ে ছিল। মেয়েদের বেশি লেখাপড়া ও শিক্ষা-দীক্ষাকে পছন্দ করা হত না। তা-ও কেবল ধর্মীয় কিতাবাদী, প্রয়োজনীয় মাসয়ালা-মাসয়েল জানা এবং গৃহস্থলী কাজের ব্যবস্থাপনা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। হকপন্থী উলামায়ে কিরামের কিতাবাদী যারা এ বংশের আকীদা-বিশ্বাস ও মতাদর্শের সাথে একমত ছিল, তা এধরনের পাঠ্যভূক্ত ছিল। আমি আম্মাজানের মুখে যেসব কিতাবের নাম বেশি শুনেছি, তন্মধ্যে হযরত কাযী ছানাউল্লাহ পানিপতি রহ. রচিত কিতাব মালাবুদ্দাহ মিন্‌হ, (আকাইদ ও মাসাইল সম্পর্কে) রাহে

নাজাত, হযরত শাহ রফীউদ্দীন রহ. দেহলবী রহ. এর কিতাব কিয়ামতের আলামত প্রসঙ্গে "চেহেল হাদীস (চল্লিশ হাদীস)", শাহ আব্দুল কাদের ও শাহ রফীউদ্দীন রহ. এর তরজমা কুরআন এর কথা আমার স্মরণ আছে।

প্রাথমিক পর্যায়ে ফার্সীও পড়ানো হত। কিন্তু হাতের লেখা সুন্দর করার ব্যাপারে তেমন একটা প্রেরণা/সাহস দেওয়া হত না বরং তা একরকম অপছন্দ করা হত। কোনো কোনো বুযুর্গ তো এ বিষয়ে বড় কঠোর ছিলেন। বলতেন, মেয়েরা লিখা শিখলে তো অন্যদেরকে চিঠিপত্র লিখতে শুরু করবে। কিন্তু আম্মাজানের লিখা এবং লিখা সুন্দর করার প্রতি বিরাট আকর্ষণ-আগ্রহ ছিল। তিনি তাঁর বড় চাচাতো ভাই মৌলভী সাইয়িদ খলীলুদ্দিন সাহেবের কাছে– যিনি পুরো বংশে একজন মান্যবর ব্যক্তি ছিলেন, এর অনুমতি চাইলেন। তিনি তার (আমার আম্মাজানের) আকাঙ্ক্ষা এবং তার দ্বীন-ধর্মীয় অবস্থাচিত্র দেখে প্রয়োজন পরিমাণ এর অনুমতি দেন। আর এতে আমার আম্মাজান তার পরিবেশ-পরিবারের রেওয়াজ এবং আপন বংশের মাপকাঠির বিপরীত বিশেষ মানের হস্তলিখন শিখে ফেলেন। এ বিষয়টি তাকে তার রচনা, গ্রন্থনা ও সংকলনের কাজে বিরাটভাবে সাহায্য করেছে।

যে কিতাবগুলো তিনি সে সময় সবচেয়ে বেশি পাঠ করতেন এবং তার জীবনে ও তার মানসিকতায় গভীর প্রভাব পড়েছে যে কিতাবগুলোর, তন্মধ্যে কাসাসুল আম্বিয়া, মাকাসিদুস বারাযিখ, তরীকুন্ নাজাত এর নাম আমি বারবার শুনেছি। কিছুদিন পর আরও তিনটি কিতাব তার মুতালায়ায় (পাঠে) আসে। সেগুলোর দ্বারাও তিনি বিরাটবাবে প্রভাবিত হোন। একটি নবাব সিদ্দীক হাসান খান রহ. এর রচিত الداء و الدواء (রোগ ও চিকিৎসা) গ্রন্থখানা। যার দ্বারা তিনি বিভিন্ন আয়াতে কারীমার বৈশিষ্ট্য এবং কুরআনিক আমলসমূহ জানতে পারেন। তন্মধ্যে তিনি অনেকগুলো বিষয় নিজের মা'মুল বা নিয়মিত আমল হিসেবে গ্রহণ করেন। দ্বিতীয় কিতাবটি مجربات دیربی এর দ্বারাও তিনি প্রচুর উপকৃত হয়েছেন এবং কাজ করেছেন। তৃতীয়টি হল تعبیر الرویا (স্বপ্নের ব্যাখ্যা)। এ কিতাবে সেসব স্বপ্নের ব্যাখ্যা বর্ণিত আছে, যেগুলো মুহাম্মদ ইবনে সীরীন মানুষের বিভিন্ন স্বপ্নের প্রেক্ষিতে দিয়েছেন এবং তার মূলনীতি বর্ণনা করেছেন। আম্মাজানের এই কিতাব অধ্যায়ন, নিজের অভিজ্ঞতা এবং আল্লাহ প্রদত্ত যোগ্যতার ভিত্তিতে বিভিন্ন স্বপ্নের ব্যাখ্যা প্রদানের সাথে তার বেশ সম্পর্ক হয়ে গিয়েছিল। বংশের অধিকাংশ লোক তার কাছে নিজ নিজ স্বপ্নের ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করত। আর তাঁর (অর্থাৎ আম্মাজানের) প্রায় ব্যাখ্যাই সঠিক প্রমাণিত হত।

সে দিনগুলোতেই একটি বিরাট নেয়ামতের মতোই মরহুম হাতেফ এর একটি মুনাজাতে মানযুম (কাব্যিক প্রার্থনা) তার হস্তগত হয়। যার নাম ছিল নেয়ামতে উয্মা। এর প্রত্যেকটি কবিতাই "আসমায়ে হুসনা" এর কোনও একটি নাম দ্বারা শুরু হয়েছে। আর উক্ত নামের সামঞ্জস্য ও মিল রেখেই সকল বর্ণনা ও মুনাজাত হয়েছে। জানা নেই কে ছিলেন এই হাতেফ? আর তার পূর্ণ নামই বা কি ছিল? কিন্তু আমাদের বংশের জন্য এ হাতেফ অদৃশ্য মানব প্রামণিত হয়। তার এই মাকবুল মুনাজাতের প্রতিটি শব্দে শব্দে খুলূছ-একাগ্রতা, ও দু'আর খাঁটি জযবা ও মনের গহীন থেকে আবেগের ঝরণাধারা ঠিকরে পড়ত। বংশের স্ত্রী-কন্যা ও মেয়েরা এমনকি অনেক পুরুষের জপ ও অযীফা হয়ে গিয়েছে মুনাজাতটি। প্রায় লোকেরই তা মুখস্ত ছিল। বিশেষত যখন কোনও দুঃশ্চিন্তা-পেরেশানীর বিষয় হত কিংবা কোন দুঃখ-যাতনা ও কষ্টের ঘটনা ঘটত, তখন এই মানুজাত ব্যক্তিগত কিংবা সম্মিলিতভাবে অত্যন্ত দরদ নিয়ে পড়া হত। এতে মনে বিরাট প্রশান্তি ও শক্তি সঞ্চার হত।

কুরআন হিফয

পুরুষদের মধ্যে হিফযে কুরআনের রেওয়াজ তো আমাদের বংশে আগে থেকেই ছিল। সব যুগেই বড় বড় সুদক্ষ হাফেযে কুরআন হয়েছে। কিন্তু নারীদের মধ্যে আমার জানা মতে ইতোপূর্বে কোনও হাফেযে কুআন ছিল না। আল্লাহ তা'আলাই জানেন, কী এমন জোয়ার ওঠল– যার ফলে এ শ্রেণীর মধ্যে কুরআনে কারীম হিফয করার অদম্য বাসনা জন্ম নিল। আমি বলছি না যে সর্বপ্রথম আম্মাজানেরই এ আগ্রহ জন্মেছে কিংবা তারই অপর কোনও বোন বা প্রিয়জনের! কিন্তু সে সময় আমার আম্মাজান এবং তার অপর এক বোন সালেহা বি, তার ভাতিজি আরও দু'জন মুসলমান বোন কুরআনে কারীম হিফয করতে শুরু করলেন। তাদের প্রত্যেকেই নিজের কোনও আপনজনের কাছে হিফয শুরু করেছেন. যে ছিল তাদের সহোদর ভাই কিংবা মাহরাম অন্য কেউ। ছোট মামা সাইয়িদ উবাইদুল্লাহ সাহেব খুব ভাল হাফেয ছিলেন। অত্যন্ত বিশুদ্ধ ও চমৎকার কুরআন পড়তেন। আম্মাজান তার কাছেই হিফয শুরু করলেন। এ দুই ভাই-বোনের মধ্যে অনেক স্নেহ-মহব্বত ছিল। আমি খুব কম ভাই-বোনকেই পরস্পরে এমন নিবেদিতপ্রাণ পেয়েছি। যেমন ছিলেন এ দুই ভাই-বোন। সম্ভবত চার/পাঁচ বছরের ছোট-বড় ছিলেন তারা। তিন বছরে হিফয সম্পন্ন করে ফেলেন তিনি। আগে-পরে তার সব বোনই হাফেয হয়ে যায়। তাদের বড় আপন

চাচাতো ভাই মৌলভী সাইয়িদ খলীলুদ্দীন সাহেব এ ব্যাপারে বিরাট সাহস ও পৃষ্ঠপোষকতা দিতেন। আম্মাজান বলতেন, মরহুম ভাই সাহেব প্রতি সপ্তাহে আমাদেরকে দাওয়াত করতেন। আর যখন হিফয সম্পন্ন হল, তখন তিনি এক বিরাট অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন।

আম্মাজানের রমাযান উদ্‌যাপন

কত পুণ্যময় ছিল সে সময়! তারা সবাই তখন তারাবীহ নামাযে এক এক পারা কুরআন পড়তেন। কোন কোন আলেমের ফিকহী সিদ্ধান্ত মতে তাদের নিজস্ব পৃথক জামাত হত। যেখানে নারীই হত ইমাম আর নারীগণই হত মুক্তাদী। ইশার নামাযের পর থেকে সাহরীর প্রায় কাছাকাছি সময় পর্যন্ত এই ধারা চালু থাকত। তারা সকলেই কুরআনে কারীম খুব ভাল পড়তেন। উচ্চারণরীতি ও মাখরাজগুলো ছিল খুবই বিশুদ্ধ। যদি বেয়াদবী না হয়, তবে বলব– আজকের বহু মাদরাসা শিক্ষিত ডিগ্রীধারী মৌলভীদের থেকে তারা অধিক সহীহ এবং উত্তম পড়তেন। তার উপর আত্মিক প্রেরণা, মনের আকুলতা, স্বভাবগত সুরতরঙ্গ ছিল চমৎকার। আমার মনে পড়ে, একবার আমি লুকিয়ে লুকিয়ে দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে আম্মাজানের কুরআন তিলাওয়াত শুনছিলাম। তিনি তখন তারাবীহ পড়াচ্ছিলেন। আমার কাছে মনে হচ্ছিল, যেন আকাশ থেকে বারিপাত হচ্ছে। সেই স্বাদ আজও ভুলতে পারি না। আম্মাজান বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর আব্বাজানকে কুরআন মাজিদ শুনিয়েছেন। ফলে তার মধ্যে আরও দহন সৃষ্টি হয়। শেষ বয়স পর্যন্ত যতদিন তার স্মৃতিশক্তি কাজ করত, ততদিনই তিনি আপন ভ্রাতুস্পুত্র হাফেয সাইয়িদ হাবীবুর রহমান সাহেবের সাথে নিয়মিত দাওর করতেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি নিজের নিয়মিত আমলগুলো করে গেছেন। বিভিন্ন সূরা, বিভিন্ন রুকু ও আয়াতগুলো অত্যন্ত বিশুদ্ধরূপে আর বিশেষত তাজবীদ এবং বিশুদ্ধ মাখরাজ উচ্চারণসহ সমান পড়ে যেতেন।

নিঃস্বতা ও অসহায়ত্ব, দু'আ ও মুনাজাতের আকুলতা

এবার সে মুহূর্তগুলোর কথা বলব, যখন আল্লাহ পাক তাকে আপন কুদরতের বিশেষ নেয়ামতে সম্মানিত করেছেন। দান করেছেন তাকে দু'আ ও মুনাজাতের সেই অমূল্য ধন-রত্ন; যা তার কবূলিয়াত, গ্রহণযোগ্যতা ও উন্নতির মৌলিক গুণ। আর সহস্র সৌভাগ্য ও নেয়ামতের মাধ্যম এবং উৎসমূল হয়েছে। যার দৃষ্টান্ত আমি এই শেষ যুগে কেবলই আল্লাহর একান্ত খাছ বান্দা এবং আকাবির ও মাশাইখে কিরামের মধ্যে দেখেছি।

প্রায়ই দেখা গেছে, যখন কাউকে আল্লাহ পাকের বিশেষ অনুগ্রহ দানের ইচ্ছে হয় এবং আল্লাহ তাআলা কাউকে নিজের কাছে টেনে নিতে চান–প্রিয়পাত্র বানাতে চান, তখন কোন না কোন উপায়ে তার মধ্যে নিঃস্বতা, অসহায়ত্ব, অস্থিরতা, দহন-জ্বালা ও আকুলতা সৃষ্টি করে দেন। শত-সহস্র সুখ-শান্তি কুরবান এই অস্থিরতা-আকলতার উপর– যা সব কিছু থেকে সরিয়ে এনে আল্লাহর দরবারে দাঁড় করিয়ে দেয়। সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে জুড়ে দেয় তার সাথে সুসম্পর্ক। এ অধম গুনাহগারকে আল্লাহ তা'আলা অনেক বুযুর্গানে দ্বীনের জীবনচরিত ও জীবনকর্ম লেখার অনন্য সুযোগ্য দিয়েছেন। প্রায়ই দেখেছি, যার উপর বিশেষ সাহায্য ও করুণা হয়েছে, তার জীবনে অস্থিরতা ও দহন-জ্বালার কোনও কারণ সৃষ্টি করে তাকে সবার মাঝ থেকে উঠিয়ে এনে আপন বানিয়ে নেন। অনেক বুযুর্গের জীবনের গতিধারা বদলে যাওয়া, অবস্থার পরিবর্তন এবং ধ্যান-সাধনার মাধ্যমও এই দহন-জ্বালাই হয়েছে। যাকে অনেকেই "ইখতিলাজ" (আত্মবিস্মৃতি) নামে অভিহিত করেন। আম্মাজান প্রায়ই বলতেন– আমি একবার কুরআনে কারীম পড়ছিলাম। সহসা আমি নিম্নোক্ত আয়াতখানা লক্ষ্য করলাম–

وإذا سألك عبادى عنى فإنى قريب – أجيب دعوة الداع إذا دعان

فليستجيبوا لى وليؤمنوبى لعلهم يرشدون

"যখন আমার বান্দা তোমাকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, তখন (বলে দাও) আমি নিশ্চয় (তার) সন্নিকটে। আমি প্রার্থনাকারীর প্রার্থনা কবুল করি, যখন সে আমার নিকট প্রার্থনা করে। কাজেই তারা যেন আমার হুকুম পালন করে এবং আমার প্রতি ঈমান আনে। যেন তারা সঠিক পথ প্রাপ্ত হয়।" (সূরা বাকারা ঃ ১৮৬)

অনেকবারই হয়তো এ আয়াতে কারীমা পড়েছি। আর সম্ভবত তখন কুরআনের হিফযও সম্পন্ন করে ফেলেছি। কিন্তু তৎক্ষণাৎ আমার চোখ একেবার খুলে গেল। মনে হল, যেন কোনও হারানো বস্তু ফিরে পেয়েছি। আবিষ্কার করেছি নতুন কোনও তত্ত্ব। আম্মাজন বলতেন, মনে হচ্ছিল যেন কেউ মনের পাতায় কিছু লিখে দিয়েছে। কোনও জিনিস মনের গহীনে পরতে পরতে বদ্ধমূল হয়ে গেছে। ব্যাস, আর কি? আমি যেন কোনও রত্নভাণ্ডার পেয়ে গেলাম। সব তালার চাবিই হাতে এসে গেল। সুতরাং একেই দৃঢ়হস্তে আকড়ে ধরলাম। দাঁতে কামড়ে রাখলাম। দু'আ ও প্রার্থনার এমন আকুলতা সৃষ্টি হল, যেন গোটা অস্তিত্ব জগত তাতে অভিভূত হয়ে

গেল। অপরদিকে শুরু হল আত্মবিস্মৃতি। একধরনের নিঃস্বতা, শূন্যতা, আকুলতা, অস্থিরতা সব সময় পীড়িত করতে লাগল। জীবনের পরিণতি, ভবিষ্যতের উদ্বেগ-চিন্তা, সৌভাগ্য ও সাফল্যের আশা-আকাঙ্ক্ষা সব সময় মনেপ্রাণে আচ্ছন্ন থাকত।

এই সার্বক্ষণিক অস্থিরতা, আকুলতা ও দহন-জ্বালায় যদি কোনও কিছুতে প্রশান্তি আসত, তবে তা কেবল দু'আ ও প্রার্থনায়। এটা ছিল ব্যথার উপশম। পোড়া ক্ষতের আশু মলম এবং আত্মার খোরাক। ছিল এক বাতেনী ও আত্মিক শক্তি। যা তাকে সর্বদা দু'আ ও মুনাজাতে লিপ্ত রাখত। নিজেই অস্থির-আকুল করে তুলত। তারপর নিজেই দিত সান্ত্বনা। নিজেই মনকে পোড়াত, করত ক্ষত-বিক্ষত। আবার নিজেই তার উপর লাগাত পট্টি-মলম। নিজেই কাঁদাত। ফের নিজেই মুছে দিত নয়ন অশ্রু, ভেজা চোখ। দু'আ করে, কেঁদে কেঁদে কিছু সময় কেটে যেত। তারপর বুকের অধরে শুরু হত তোলপাড় আর আহত হৃদয়রকে আবারও বেশ বিধ্বস্ত করত। যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনি মন খুলে মুনাজাত করে নিতেন, তার অস্থির প্রাণ স্বস্তি পেত না।

তার প্রত্যেক দু'আর প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস এবং মহান আল্লাহর রহমত (দয়া-করুনার) উপর বেশ সুখ সন্তুষ্টিও ছিল। ভাল ভাল লোকদের মধ্যে আমি দু'আর এই আগ্রহ-আবেগ এবং দু'আতে এমন আস্থা-বিশ্বাস দেখি নি, যেমনটি দেখেছি আমার আম্মাজানের জীবনে। সেই হাদীসে রাসূল সা. এর বাস্তব দৃষ্টান্ত ছিল তার জীবন, যাতে বলা হয়েছে– তোমাদের হাড়ি-পাতিলের লবণ যদি কম পড়ে যায়, তবে তা দু'আরই মাধ্যমে কামনা কর। তোমাদের জুতার ফিতাও যদি ছিঁড়ে যায়, তবে তা-ও আল্লাহ তা'আলার কাছেই প্রার্থনা কর।"

তার গোটা জীবন দু'আ ও মুনাজাতের মধ্যে কেটেছে। সুন্নাত দু'আসমূহ, কাব্যিক মুনাজাত উঠতে-বসতে, শয়নে-জাগরণে প্রত্যেক চিন্তা ও আশঙ্কার মুহূর্তে পড়তে থাকতেন। শৈশব থেকেই আমাদের ভাই বোনদেরকে এর অভ্যস্ত বানিয়েছেন। আমার স্মরণ আছে, আমি যখন সামান্য লিখতে-পড়তে শিখলাম, তখন তিনি আমাকে বললেন– যখন তুমি কিছু লিখবে, তখন বিসমিল্লাহর পরে সর্বপ্রথম এ বাক্যটি লিখবে-

اللهم اتنى بفضلك أفضل ما تؤتى عبادك الصالحين

(হে আল্লাহ! তুমি আমাকে নিজ অনুগ্রহে সর্বোত্তম-সর্বোৎকৃষ্ট বস্তু দান করো। যা তুমি তোমার নেককার পুণ্যবান বান্দাদের দান করে থাক।)

তার প্রতি মুহূর্তের এত দু'আ এবং সুন্নাত ওযীফা মুখস্ত ছিল, যা বহু মাদরাসার ভাল ভাল ডিগ্রিধারী গ্রাজুয়েটদের (মৌলভীদের) অনেকেরই হয়তো মুখস্ত নেই। তার এই কবিতা একদম বাস্তব এবং তার আসল আগ্রহ-আকর্ষণের ব্যাখ্যদান করে। (তিনি বলেন–

تیرا شیوہ کرم ہے اور میری عادت گدائی کی
نہ ٹوٹے آس اے مولا تیرے در کے فقیروں کی

[তুমি তো অসীম দয়ালু মহান
আমি বড় দীন হীন ভিখারী,
আশাহত করো না মাওলা!
এ যে ভগ্ন-কাতর মনভারী।]

তার এ কবিতাই প্রমাণ করে তার ব্যাকুলতা, সে কি মনোত্তাপ! আমি এগুলো অধিকাংশ মুলতাযিম ও মাতাফে (অবস্থানকালে) পড়েছি। অনুভব করেছি বিরাট আকর্ষণ ও উপকারীতা–:

کونسی سرکار ہے جس کا ہے سب کو آسرا
کونسا دربار ہے جس میں ہے ہر کوئی کھڑا-

کونسا وہ شاہ ہے جس کا ہے ہر کوئی گدا
کونسا در ہے نہ جس در سے کوئی خالی پھرا-

اج اسی سرکار سے میں بھی تو پاکر شاد ہوں
اج اسی سرکار سے میں بھی توخوش ہوکر پھروں

(কোথায় সে সরকার আশ্রয় যে সবার; কোথা
সে দরবার, যে কেউ দাঁড়িয়ে হেথায়?
কোথা সে বাদশা, সকলেই যার প্রজা; কোথা সে দুয়ার,
যেথা হতে ফেরে না কেউ শূন্য হাত?
আজ আমিও তো সে সরকার থেকে কিছু পেয়ে হব সুখী।
আজ আমিও তো সে দুয়ার থেকে ফিরব হয়ে খুশি)।

দু'আয় তার মুখ থেকে আল্লাহ তা'আলা এমন সব বাক্য বের করতেন, যা ঈমান-ইয়াকীনের অধিকারী অন্তর্দৃষ্টি ও আত্মিক শক্তি সম্পন্ন লোকদের বৈশিষ্ট্য। মানসিকতা প্রথম থেকেই ভারসাম্য স্বাভাবিকতা ছিল। এছাড়া বিভিন্ন মাসনূন দু'আ এবং অকুণ্ঠ অবস্থা বর্ণনা ইত্যাদি। যা কিছু তাহাজ্জুদ নামাযে ও ফরয নামাযগুলোর পর সাধারণত তিনি পেশ করতেন, অধিকাংশ

কাব্যাকারে মহান আল্লাহর দরবারে নিজের চাওয়া-পাওয়াগুলো উপস্থাপন করতেন। ফরিয়াদ জানাতেন আপন প্রতিপালক ও মালিকের সামনে।

এসব মুনাজাত দরূদ ও সাহাবায়ে কিরামের কৃত দু'আ-ইস্তিগফারে পরিপূর্ণ থাকত। খুব দ্রুত মাকবুল এবং মুখে মুখে চালু হয়ে যেত। বংশের নারী ও মেয়েরা সেগুলো মুখস্ত করে নিত। পড়ত নিয়মিত। যে সময় এসব মুনাজাত পড়া হত, একটি নূরানী পরিবেশ তৈরী হত তখন। ভরে যেত সকলের মন। বেশ কিছুদিন পূর্বে তার সেসব মুনাজাত সমগ্র "বাবে রহমত" দেখে জনৈক সাহেবে দিল (হৃদয়বান) ও আরেফ (আল্লাহওয়ালা) বলেছিলেন– এ কবিতাগুলো যার, তার আপন মালিকের প্রতি এক সুখ-সন্তুষ্টি এবং তার সঙ্গে আনুগত্যের একটি বিশেষ সম্পর্ক আছে বলেই মনে হয়। স্বয়ং আমিও যখন সে দু'আগুলো পড়ি, তখন নিজের মধ্যে এক বিশেষ অবস্থা অনুভূত হয়। মন-মানস দু'আর প্রতি আর নিবিষ্ট হয়।

আম্মাজান স্বয়ং নিজের একটি রচনায় সে সময়কার অবস্থা তুলে ধরেছেন। তদপেক্ষা বেশি সঠিক ও উত্তম ব্যাখ্যা আর হতে পারে না। (তিনি লিখেন), "দুআ যেন আমার আহার্য ছিল। দুআ ছাড়া আমার তৃপ্তি আসত না। দু'আর মগ্নতা এক সময় এত বেড়ে গেল যে, তাতে আমার সকল কর্মব্যস্ততা ছুটে গেল। তখন কথা বললেও দু'আর সাথে বলতাম। কোনও মুহূর্ত দু'আ ছাড়া নীরব কাটত না। জুমআর দিনটি যেন ঈদের দিন ছিল। আর বাস্তবে ঈদের দিনও আছে। গোটা দিন দু'আ করে করে কাটাতাম। বিশেষত আসর নামাযের পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত নির্জন-নিভৃতে বসে দু'আয় এমনভাবে লিপ্ত থাকতাম, যেখানে চোখ তুলেও দেখতাম না কোনও দিকে। মোরগের প্রত্যেক ডাকে, প্রত্যেক আযানের সাথে দু'আ করতাম। যথাসম্ভব দু'আর কোনও মুহূর্ত নষ্ট করতাম না। কোনও বিষয় বাদ রাখতাম না। সর্বপ্রকার ভয়-আশঙ্কা থেকে নিরাপত্তা চাইতাম। কামনা করতাম প্রত্যেক সৌন্দর্য ও কল্যাণ। কী ছিল সেই প্রকৃত মহান মালিকের রহমত ও সাহায্য! জীবনে যতসব বিষয় আসন্ন ছিল, সবই দুআর মুহূর্তে সম্মুখে থাকত। আবেগ-উত্তেজনা এতই বেড়ে যেত যে, আত্মবিস্মৃতির অবস্থা হয়ে যেত। সব জায়গা অশ্রুসজল হয়ে ওঠত। তার মহান কুদরতের বাহার দেখে ছটফট করত মন, যেভাবে যবাই করা মোরগ ছটফট করে। তবু আত্মবিস্মৃতি অবস্থায় দু'আ চালু থাকত। সব সময় নিজের অবস্থানের উপর ঘৃণা করতাম। বলতাম– "যে ত্রুটি রয়েছে ভাগ্য-নিয়তির মিটিয়ে দাও সব, জগৎ-সংসারে তোমারই হবে নাম।"

সিজদা থেকে কখনও মাথা উঠাতাম না। যাবৎ না মনে খানিক প্রশান্তি আসত। দু'আর পরে আমার এত তৃপ্তি ও সুখ অনুভূত হত, যেন অবারিত রহমতের দরজা খুলে গিয়েছে। আর আমি রহমতের রত্নভাণ্ডার লুটে নিচ্ছি। কখনও এমনিতেই হাসি আসত আর বলে উঠতাম–

کیوں نہ آئے رحم تجہ کو حال پر میرے رحیم
تیری ہی رحمت تو ہے مونس میری ہمدم مری

بیکسوں کابس توہی مونس توہی غمخوار ہے
تجہ سے کہ کر کیوں نہ ہو بیتائی دل کم مری

کب نہیں ہوگی خبر تجہ کو دل بیتاب کی
آہ یہو نچے گی تیرے دربار میں جسدم مری

سائلوں میں اک ترے دربار کے میں بہی تو ہوں
کیوں رہے فریاد دل یودرہم و برہم مری

کیوں نہ میں چاہوں کہ خودہی چاہنے والا ہے تو
کب گوارہے تجہے کہ چشم ہو پرنم مری

দু'আর ধ্যান-তন্ময়তা ও মনোযোগ দিন দিন বেড়ে যাচ্ছিল। এতে তার অভাবনীয় স্বাদ-আনন্দ, আবেগ-উচ্ছাস ও আত্মহারার অবস্থা অনুভূত হত। সে দিনগুলোতে তার ভারসাম্যপূর্ণ মানসিকতা ও মনোত্তাপ তাকে কবিতার মনও দান করেছে। তিনি তার মনের ব্যাকুলতাগুলো কাব্যাকারে ব্যক্ত করে নিজের মনকে সান্ত্বনা দিতেন। তিনি বলেন–

"ঐ প্রকৃত মালিকের কাছে আমার আকুল মুনাজাত ও কান্নাকটি অনেকটা এরূপ পছন্দ হল, তিনি যা কিছু দিতেন, কাঁদিয়ে দিতেন। তবে সবচেয়ে উত্তমটা দিতেন। এক বৎসর পর্যন্ত যথারীতি এই লিপ্ততা থাকে। এতে এমন আগ্রহ-আকর্ষণ হয়ে গেল যে, দু'আ অপেক্ষা অধিক প্রিয় আর কিছুই রইল না। সকল সৌন্দর্য, ধন-রত্ন তুচ্ছ হয়ে গেল। দু'আয় এত অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলাম, প্রায় নামাযে সূরা পড়ার স্থলে দু'আ প্রার্থনা শুরু করতাম আর কাজকর্মের কথা কি বলব! ঐ প্রকৃত মালিক দু'আর প্রতি এমন আকর্ষণ সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন, ফলে দু'আ ছাড়া আমার স্বস্তি আসত না। যখন নামায ও দু'আ থেকে অবসর হতাম, তখন "হিযবুল আযম" এর জপ করতাম। পুনরাবৃত্তি করতাম বারবার। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত দু'আ থেকে উদাসীন হতাম না। মুখেও পড়তাম আবার কলমেও লিখতাম।

মন এর প্রতি যারপরনাই আকৃষ্ট ছিল। ফলে এমনিতেই মুখে এমন এমন কবিতা-ছন্দ উচ্চকিত হত, যেন তা সংশোধিত-সম্পাদিত। অত্যন্ত বিনয়-নম্রতার সাথে কবিতাগুলো পড়তাম আর কাঁদতাম। ঐ প্রকৃত মালিকের কুদরত ও রহমতের প্রতিই বেশি ভরসা ছিল, ভাগ্যকে একেবারেই তুচ্ছ জ্ঞান করতাম। তাকেই মহান কার্যনির্বাহী মনে করে সব সময় আনন্দ আপ্লুত হতাম। সহজ মনে করতাম সকল মুশকিল-কাঠিন্যকে। এমন সব আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করতাম, যা আমার ভাগ্য হতে সুদূর পরাহত ও কঠিন ছিল। কিন্তু তার মাহাত্ম্য-বড়ত্বের প্রতি লক্ষ্য করে বলতাম–

ذرا کوگر چاہے تو ہی پل میں کرے رشک قمر
تیری صدفت یہ دیکھ کر کیوں حوصلہ میرا ہو کم

"তুমি চাইলে পলকেই করতে পার অণুকেই ঈর্ষা চাঁদের। তোমার এই গুণ দেখে কেন আমার চেতনা সাহস হবে কম।"

তার সাহায্য-প্রীতি আমার এত সুখ ছিল, ফলে বলতাম– "হে আরহামুর রাহিমীন। তুমি যদি আমার নিজের নির্ভৃত সাধনায় সফল না কর, তবে আমি এমন জোরে চিৎকার করব, যেন আকাশ-মাটি কেঁপে উঠে। আর তোমার দুয়ার থেকে কখনও মাথা উঠাব না।"

نہ اٹھوں گی میں اس در سے کوئی مجھ کو اٹھا دیکھے
مجھے ہے آرزو جس کی اٹھوں گی میں وہی لے کر

"উঠব না আমি তার দুয়ার থেকে। কেউ উঠিয়ে দেখুক মোরে। যে আশায় বেঁধেছি বুক। ওঠব আমি তা-ই নিয়ে।"

এ ছিল তার অপার করুণা, মহব্বত ও রহমত, যা আমাকে এত বড় দরবারে ধ্যান-তন্ময় ও আদামস্তক নিবিষ্ট করে দিয়েছিল। আমি অকুণ্ঠ কথা বলতাম এবং বলে বলে নিজের কথায় মুহ্যমান হয়ে যেতাম। আর এত বড় বাদশা রাজাধিরাজ হয়ে আমি নগন্য দীনকে প্রীতিডোরে বেঁধে রাখতেন।

یہ شان دیکھی تری نرالی جو مانگے تجھ سے تو اس سے راضی
بلا کے دینا کرم ہے تیرا ، یہ فضل بھی ہے ، کمال بھی ہے

"কেবল তোমাতেই দেখেছি এ মাহাত্ম্য, চাইল যে, তোমার কাছে, তার প্রতি সন্তুষ্ট তুমি, সুখ-দুঃখ তোমারই কৃপা, তোমারই করুনা-মহিমা।"

বিবাহ

একদিন আম্মাজানের বিয়ের বয়স হয়ে গেল। তার সমবয়সী কয়েক বোন ও সখীদের বিয়েশাদী হয়েও গিয়েছিল। কিন্তু তার বিয়ের ব্যাপারে

তার বাবা-মা (আমার নানা-নানী) তখনও কোনও সিদ্ধান্ত করতে পারছিলেন না। পাত্র ঘরেই ছিল বর্তমান। আপন ছোট চাচাত ভাইয়ের কাছে সহোদরা বোন বিবাহিতা ছিলেন। যিনি ছিলেন বড়জনের ছোট। এক পুত্র ও এক কন্যা রেখে তিনি যৌবনেই ইন্তিকাল করেন। এখন দ্বিতীয় বোন (আম্মাজান) এর বিয়ের প্রস্তাব করা হল। চাচার সে ঘরে বিদ্যমান ছিল সর্বপ্রকার পার্থিব যশ-খ্যাতি, ধন-সম্পদ, জমি-জেরাত, নানা আসবাবপত্র ও বিলাস সামগ্রী। কিন্তু দীন-ধর্মের বিশেষ কোনও আগ্রহ এবং উচ্চ দীনী শিক্ষার কোনও ব্যবস্থা সেখানে ছিল না। সকল উপকরণ আর ইঙ্গিত-সমর্থনও ছিল এ বিয়ে হয়ে যাওয়ার পক্ষে। কারণ, এটা ঘরের মধ্যেই নতুন ঘর ছিল। দূরে কোথায় যাবে? ধন-সম্পদ আর ব্যবস্থাপনাও ছিল যৌথ। বসবাসও ছিল একই সীমানায়; একই ঘরে। নানী সাহেবাও এর বিরাট সমর্থক ও পক্ষপাতি ছিলেন। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা ছিল ভিন্ন রকম। ইত্যাবসরে একটি অদৃশ্য রহস্য উন্মোচিত হল।

আমার আব্বাজান মাওলানা হাকীম আব্দুল হাই রহ. এর প্রথম বিবাহ হয়েছিল ১৩০৯ হিজরীতে আপন মামাত বোনের সঙ্গে ফতেহপুর হেস্সু জেলায়। উভয়পক্ষের মধ্যে অত্যন্ত মহব্বত ও মিল ছিল। ১৩১৯ হিজরীতে লক্ষ্ণৌতে তার আকস্মিক ইন্তিকাল হয়ে গেল। রেখে গেলেন কেবল স্মৃতিচারণকারী আমার বড় ভাই মরহুম মাওলানা হাকীম সাইয়িদ আব্দুল আলী সাহেবকে। তিনি তখন ছিলেন মাত্র নয় বছরের কিশোর। আব্বাজানের উপর এই আকস্মিক ঘটনায় এতই প্রভাব পড়ে, ফলে তিনি দ্বিতীয় বিয়ে না-করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন। অথচ তখন তার বয়স মাত্র তেত্রিশ বছর। আমার বড় দাদা মাওলানা হাকীম সাইয়িদ ফখরুদ্দীন রহ. এবং আমার নানা সাহেব দু'জনেই হযরত মাওলানা সাইয়িদ খাজা আহমদ সাহেব নাসিরাবাদীর সিলসিলায় হৃদ্যতা, আত্মীয়তা ও বংশগত সম্পর্ক ছাড়াও পীর ভাই ছিলেন। তাদের মধ্যে পরস্পর বেশ আন্তরিকতা ও মিল ছিল। এই আকস্মিক ঘটনার পর তাদের মনে তীব্র আকাঙ্ক্ষা হল আব্বাজনকে দ্বিতীয় বিয়ে করানোর। অনন্তর আব্বাজানের দ্বিতীয় বিয়ে হয় হযরত শাহ যিয়াউন নবী সাহেবের বিবাহযোগ্য কন্যা (আমার আম্মাজান) এর সাথে। যিনি নিজের দীনদারী, ধার্মিকতা, রুচিবোধ, বুদ্ধিমত্তা ও লেখাপড়ার আগ্রহের কারণে দাদা সাহেবের অত্যন্ত স্নেহের মেয়ে ছিলেন। কিন্তু আব্বাজানের মন-মানসিকতা বিয়ের প্রতি মোটেও আগ্রহী ছিল না। পরম সৌভাগ্য সত্ত্বেও তার পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে বরাবরই নীরবতা ছিল।

আমাকে তাঁর এক নেহাৎ অকৃত্রিম ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু মরহুম মুনশী আব্দুল গনী সাহেব একটি ঘটনা শুনিয়েছেন। তিনি বলেন, আমি একবার রায়বেরলী গেলাম। হাকীম সাহেবের আব্বা মাওলানা ফখরুদ্দীন সাহেব আমাকে অত্যন্ত ভারাক্রান্ত মনে বললেন– আমার বংশই কি এখন প্রদীপহীন হয়ে যাবে? সাইয়িদ (বংশের মধ্যে আব্বাজান এনামেই পরিচিত ছিলেন) বিয়ে করতে চায় না। আমাদের পরে এ ঘরে আলো দেওয়ারও কেউ থাকবে না। তুমি সাইয়িদকে এ ব্যাপারে রাজি করাও। আমি লক্ষ্ণৌ এসে মৌলভী সাহেবকে বললাম– আপনার আব্বাজানের খুবই ইচ্ছে এবং আকাঙ্ক্ষা যে, আপনি দ্বিতীয় বিয়ে করবেন। আপনি অস্বীকার করলে তার অসন্তুষ্টির আশঙ্কা আছে। অবশেষে আমার আব্বাজান তার পিতার মন রক্ষা, আনুগত্য ও নির্দেশ পালনার্থে (দ্বিতীয় বিয়ের জন্য) রাজি হয়ে গেলেন। তারপর নানাজীর কাছে প্রস্তাব পাঠিয়ে দেওয়া হল।

এখানে আরেকটি কথা বলে রাখাও জরুরী। আমার নানা বাড়িতে যেভাবে সবচেয়ে বেশি ভাল পানাহার ও স্বচ্ছলতা, ধন-সম্মান ছিল, ঠিক তদ্রুপই আমার শ্রদ্ধেয় দাদার ঘরে এসবের কমতি ছিল। এখানে যুগ যুগ ধরে তেমন কোনও অর্থ-সম্পদ ও জমিদারী ছিল না। বংশের এই শাখায় অনেক পূর্ব থেকে ইলমে দ্বীনের ক্রমধারা চলে আসছিল। এটা মৌলভী বাড়ি বলেই প্রসিদ্ধ ছিল। এখানে ধন-সম্পদের পরিবর্তে কিছু কিতাবাদী সঞ্চয়-স্তূপ আর ধর্মীয় জ্ঞান, দ্বীনী ইলম বংশনানুক্রমে হাতে হাতে স্থানান্তরিত হতে থাকে। এটাই ছিল এ বংশের সবচেয়ে বড় সম্পদ। বিশেষত সে সময় ঘরে একধরনের দীনতা-হীনতা ও দারিদ্র্য বিরাজ করছিল। দাদাজান ছিলেন একজন সুবিজ্ঞ উদার ডাক্তার, বড় পণ্ডিত ও লেখক। কিন্তু মন-মানসিকতায় অমুখাপেক্ষীতা, আত্মতুষ্টি ও আত্মনির্ভরতা ছিল পুরোপুরি। কখনও জীবন-জীবিকার প্রতি মনোযোগ দেন নি। ঘরে কখনও কখনও খাবার কিছু না-থাকাও বিস্ময়ের তেমন কিছুই ছিল না।

আব্বাজান রহ. নদওয়াতুল উলামার ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে প্রথম প্রথম ত্রিশ/চল্লিশ রুপি মাসিক বেতনে কর্মরত ছিলেন। পরে তা-ও ছেড়ে দেন। এমতাবস্থায় যখন তার পক্ষ থেকে বিয়ের প্রস্তাব পৌঁছাল নানাবাড়ি, তখন আমার নানী মুহতারামার পক্ষে এ প্রস্তাব মেনে নেওয়া বিরাট কষ্টকর হল। মহিলারা এসব বিষয়ে অত্যন্ত সূক্ষ্মদর্শী ও অনুভূতিপরায়ণ হয়ে থাকে। তা ছাড়া এদিকে ঘরেই সুপাত্র আছে। সে ঘর সম্পর্কে ভাল জানা-শোনাও আছে। এমন সম্বন্ধের বিপরীতে এই দ্বিতীয় সম্বন্ধকে প্রাধান্য দেওয়ার

বিষয়টি তার বুঝেই আসছিল না। জেনে বুঝে মেয়েকে এহেন কষ্টে নিক্ষেপ করা তার নিকট কোনও বুদ্ধিদীপ্ত কাজ ছিল না। কিন্তু নানা মহোদয়ের ভারী মহব্বত ছিল আব্বাজানের প্রতি। আব্বাজান তার কাছ থেকে আত্মশুদ্ধি এবং আত্মার খোরাকও নিয়েছিলেন। তিনি আব্বাজানের শিক্ষাদীক্ষা ও জ্ঞান-যোগ্যতা সম্পর্কেও ছিলেন অবগত। বিয়ের প্রস্তাব আসতেই তিনি বিগলিত হয়ে গেলেন। যেন তার দীর্ঘ মনোবাসনা পূর্ণ হল। মুহতারাম নানীকে তিনি স্পষ্ট বলে দিলেন– সাইয়িদ বয়সে তরুণ, পুণ্যবান, সৎকর্মশীল, আলেম এবং ভদ্র-গুণী পুরুষ। আমি কাউকে তার উপর অগ্রাধিকার দিতে পারি না। আমার নিকট দীনতা আর ধনাঢ্য এর কোনও গুরুত্ব নেই। মূল দেখার জিনিস যোগ্যতা ও ইলম।

স্বয়ং আম্মাজানের ভাষায়ই শুনুন। তিনি স্বরচিত "আদ্-দু'আ ওয়াল-কাদর" গ্রন্থে লিখেছেন– "যে পক্ষ থেকে বেশি চেষ্টা ছিল, সেটি আমার চাচার ঘর। আমার দুই বোন সে ঘরে পূর্বেই সম্বন্ধিত ছিলেন। এ ঘর এক সুদীর্ঘ সময় ধরে স্বচ্ছল প্রাণবন্ত ছিল। পার্থিব দিক থেকে সর্বপ্রকার ধনেগুণে ছিল অতুলনীয়। সহায়-সম্পত্তি, মান-সম্মান, লাজ-শরম, রূপ-চরিত্র, এক কথায় এর চেয়ে উত্তম আর কোনও ঘর ছিল না। একে আমাদের জন্য গর্বের কারণ মনে করা হত। মরহুমা আম্মাজানের মনের টান ছিল এদিকেই। নিজের আপন ভাইয়ের ঘর অপেক্ষাও একে প্রাধান্য দিতেন। আর আমারও এ ঘরটি প্রিয় ছিল। সব বিষয়ই ছিল আমার অনুকূলে। কিন্তু মরহুম আব্বাজানের বাসনা ছিল, পাত্র দীন-দরিদ্র যা-ই হোক, তবু হোক মুত্তাকী-পরহেযগার। কিন্তু এ গুণটি সে ঘরে পাওয়া যেত না।"

এই টানাপোড়েন ও দ্বিধাদ্বন্দের মুহূর্তে আম্মাজান, যার সে সময় বিভিন্ন স্বপ্নের সাথে গভীর সম্পর্ক ছিল– তিনি এমন কয়েকটি স্বপ্ন দেখেন, যাতে ইঙ্গিত ছিল মরহুম আব্বাজানের ঘরের দিকে। অধিকন্তু এই দু'ঘর ও পরিবার যদি একাত্ম হয়ে যায়, তবে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে একান্ত ভাবে বহু সাহায্য করা হবে। এরই পূর্বাপর সময়ে একটি সুসংবাদমাখা স্বপ্ন দেখেছেন। যার দ্বারা তিনি জীবনভর সুখ ও প্রশান্তি অনুভব করতেন। যখন তিনি এর আলোচনা করতেন, তার মধ্যে এক বিশেষ অবস্থা বিরাজ করত। তিনি স্বয়ং লিখেন–

"এক রাতে আমি স্বপ্নে দেখলাম, ঐ পরম করুণাময় অতিশয় দয়ালু দাতা মালিকের একান্ত অনুগ্রহ-সাহায্যে আমি একটি আয়াতে কারীমা পেলাম। সকাল পর্যন্ত সে আয়াতটি মুখে চালু ছিল। কিন্তু এমন কিছু আশঙ্কা

ছিল, যা আমি বলতে পারি নি। মুখ দিয়ে বের হওয়া কঠিন ছিল। তার অর্থও আমার জানা ছিল না। যখন তার অর্থ সম্পর্কে চিন্তা করলাম, তখন আমার মন ভরে গেল খুশিতে। ভুলে গেলাম চিন্তা-পেরেশানী। আমার এই সৌভাগ্যে বিরাট সুখ ছিল। তা নিয়ে গর্ববোধ করলাম। অনেককেই বললাম এ স্বপ্নের কথা। প্রত্যেকেই শুনে ভারী ঈর্ষা করত। আর মরহুম আব্বাজান এই স্বপ্ন শুনে খুশিতে কেঁদে ফেললেন। সে আয়াতে কারীমাটি ছিল:

فلا تعلم نفس ما اخفى لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون

"কেউ জানে না তার জন্য কি লুকায়িত আছে। তাদের জন্য রয়েছে চোখের শীতলতা তার বিনিময়ে যা তারা করত।" – সূরা আস্ সিজদা ঃ ১৭

যাহোক, শেষ পর্যন্ত মুহতারাম নানার সিদ্ধান্ত ও ইচ্ছা অগ্রাধিকার পেল এবং ১৯০৪ খ্রিঃ /১৩২২ হিজরীতে আল্লাহ পাকের অশেষ অনুগ্রহে সুন্দরভাবে এই বিয়ে হয়ে গেল। মুহতারাম দাদাজান এই সম্বন্ধে বিরাট খুশি এবং নিজের পছন্দে ভারী তৃপ্ত ও আনন্দ-আপ্লুত ছিলেন। আম্মাজান ঘরে আসতেই তিনি (দাদাজান) ঘরের সকল ব্যবস্থাপনা এবং আব্বাজানের ছোট বৈমাত্রেয় দুই বোনকে আম্মাজানের হাতে ন্যস্ত করলেন। আর তিনি এবং দাদীজান ঘর-দুয়ার ও বাচ্চাদের ব্যাপারে একেবারে নিশ্চিন্ত ও স্বাধীন হয়ে গেলেন।

অশেষ কল্যাণের বারিধারা

আম্মাজান তার নতুন ঘরে এসে সে অবস্থাই দেখলেন, যা তিনি শুনতেন। অভাব-অনটনের দিন-রাত। কখনও অনাহার কখনও অর্ধাহার। ঘরে আহারকারী কয়েকজন আর দাদাজানের আয় নামমাত্র। এদিকে নানী তার স্নেহপরবশ স্বভাবত উৎকণ্ঠায় থাকতেন, মেয়ের কোনও কষ্ট হচ্ছে না তো! কখনও কোনও মামাকে বলে পাঠাতেন, ঘরে কোনো কিছু রান্না হল কি না– দেখে এসো! আম্মাজান একাধিকবার শুনিয়েছেন, যখন আমি পিত্রালয় থেকে কাউকে আসতে দেখতাম, তখন চুলায় হাড়ি বসিয়ে আগুন জ্বালিয়ে দিতাম। যেন তিনি মনে করেন খাবার রান্না হচ্ছে। অথচ হাড়িতে পানি ছাড়া কিছুই থাকত না। অনেক সময় নানীজান অভিজ্ঞতায় বিষয়টি বুঝে ফেলতেন এবং খাঞ্চা ভরে খাবার পাঠিয়ে দিতেন। কিছুদিন পরই আব্বাজান ডাক্তারী শুরু করার ইচ্ছা করলেন। আম্মাজান বলতেন, আমার কাছে এ বিষয়ে পরামর্শ চাইলেন। আমি এর জোরাল সমর্থন করলাম। এরপর ডাক্তারী শুরু হয়ে গেল। এর পর পরই সেই পেরেশানী দূর হয়ে গেল। আয়ের সুব্যবস্থা হল। অতি দ্রুত এত বরকত ও উন্নতি হল, ফলে ঘরের অবস্থাচিত্রই বদলে গেল।

একেবারে জীর্ণ-শীর্ণ ঘরটি আম্মাজানের সাহসিকতা ও জীবন্ত প্রাণের ছোঁয়ায় মেরামত শুরু হল। ক্রমান্বয়ে একটি পাকা ঘর হয়ে গেল। দুই বোন এবং ভাই (আব্দুল আলী) সাহেবকে এমনভাবে নিজের স্নেহ-মমতা ও লালন-পালনে গ্রহণ করেন, যাতে তারা মাকে ভুলে গেল। আর সারা জীবন তারাও তাঁকেই (আম্মাজানকে) মা মনে করেছেন। যে ঘরে স্বয়ং ঘরের লোকদেরই মাঝে মধ্যে অনাহারে থাকতে হত, আজ সেখানে সব ঘর থেকে বেশি মেহমান আসা-যাওয়া শুরু হল। রায়বেরলী ও লক্ষ্ণৌতে নিজের পীর ভাই, স্বজন এবং কাছে-দূরের মেহমানদের আশ্রয় ও ঠিকানা হয়ে গেল।

নিজের ঘরের এই অবস্থাচিত্র, এর বৈশিষ্ট্যাবলী এবং অল্পদিনের মধ্যে এখানে যে অভাবনীয় পরিবর্তন এসেছে, তার আলোচনা স্বয়ং তিনি তার রচনায় লিখেছেন। তার ভাষায়ই সে কথা শোনা যায়। এতে তাঁর প্রকৃত ইচ্ছা-আগ্রহ, রুচি-আকর্ষণ আর মনোত্তাপ অনুভব করা যাবে।

"নিঃসন্দেহে এ ঘরে ধন ছিল না। কিন্তু এমন সব গুণ ছিল, যার জন্য সমস্ত ধন-সম্পদ নিবেদন করা যায়। এক ইলম এমন জিনিস, যা অর্জনের জন্য সম্পদ নিঃশেষ করে দিলেও তার সামান্য মাত্র নসীব হয়। তারপর ইলমের সাথে হাজারও গুণ ছিল। আর সম্পদ তো এমন জিনিস, যার সঙ্গে সহস্র ঝগড়া-বিবাদ থাকে। ঐ প্রকৃত মালিক আমাকে ধনীদের চেয়ে অনেক বেশি সম্মান দিয়েছেন। তিনি আমার উপর এমন সব অনুগ্রহ ও সাহায্য দান করেছেন, যা প্রকাশ করা সাধ্যাতীত। এই স্বল্প আয়ের মধ্যে এমন এমন কাজ করিয়েছি, যা ধনীরা পর্যন্ত করতে পারে না। এমন সব প্রয়োজন পূরণ করেছি, যা কখনও পূর্ণ হওয়ার ছিল না। ঘরের অর্ধেক অংশ দীর্ঘদিন ধরে অসম্পূর্ণ পড়ে ছিল। অনেকেই চেষ্টা করেছেন। কিন্তু কারও চেষ্টাই সাফল্যের মুখ দেখে নি। তা ছাড়া এর বিয়ে-শাদী ইত্যাদিও কোন ব্যবস্থা ছিল না। রুসম-রেওয়াজকেও জরুরী ধরা হয়েছিল। এক তুচ্ছ পন্থায় জীবন যাপন করছিলাম। এখানে আমি নিজের বিশেষত্ব বয়ান করছি না বরং ঐ প্রকৃত মালিকের কুদরত আর দু'আর মাহাত্ম্য ও বরকত দেখাচ্ছি। সুতরাং মাত্র ক'দিনের মধ্যেই এই ঘর ঈর্ষাযোগ্য হয়ে গেল। না সেই ঘর রইল, না সেই অভাব। সকল প্রয়োজন অত্যন্ত প্রশস্ততা ও সুচারুরূপে পূর্ণ হতে থাকে। অর্ধেক অংশ কি? একটি চমৎকার বৈচিত্রময় প্রসাদ তৈরী হয়ে গেল। যে ঘরে চিন্তা-পেরেশানী ছাড়া আর কিছু ছিল না। এ ঘরকে প্রকৃত মালিক আল্লাহ তা'আলা ধনে-জনে, সন্তান-সম্পদ আর সকল উন্নত গুণাবলীতে ভরে দিলেন। প্রশান্তিময় হয়ে গেল প্রতিটি মুহূর্ত। এ মহান মালিকের এমন কিছু

রহমত ও বরকত আমার উপর অব্যাহত অবতীর্ণ হয়েছে, মনে হত যেন রহমতের দুয়ার খুলে গিয়েছে। ঘর হয়ে গেছে জান্নাতের প্রতিচ্ছবি। সকল আশা পূর্ণতায় সজীব হয়েছে। যে চিন্তাধারা, মন-মানসিকতা পশ্চাদমুখী হয়ে যাচ্ছিল, তা এমনই প্রশস্ত সুদূর প্রসারী হয়ে গেল, ফলে অনেক দূর পর্যন্ত ভাবতে শুরু করলাম। আমাদের নিজের প্রয়োজনাদী পূরণ করাই ছিল বিরাট কঠিন আর আজ তার অনুগ্রহে অন্যদের প্রয়োজনাদি পর্যন্ত পূরণ হচ্ছে। পূর্বে এক মাসও স্বস্তিতে কাটত না। এখন বছরের পর বছর দস্তরখান মেহমান শূন্য হয় না। তার সাহায্যে সব নেয়ামতই পূর্ণ হয়ে গেছে। আছে সব রকমের আরাম-আয়েশ, সুখ-সমৃদ্ধি; না কোনও চিন্তা আর না কোনও আশঙ্কা রইল। আরেকটু সামনে গিয়ে লিখেন–

"এ ঘর আমার জন্য জান্নাত আর এ খেদমত আমার জন্য রহমত ছিল। যেন আমি রহমতের ছায়ায় পরিবেষ্টিত হয়ে গেলাম। না রইল কোনও ভাবনা-চিন্তা, না কোনও কষ্ট-ক্লেশ। প্রতিমুহূর্ত কেটে যাচ্ছে শোকরগোযারী আর কৃতজ্ঞতায়।

کس زبان سے کرو میں شکر ادا
تیرے انعام و لطف بے حد کا

تونے مجھ کو کیا بنی آدم
اشرف الخلق اکرم العالم

"কোন্ ভাষায় ওগো আমি করব শোকর
নাই সীমা তব দান-অনুগ্রহের।
তুমিই তো মোরে বানালে মানুষ
সৃষ্টির সেরা সম্মানী এই লীন জগতের।"

ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতার জীবন, আমলের নিয়মানুবর্তিতা

হিজরী ১৩২৬ মোতাবেক ১৯০৮ খ্রিষ্টাব্দের কথা। সে বছর ছিল আমাদের পরিবার বরং আমাদের বংশের জন্য আমুল হুয্ন তথা দুঃখের বছর। সে বছর দু'মাসের ব্যবধানে আমাদের শ্রদ্ধেয় দাদাজান ও নানাজান দু'জনই ইন্তিকাল করেন। এভাবে আমার আব্বাজান এবং আমার আম্মাজান উভয়ের একই প্রকৃতির শোক যন্ত্রণার শিকার হতে হয়। আর প্রকৃত অর্থেই তারা একে অপরের দুঃখের অংশীদার ছিলেন। আলহামদুলিল্লাহ্ আল্লাহর শোকর! দুজনই এই সম্বন্ধের সাফল্য এবং এই ঘরের উন্নতি-সমৃদ্ধি ও বরকত দেখে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন।

এরপর থেকে আম্মাজানের বেশিরভাগ সময় লক্ষ্ণৌতে থাকতে হত। গৃহস্থলীর যাবতীয় কাজকর্মের দায়িত্বভার তার উপরই ন্যস্ত ছিল। মেহমানের সমাগম ছিল প্রচুর। বংশের কয়েকটি শিশু লেখাপড়ার উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে তার কাছে থাকত। ভাইজান লেখাপড়া করতেন। বিভিন্ন মেহমানের সমাগম, বিশেষত আত্মীয়-স্বজনের খাতির-যত্ন, তাদের মর্যাদা ও মন-মর্জি লক্ষ্য রাখা, সকলের অধিকারগুলো রক্ষা করা বিরাট স্পর্শকাতর ও কঠিক কাজ ছিল। আম্মাজানের জীবন সে সময় এমন ত্যাগ-তিতিক্ষা ও আত্মনিবেদনের প্রতিচ্ছবি ছিল, যা ভারতীয় নারীদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য এবং ধর্মানুরাগী ও সুদীক্ষা প্রাপ্ত মুসলিম রমণীদের নিদর্শন। তিনি আব্বাজানের অনুমতি ব্যতিত তার জিনিসপত্রে অনধিকার হস্তক্ষেপ করতেন না। এ কাজ প্রায় নাজায়েয মনে করতেন। অথচ আব্বাজান তাকে ঘরের মালিক বানিয়ে দিয়েছিলেন। ঘরে যেসব মৌসুমী ফলমূল এবং বাইর থেকে যত হাদিয়া উপহার আসত, যতক্ষণ পর্যন্ত আব্বাজানের সুস্পষ্ট অনুমতি না-হত, ততক্ষণ তিনি তা নিজের ভাই-ভাতিজা, বোন-ভাগ্নি তো দূরের কথা, নিজের সন্তানকে দেওয়া পর্যন্ত পাপ মনে করতেন।

আব্বাজানের সম্পর্ক খুব বেশি লোকজনের সাথে ছিল না বটে। তবে খুবই পরীক্ষিত, যাচাই-বাছাই করা লোকদের সাথে ছিল। তন্মধ্যেও সিংহভাগ লোক ছিলেন এমনই, যারা তার শাইখ হযরত মাওলানা ফযলুর রহমান গঞ্জে মুরাদাবাদী রহ. সাথে সম্পর্ক রাখতেন। তাদের মাঝে বহুবিধ গুণাবলী ও স্বাতন্ত্রতার কারণে নবাব সাইয়িদ সিদ্দীক হাসান খান বাহাদুর ভূপাল প্রধান-এর বড় পুত্র মরহুম নবাব সাইয়িদ নুরুল হাসান খান এর সাথে ছিল খুবই গভীর ও অকৃত্রিম সম্পর্ক। আব্বাজানের সাথে তার এত গভীর সম্পর্ক ছিল যে, তাকে ছাড়া মোটেও স্বস্তি আসত না। এই বিশেষ সম্পর্কের কারণে আমাদের আম্মাজান এবং আমাদের ঘরের সকলকে তার ঘরে যেতে হত বারবার। অনুষ্ঠান কি, অনুষ্ঠান ছাড়াও কোনও মাস মুশকিলেই এমন যেত, যে মাসে কোনো-না-কোনও অজুহাতে তার বেগম সাহেবা আমাদেরকে না-ডেকে পাঠাতেন আর সারাদিন সেখানেই না-থাকতে হত। কিন্তু এই খোলামেলা অবস্থা সত্ত্বেও আম্মাজান তার দৃষ্টিভঙ্গি ও অভ্যাসরীতি তেমনই অটুট রেখেছিলেন, যেরূপ তার বংশে চলে আসছিল। তার সততা, অনাড়ম্বরতা, নির্জনতা, অল্পেতুষ্টি এবং দুনিয়াবিমুখতায় চুল পরিমাণ ব্যতিক্রম ঘটেনি।

নবাব সাহেব ছাড়াও আব্বাজানের আরও কতিপয় অকৃত্রিম বন্ধু ছিল। তাদের ওখানেও যেতে হত প্রায়। তারা ছিলেন ধর্মপ্রিয়, আল্লাহভীরু এবং নেহাৎ মুখলিছ-একনিষ্ঠ বন্ধু-স্বজন। তাদের সকলেরই সম্পর্ক ছিল মাওলানা ফযলুর রহমান সাহেব রহ. কিংবা মাওলানা মুহাম্মদ নাঈম ফিরিঙ্গি মহল্লীর সঙ্গে। যিনি ছিলেন মরহুম আব্বাজানের অতিপ্রিয় উস্তাদ অথবা তার সঙ্গে বিশেষ কোনও শিক্ষাগত ও দ্বীনী (ধর্মীয়) সম্পর্ক। একজন মুন্সী মুহাম্মদ খলীল সাহেব, দ্বিতীয় মুন্সী রহমতুল্লাহ সাহেব, তৃতীয় হাজী শাহ মুহাম্মদ খান সাহেব এবং চতুর্থ শায়খ মুহাম্মদ আরব সাহেব– যারা ছিলেন আব্বাজানের উস্তাদ এবং উস্তাদপুত্র– বেশিরভাগ আব্বাজানের বিভিন্ন উৎসব ও নিমন্ত্রণে তাদের কয়েকটি ঘরে যাতায়াত ছিল।

এই সুদীর্ঘ সময়ে যেখানে জীবন ও বংশ-পরিবারে অনেক উত্থান-পতন এসেছে, তার মধ্যে একাধিক সন্তানও হয়েছে। সুখ-দুঃখও এসেছে, আবার এসেছে আনন্দ-বেদনা ও হাসি-কান্না। তবু তার নিয়মিত দু'আর আমলগুলো এবং কুরআন তিলওয়াতের ব্যস্ততাও যথারীতি চালু ছিল। রমাযানুল মুবারাকে কুরআনে কারীমের দাওর এবং মাঝে মধ্যে তারাবীহ নামাযেও কুরআনে কারীমে খতমের ধারাবাহিকতাও বহাল ছিল। বড় ভাই সাহেবের তখনও আম্মাজানের সাথে মহব্বত ছিল, যখন তাঁর আম্মাজান বেঁচে ছিলেন আর পরবর্তীতে তো তিনি আম্মাজানের এবং তার নিজের মায়ের মধ্যে কোনও পার্থক্য বুঝতেন না। আর আম্মাজানও তাকে সব সময় নিজের সন্তানের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন। আব্বাজানের দুই বোন এবং ভাইজানের বিয়ে বড় আগ্রহ-উদ্দীপনা, রুচিশীলতা ও সুব্যবস্থাপনার সঙ্গে করিয়েছেন।

জীবনসঙ্গীর বিচ্ছেদ বিরহ এবং আত্মনিবেদনের জীবন

মোটকথা, সে দিনগুলো সর্বপ্রকার সুখ-সমৃদ্ধি, আনন্দ-হাসি আর কল্যাণ ও বরকতের সাথে কেটে যাচ্ছিল। আকস্মিক ৫ জুমাঃ উখরা ১৩৪১ হিঃ/ ২ ফেব্রুয়ারী ১৯২৩ খ্রিষ্টাব্দে আব্বাজানের ইন্তিকালের ঘটনা ঘটে। পূর্ব থেকে মানসিকতা এতটুকুও প্রস্তুত ছিল না। আমার চাচা মাওলানা সাইয়িদ আযীযুর রহমান সাহেবের সামান্য আঘাত লেগেছিল। আব্বাজান তার শুশ্রূষার জন্য আম্মাজানকে তার ওখানে পাঠিয়ে দিলেন। মাগরিবের পর পর্যন্ত কাজ করলেন। সাক্ষাত করলেন মানুষদের সাথে। নদওয়ার কাগজপত্রে দস্তখত করলেন। তারপর হঠাৎ করে মৃত্যুরোগ এসে আক্রমণ করে এবং ঘণ্টা দু'য়ের মধ্যে আপন সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে গিয়ে মিলিত হন।

আমার ভালমত স্মরণ আছে, আমার বয়স তখন মাত্র নয় বছর। আমিই গেলাম আম্মাজানকে আনতে। তিনি ফিরে এসে যখন ঘটনা জানলেন, তখন তিনি সিজদায় লুটিয়ে পড়লেন। যা হওয়ার ছিল, তা তো হয়েই গিয়েছে। স্বয়ং তার ভাষায় এই শোক যন্ত্রণা এবং এর উপর ধৈর্য ও সন্তুষ্টির বিবরণ শুনুন!

"যখন খেদমতের সময় ফুরিয়ে এল, তখন ঐ আসল মালিক আমার পক্ষে ভাল মনে করে নিয়তির অজুহাত দাঁড় করালেন। নিয়তি সেই অমোঘ নির্দেশ পেয়ে ফায়সালা করে দিল তৎক্ষণাৎ। আমিও আমার আসল মালিকের ইচ্ছে-সন্তুষ্টির উপর সন্তুষ্ট হয়ে গেলাম। কিন্তু এই বিচ্ছেদ যন্ত্রণা এমন ছিল না যে, সহ্য করে নিব। এটাও তার রহমত ও হেকমত ছিল, যা আমাকে তার খুশিতে সন্তুষ্ট রেখেছে। অন্যথায় যে অবস্থায়ই হত, তা-ও কম ছিল। এমন একজন প্রিয়তম ও একান্ত বন্ধুর আকস্মিক দৃষ্টির অন্ত রালে চলে যাওয়া কিয়ামত অপেক্ষা কম ছিল না। আমি বলতে পারব না যে, এ মন তারপর কিভাবে মন হিসেবে রইল! সুতরাং এ হুকুম আমার জন্য ধ্বংস ও বিপদ ছিল না বরং সরাসরি রহমত ও সাহায্যেও মাধ্যম ছিল বলতেই হয়। ফলে ধ্বংস ও নিঃশেষের পরিবর্তে তিনি আমাকে নিজের রহমতের ছায়ায় নিয়ে নেন। আর প্রতিটি পদে পদে সাহায্য সহায়তা দিতে থাকেন একান্ত বন্ধু, সহমর্মী ও সাহায্যকারী হয়ে। সুবহানাল্লাহ! কি অসীম তার রহমত! কী অপার তার মাহাত্ম্য!

সে সময় লক্ষ্ণৌর ঘরগুলোর মধ্যে পুরুষ বলতে আমিই ছিলাম। তা-ও নয়/দশ বছরের বালক। ভাইজান মেডিকেল কলেজ লক্ষ্ণৌর পক্ষ থেকে (যেখানে তিনি লেখাপড়া করতেন) ছাত্রদের একটি কাফেলাসহ মাদ্রাজ গিয়েছিলেন। সেখানে ডাক্তারীর বিশেষ কোনও শাখা ছিল, যা তখনও লক্ষ্ণৌতে চালু হয় নি। আর বড়দের মধ্যে ছিলেন আব্বাজানের আপন ফুফাত ভাই মাওলানা সাইদি আযীযুর রহমান সাহেব নদভীও। তবে তিনি অসুস্থ ছিলেন।

পরের দিন ১৬ জুমাঃ উখরা ১৩৪১ হিজরী (৩রা ফেব্রুয়ারী ১৯২৩ খ্রিঃ) আমরা ছোট্ট একটি অসহায় কাফেলাসহ স্বদেশ রায়বেরলী যাত্রা করলাম। সেখানেই বংশীয় বুযুর্গদের পাশে আব্বাজানের দাফন হওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছিল। বাহ্যত সেদিন আমরা চিরদিনের জন্য লাখনু ছেড়ে যাচ্ছিলাম। মাথা থেকে উঠে গিয়েছিল পিতৃছায়া। ভাইজান ছিলেন

পরদেশে বিভূঁই। আব্বাজান মিরাছ হিসেবে রেখে গিয়েছিলেন মাত্র এক রুপি। ঋণ হিসেবে কিছু ফিস আটাওয়ার এক রাজার দায়িত্বে ছিল। ঘরে প্রথম থেকেই না কোনও সম্পদ ছিল আর না কোনও বন্দোবস্ত। দিনের আয় দিনেই খরচ। সুতরাং শঙ্কা করার অভ্যাস আব্বাজানের ছিল না। ভাইজানের লেখাপড়াও ছিল অসম্পূর্ণ। খুব সম্ভব তখনও দু'বছর বাকী ছিল। আমার এখন স্মরণ নেই, প্রথম সময়ের দিনগুলো কিভাবে কেটেছে। অবশ্য মামারা নেহাৎ স্নেহপরায়ণ এবং আম্মাজানের বিরাট নিবেদিতপ্রাণ ভাই ছিলেন। কিন্তু আম্মাজান নিজের সহজাত সাহসিকতা ও দৃঢ়চিত্ততার মাধ্যমে আমাদেরকে কখনও বুঝতেই দেন নি যে, আমরা আজ এতিম হয়ে গিয়েছি। আমাদের পূর্বের অবস্থা এখন আর নেই। সম্ভবত সপ্তাহ দশ পরে ভাইজান (যিনি এই দূর্ঘটনার সংবাদ এক আশ্চর্যজনক পন্থায় মোম্বাইতে শুনেছিলেন) হঠাৎ করে রায়বেরলী এসে পৌঁছলেন। সেই দৃশ্য এখনও দৃষ্টিগোচর হয়। আব্বাজানের কবরের পাশে দাঁড়িয়ে ব্যাকুলতার সাথে তার অঝোর কান্নার চিত্র যেন স্মৃতিপটে গতকালের কথা। তারপর ঘরে এসে মা-বোনদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। আল্লাহ পাকের শত সহস্র রহমত হোক তার আত্মার ওপর। এরপর তিনি এক মুহূর্তের জন্যও বুঝতে দেন নি যে, আমরা ভাইবোন পিতৃছায়া থেকে বঞ্চিত হয়ে গেছি। সেদিন থেকে তার মৃত্যুর দিন পর্যন্ত তিনি পিতৃসুলভ স্নেহ-মমতা, অনুগত সন্তানের সেবা-শুশ্রূষা আর বিচক্ষণ দায়িত্বশীল ভাইয়ের মত মহব্বত করেছেন। আম্মাজান এবং আমাদের সকল ভাই-বোনের সঙ্গে এখন তার বদান্যতা, স্নেহ-মমতা ও মহব্বত পূর্বের চেয়ে আরও বহুগুণে বেড়ে গেল। সে এক বিরাট কাহিনী। যা শোনানোর অবকাশ আম্মাজানের জীবন বৃত্তান্তে নেই। ভাইজানের জীবনালেখ্য এবং তার দিনকর্ম আল্লাহ যদি কখনও লিখার তাওফীক দেন, তবে সেকথাও শোনানো যাবে (ইনশাআল্লাহ)।[১]

জীবনের ব্রত

রায়বেরলীতে ইদ্দতকালীন সময়ে এবং তার পরেও আম্মাজানের দু'টি ব্যস্ততাই ছিল। **এক.** ধর্মীয় কিতাবাদী পড়িয়ে শ্রবণ করা, যার বেশির ভাগ পড়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। **দুই.** তার সারাজীবনের ব্রত দু'আ ও ইবাদতের নিয়মানুবর্তিতা।

---

[১] আব্বাজানের জীবনকর্মের পরিশিষ্টরূপে ভাইজান ডাঃ আব্দুল আলী সাহেবের জীবনকর্ম "হায়াতে আব্দুল হাই" নামে সম্পন্ন হয়। ছাপা হয় ১৯৭০ খ্রিঃ নদওয়াতুল মুসান্নিফীন দিল্লি থেকে।

রচনাবলী

আম্মাজান বিভিন্ন মুনাজাত ও কবিতা লিখে তার দুঃখ ভুলার ব্যর্থ চেষ্টা করতেন। সান্তনা দিতেন নিজের মনকে। বংশের শিশুকন্যাদেরকে নিজের কাছে রেখে, তাদের শিক্ষা-দীক্ষায় ব্যস্ত থেকে নিজের মন ভুলিয়ে রাখতেন। সেসব মুনাজাত ও কবিতাগুলোর প্রথম সংকলন "বাবে রহমত" নামে ১৯২৫ খ্রিঃ ভাইজানের ঐকান্তিক চেষ্টা ও তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত হয়েছে। তাতে তিনি আমার নামে একটি বিরাট প্রভাবময় পরিচিতিমূলক ভূমিকাও লিখেছেন। এ কিতাবখানা অতি দ্রুত ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়ে। অনেক মুসলিম নারী এবং দু'আ ও মুনাজাতপ্রেমী বহু রমণীই তা পড়ে মুনাজাতের অব্যক্ত স্বাদ আর দু'আর মজা উপভোগ করেছেন। এ সংকলটি অত্যন্ত সমাদৃত হয়েছে।

নিজ বংশ এবং অন্যান্য মুসলিম শিশু কন্যাদের জন্য তিনি আরেকটি কিতাবও রচনা করেছেন। যাতে ধর্মীয় ও চারিত্রিক হেদায়াত, সুখী পরিবারের রূপরেখা, মনোহারী দাম্পত্য জীবনের নিয়ম-নীতি, শিষ্টাচার, দায়িত্ব-কর্তব্য, প্রাপ্য অধিকার এবং গৃহস্থলীর কাজকর্মের শিক্ষা দিয়েছেন। এ কিতাবখানাও কয়েক বছর পর "হুসনে মু'আশারাত" (উত্তম দাম্পত্যজীবন) নামে ছাপা হয়। গ্রহণযোগ্যও হয় দারুণভাবে। আম্মাজান খাবার তৈরী, পরিবেশন ও বিভিন্ন পদ্ধতি উদ্ভাবনেও ছিলেন সৃজনশীল মানসিকতার অধিকারী। এ বিষয়েও তিনি একটি পুস্তক রচনা করেছেন "যায়িকাহ" (বা রকমারি স্বাদ) নামে। যা ১৯৩০ খ্রিঃ "নামী প্রেস" লক্ষ্ণৌতে ছাপা হয় এবং দারুণ সমাদৃত হয়।

আমার সাথে আম্মাজানের আচরণ এবং শিক্ষাদীক্ষার ব্যবস্থা

যখন আমার (হযরত মাওলানার) নিয়মতান্ত্রিক শিক্ষাদীক্ষা শুরু হল, তখন আম্মাজানের এক নতুন ব্যস্ততা বেড়ে গেল। ঘরে কোন বড় পুরুষ লোক না-থাকার কারণে আম্মাজানই ছিলেন আমার তত্ত্বাবধায়ক, চারিত্রিক ও ধর্মীয় শিক্ষাদীক্ষার দায়িত্বশীল। কুরআনে কারীমের বড় বড় সূরাগুলো তিনি আমাকে সে সময়ই মুখস্ত করিয়েছেন। তার স্নেহ-মমতা বংশে প্রবাদতূল্য ছিল। আর আব্বাজানের ইন্তিকালের কারণে তিনি আমার মনোরঞ্জন এবং এক ধরনের আদর-সোহাগ অলৌকিকভাবে অন্যান্য মায়েদের তুলনায় বেশি করতেন। তদুপরি দুটি বিষয়ে তিনি আমার উপর বিরাট কঠোর ছিলেন। প্রথমত নামাযের ব্যাপারে অলসতা তিনি একদম সহ্য করতেন না। আমি ইশার নামায না-পড়ে শুয়ে গেলে ঘুম যতই গভী

হত, তবু তিনি উঠিয়ে নামায পড়াতেন আমাকে। কখনও নামায পড়া ছাড়া ঘুমাতে দিতেন না। তদ্রুপ ফজরের সময় জাগিয়ে দিতেন। পাঠাতেন মসজিদে। তারপর বসিয়ে দিতেন কুরআন তেলাওয়াতে। দ্বিতীয়ত যে ব্যাপারে তিনি মোটেও ছাড় দিতেন না। এমনকি আমার প্রতি তাঁর অকৃত্রিম অসাধারণ স্নেহ-মমতা আর অলৌকিক আদর-সোহাগ এতটুকু বিঘ্ন ঘটাত না, সেটি হল, "আমি যদি খাদেম-কর্মচারীদের কোনো সন্তান কিংবা গরীব কাজের ছেলেদের সাথে কোনো বাড়াবাড়ি, দুর্ব্যবহার, অন্যায় আচরণ বা হেয়তা ও দাম্ভিকতাপূর্ণ আচরণ করতাম, তা হলে তিনি না কেবল তার কাছে আমাকে মাফ চাওয়াতেন বরং হাত পর্যন্ত মিলিয়ে দিতেন। তাতে আমর যতই অপমান আর লজ্জাবোধ হত না কেন! কিন্তু তিনি এর অন্যথা মেনে নিতেন না। এতে আমার জীবনে বিরাট কল্যাণ সাধিত হয়েছে। জুলুম-অবিচার ও গর্ব অহংকারের প্রতি ভয়-ভীতি জন্ম নিয়েছে। কারও মনোকষ্ট দেওয়া এবং কাউকে লাঞ্ছিত-অপদস্ত করাকে কবীরা গুনাহ বুঝতে শিখেছি। একারণে সব সময়ই আমার পক্ষে নিজের ভুল স্বীকার করে নেওয়া সহজ মনে হয়েছে।

আমি যখন লক্ষ্ণৌতে থাকতাম, তিনি চিঠিপত্রের মাধ্যমে আমাকে বিভিন্ন উপদেশ ও হেদায়াত দিতেন। তখন তার সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন-স্বাদ একীভূত হয়ে আমার মধ্যে এসে গিয়েছিল। আমাকে আপন পূর্বসূরী বুযুর্গদের সঠিক উত্তরসূরী, নিজের খ্যাতিমান পিতার খাঁটি পথিকৃৎ, নিজ বংশের বৈশিষ্ট্যাবলির ধারক-বাহক– না কেবল বংশের বরং ইসলামের নাম সমুজ্জ্বলকারী, দ্বীনের একনিষ্ঠ মুসাল্লিগ ও দাঈরূপে দেখার অভিপ্রায় তার জীবনের সবচেয়ে বড় প্রত্যাশা এবং জীবনের প্রদীপ ছিল। যার ধ্যান-সাধানাতেই তার মধ্যে শক্তি-সাহস আর প্রাণ অক্ষুণ্ন ছিল। এখন তার প্রতি মুহূর্ত এরই চিন্তা, প্রতিনিয়ত এরই ধ্যান-আরাধনা, প্রতি মুহূর্ত এরই দু'আ-মুনাযাত, প্রতি মুহূর্ত এরই আলোচনা।

আম্মাজানের শিক্ষাদীক্ষার এই ধরন-প্রকৃতি আলোচনা প্রসঙ্গে একটি অভিজ্ঞতা এবং পরামর্শ হিসেবে আরও বলতে ইচ্ছ হয় যে, শিশুদের ধর্মীয় ও চারিত্রিক উন্নতি এবং তাদের দ্বারা আল্লাহর পক্ষ থেকে দ্বীন-ধর্মের খেদমত নেওয়া কিংবা গ্রহণযোগ্যতা দানের উপযুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে দুটি বিষয়ের বিরাট দখল রয়েছে। **প্রথমত.** তাকে (নিজ বয়স অনুপাতে) জুলম এবং কাউকে মনোকষ্ট দেওয়া থেকে পবিত্র থাকতে হবে। কোনও ব্যথিত মনের আহ্ ধ্বনী কিংবা মজলুমের বুকের উষ্ণশ্বাস যেন তার ভবিষ্যতের উপর প্রভাব না ফেলে।

দ্বিতীয়ত তাদের পানাহার দ্রব্য যেন অবশ্যই লুণ্ঠিত, হারাম ও সন্দেহপূর্ণ মাল থেকে পবিত্র থাকে। বাহ্যত আল্লাহ পাক এ অধমের পক্ষে উক্ত দুটি জিনিসের ব্যবস্থা করেছিলেন। আমার দাদার পরিবার ধন-সম্পত্তি, বিলাসসামগ্রী এবং মিশ্রিত সন্দেহযুক্ত মাল ও ঋণ থেকে যুগ যুগ ধরে পবিত্র ছিল। আব্বাজানের আয় একান্ত ডাক্তারী পেশার দান ছিল। এভাবে আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে না কেবল সংশয়-সন্দেহপূর্ণ মাল-সম্পদ বাঁচিয়েছেন বরং বিদআত-কুসংস্কার এবং প্রথা-প্রচলনের খাবার থেকেও রেখেছেন নিরাপদ।

এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনা মনে পড়ে গেল। আমি একবার আমাদের গৃহপরিচারিকার সঙ্গে (যিনি মোটেও পড়ালেখা করেন নি) আমার ফুফুর নিকট খালেছ হাঁট (রায়রেবলীর একটি মহল্লা) যাচ্ছিলাম। পথিমধ্যে এক জায়গায় দুঃস্থ-গরীবদেরকে (চল্লিশা কিংবা সদকার খাবার খাওয়ানো হচ্ছিল) উক্ত বৃদ্ধা আয়া, যার সাথে আমি যাচ্ছিলাম- তিনি খাবার নিলেন এবং সেখানেই বসে খাবার খেতে শুরু করলেন। আমি ছিলাম অবুঝ বালক। খাবার দেখে আমারও জিভে পানি এসে গেল। আমিও চাইলাম অংশ নিতে। তিনি বললেন- না, বাবা না। এসব তোমার খাওয়ার জিনিস নয়। তিনি আমাকে খেতে দিলেন না। এটা সম্ভবত ঘরের সেই পরিবেশ ও সতর্কতার ফল ছিল, যা তিনি বরাবরই দেখে থাকবেন। সেকালে আমাদের বংশে একটা খুবই চমৎকার রীতি ছিল। যেখানে এরূপ কোনও দুঃখ-শোকের ঘটনা ঘটত, মন ভারাক্রান্ত হত কিংবা কোনও পেরেশানীর ব্যাপার হত, তখন সেখানে "ছমছামুল ইসলাম" صمصام الإسلام পড়ে শোনানো হত। এটা প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ওয়াকেদী রহ. এর বিখ্যাত গ্রন্থ "ফুতূহুশ শাম" এর পঁচিশ হাজার শ্লোকে কাব্যানুবাদ। এ কাব্যানুবাদ আমাদের বংশেরই এক প্রবীন বুযুর্গ আমার আব্বাজানের আপন ফুফা মুনশী সাইয়িদ আব্দুর রায্যাক সাহেব কালামীর রচিত। তাতে লেখক আবেগ-উচ্ছাসে ভরা, ব্যথা-ভারাক্রান্ত হৃদয়স্পর্শী যুদ্ধের এমন প্রতিচ্ছবি অঙ্কন করেছেন, যাতে মন আবেগে উদ্বেলিত হতে থাকে। প্রাণস্পন্দন তীব্র হয়ে যায়। শাহাদত বরণের বর্ণনা এমনভাবে পেশ করেছেন, ফলে স্বয়ং আল্লাহর রাহে জীবন সঁপে দেওয়ার জন্য মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে। সাহাবায়ে কিরাম রাযি. ও মুজাহিদীনে ইযামের কষ্ট-ত্যাগের সম্মুখে মানুষ ভুলে যায় তার সকল দুঃখ-ব্যথা। আমার মরহুমা খালা বিবি সালেহা -যিনি কুরআনে কারীমের হাফেযও ছিলেন- এই কাব্যিক ফুতহূশ শাম অত্যন্ত প্রভাবময় ও মর্মস্পর্শী ভঙ্গিতে পড়তেন। আর পড়তে পড়তে কিতাবিটি তাঁর খুব চালু হয়ে গিয়েছিল। সাধারণত আসরের পরে এই

বৈঠক বসত। শিশুরাও তাদের মায়েদের পাশে খেলায় খেলায় কিংবা কোনও সংবাদ নিয়ে এসে হাজির হত। আর অনিচ্ছায় কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনে যেত। কখনও ইচ্ছে করেই বসে পড়ত। আবার কখনও মায়েরাই নিজের পাশে বসিয়ে শোনার সুযোগ দিতেন। এরপর যখন তাতে মজা লেগে যেত, অমনি শিশুরা খেলা ফেলে ঐ মসজিলে শরীক হত।

দীক্ষামূলক চিঠিপত্র

এক সময় আমার মন-মানসিকতা দ্বীনী শিক্ষা থেকে কিছুটা ওঠে যেতে শুরু করেছিল। আগ্রহ জেগেছিল ইংরেজী শিক্ষা এবং সরকারী পরীক্ষায় অংশগ্রহণের। ভাইজান কোনও পত্রে কিংবা রায়বেরলীর কোনও সফরে আম্মাজানের কাছে আমার এই নতুন আগ্রহের অভিযোগ করলেন। এরই প্রেক্ষিতে তিনি আমার নামে যে সুদীর্ঘ পত্র লিখেছেন, তাতে তার চিন্তাধারা, ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা, তার ঈমানী শক্তি, দ্বীনের প্রতি প্রেম-অনুরাগ ও আসক্তির অনুমান করা যায়। উক্ত পত্রের একটি অংশ হুবহু উল্লেখ করা হচ্ছে। অবশ্য তাতে কোনও সন-তারিখ লিখা নেই।। খুব সম্ভব পত্রখানা ১৯২৯ কি ১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দের লেখা। আম্মাজান লিখেন–

"আমার স্নেহের আলী!

(আল্লাহ তোমাকে নিরাপদ ও শান্তিতে রাখুন)

অদ্যাবধি তোমার কোনও পত্র পেলাম না। অপেক্ষায় থাকি প্রতিদিন। অপারগ হয়ে অবশেষে আমিই পত্র লিখছি। শীঘ্রই তোমার ভালমন্দ জানাবে।

আব্দুল আলী আসার কারণে স্বস্তি এসেছে অবশ্যই। কিন্তু তোমার পত্র এলে তো আরও প্রশান্তি লাগত। আব্দুল আলীর কাছে আমি তোমার দু'বার স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে যাওয়ার কথা বলেছি। সে বলেছে, আলীর নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি মোটেও যত্ন নেই। যে সময়টুকু বিশ্রামের, তা-ও সে পড়ালেখায় কাটায়। আমি বললাম, তুমি বারণ কর না? সে বলল, আমি অনেক বলেছি এবং বলতেই থাকি। কিন্তু সে খেয়াল করে না। এতে ভীষণ দুশ্চিন্তা হয়েছে। আমি বেশ চিন্তিত তোমার অযত্ন, ভ্রুক্ষেপহীনতা ও অনভিজ্ঞতার কারণে আর তোমার অযথা আশঙ্কাপূর্ণ মেহনতের দরুন। আলী! আমার আশা ছিল, তুমি ইংরেজীর প্রতি আকৃষ্ট হবে না। কিন্তু আশার বিপরীত তুমি চলতে শুরু করেছ আর অধিক পরিশ্রমকে বেছে নিয়েছ। বেশ তো! তুমি যা কিছু করেছ, এটাও তার [আল্লাহর] হেকমত। তবে ইস্তিখারা করে নেওয়া কর্তব্য।

আমার তো ইংরেজীর প্রতি মোটেও আসক্তি নেই বরং আছে ঘৃণা-বিতৃষ্ণা। কিন্তু তোমার খুশি মঞ্জুর। আলী! পৃথিবীর অবস্থা খুবই ভয়াবহ। আজকের পৃথিবীতে আরবী শিক্ষিতদের পর্যন্ত আকীদা-বিশ্বাস ঠিক নেই। সুতরাং ইংরেজী শিক্ষিতদের থেকে আর কি আশা করা যায়? আব্দুল আলী আর তালহা ছাড়া তৃতীয় আর কোনও উদাহরণ খুঁজে পাবে না। আলী! মানুষ যদি মনে করে, ইংরেজী শিক্ষিতরা বিভিন্ন পদমর্যাদা লাভ করছে, কেউ ডেপুটি হচ্ছে আর কেউ জজ। অন্তত উকীল-ব্যারিস্টার তো অবশ্যই। কিন্তু আমি সম্পূর্ণ এর বিপরীত। আমি বরং ইংরেজ শিক্ষিতদেরকে জাহেল-মূর্খ আর তার শিক্ষাকে নিষ্ফল এবং একদম বেকার মনে করি। বিশেষত এমতাবস্থায় কি হবে জানি না। আর কি শিক্ষার প্রয়োজন। অবশ্য এসময় ইলমে দ্বীনের প্রয়োজন ছিল।

এসব পদমর্যাদা তো যে কেউ অর্জন করতে পারে। এটা সাধারণ বিষয়। এমন কে যে বঞ্চিত! সে জিনিস হাসিল করা উচিত, যা এ মুহূর্তে সবচেয়ে মূল্যবান; কেউ অর্জন করতে পারে না। মন অধির। কিন্তু সে গুণাবলী দৃষ্টিগোচর হয় না। আক্ষেপ! আমরা এমন সময়ে জন্ম নিয়েছি। আলী! কারও কথায় ফাঁদে পড়বে না। তুমি যদি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে চাও এবং আমার অধিকার রক্ষা করতে চাও, তবে তাদের প্রতি লক্ষ্য কর, যারা ইলমে দ্বীন অর্জনে জীবন বিলিয়ে দিয়েছেন, তাদের মর্যাদা কি ছিল? শাহ ওয়ালী সাহেব রহ., শাহ আব্দুল আযীয রহ., শাহ আব্দুল কাদীর রহ., মৌলভী ইবরাহীম সাহেব রহ.,[১] আর তোমাদের বুযুর্গদের মধ্যে খাজা আহমদ সাহেব রহ.[২] ও মৌলভী মুহাম্মদ আমীন সাহেব রহ.[৩] –যাদের জন্ম, জীবন ও মৃত্যু ছিল ঈর্ষণীয়, তারা কেমন প্রভাব-প্রতিপত্তির সাথে জীবন কাটিয়েছেন আর কত কত সম্মান-মর্যাদার সাথে বিদায় যাত্রা করেছেন।

---

[১] মাওলানা আবু মুহাম্মদ ইবরাহীম ছিলেন প্রসিদ্ধ আহলে হাদীস আলেম। আমাদের নানা, শাহ যিয়াউন্নবী সাহেব রহ. এর মুরীদ এবং বিরাট আল্লাহওয়ালা হক্কানী আলেম। তার ওয়ায-নসীহতগুলো খুবই প্রভাবময় ও সময়োপযোগী ছিল। তার একটি ওয়াযে আমাদের বংশের অনেক যুবকদের অভাবনীয় সংশোধন হয়েছে। তাদের কায়াই পাল্টে গেছে। ৬ যিলহজ্জ ১৩১৯ হিজরীতে মক্কা শরীফে তার ইন্তিকাল হয় আর দাফন করা হয় জান্নাতুল মু'আল্লায়।

[২] মাওলানা সাইয়িদ খাজা আহমদ নাসীরাবাদী ছিলেন একটি মধ্যস্থতায় হযরতদ সাইয়িদ আহমদ শহীদ রহ. খলীফা আর হযরত শাহ যিয়াউন্নবী রহ. এবং মাওলানা সাইয়িদ ফখরুদ্দীন রহ. এর শাইখ ও মুর্শিদ। তাওহীদ ও সুন্নাতের প্রসার এবং ইসলাহ ও তরবিয়তের কাজে তার পাল্লা অনেক ভারী ছিল। ১২৮৯ হিজরীতে তার ইন্তিকাল হয়।

[৩] মাওলানা সাইয়িদ মুহাম্মদ আমীন নাসিরাবাদী। তাঁর মাধ্যমে রায়বেরলী, সুলতানপুর, পর্তাবগড় জেলা ও তার আশপাশের এলাকায় অনেক সংস্কারমূলক কাজ এবং শিরক-বিদআতের মূলোৎপাটন হয়েছে। তিনি ১৩৪৯ হিজরীতে ইন্তিকাল করেছেন।

এ মর্যাদা কার লাভ হয়! ইংরেজী শিক্ষিত লোক তো তোমাদের বংশে অনেক আছে এবং আরও হবে। কিন্তু এ মর্যাদার, এ শিক্ষায় শিক্ষিত কেউ নেই। এখন তার প্রয়োজন অনেক। তাদের ইংরেজীর প্রতি কোনও আসক্তি ছিল না। তাঁরা ইংরেজীতে অজ্ঞ ছিলেন। তবু কেন এত মর্যাদা পেলেন তারা!

আলী! আমার যদি শত সন্তান হত, তবে আমি সবাইকে এ শিক্ষাই দিতাম। আজ কেবল তুমিই আছ। আল্লাহ তা'আলা আমার নেক নিয়তের সুফল দিন। যেন শত জনের গুণ-যোগ্যতা একা তোমার মধ্যে পাই। উভয় জগতেই যেন আমাকে ভাগ্যবান, সুখ্যাতি ও সুযোগ্য সন্তানদের মা বলা হয়। আমীন। ছুম্মা আমীন।

আমি আল্লাহর কাছে সব সময় প্রার্থনা করি, তিনি যেন তোমার মধ্যে সাহস এবং আগ্রহ-চেতনা দান করেন। বহুমুখী যোগ্যতা-প্রতিভা আর সকল দায়িত্ব পালনের তাওফীক দান করেন। আমীন।

এর চেয়ে বড় কোন বাসনা আমার নেই। আল্লাহ তা'আলা তোমাকে সেসব মর্যাদায় পৌঁছে দিন। অটল-অবিচল রাখুন। আমীন। আলী! আরেকটি উপদেশ দিচ্ছি। তবে তেমাকে মেনে চলতে হবে। নিজের প্রবীন বুযুর্গদের কিতাবাদী কাজে লাগাবে। আর সতর্কতা অবলম্বন করবে অবশ্যই। যে কিতাব থাকবে না, তা আব্দুল আলীর অনুমতি সাপেক্ষে খরীদ করে নিবে। বাকী সেসব কিতাবই যথেষ্ট। এতে তোমার সৌভাগ্য ফুটে উঠবে। কিতাবাদীও বিলীন হবে না। বুযুর্গদের আনন্দ হবে। আমার সীমাহীন আকাঙ্ক্ষা এই সৌভাগ্য লাভের, যেন তুমি এই কিতাবাদীর খেদমত কর। যে টাকা-পয়সা খরচ করবে, তা এই প্রয়োজনে কিংবা খাবে।

কখনও ধার-কর্জ করবে না। থাকলে খরচ করবে; নতুবা ধৈর্য ধারণ করবে। ইলম পিয়াসীরা এভাবেই ইলম অর্জন করে। তোমাদের বুযুর্গগণ অনেক দুঃখ-কষ্ট ভোগ করেছেন। এ দিনগুলোর কষ্টকে গৌরবের কারণ মনে করবে। যে প্রয়োজন হবে, আমাকে লিখে জানাবে। আমি যেভাবে সম্ভব পূরণ করব। আল্লাহ মালিক। কিন্তু কর্জ করবে না; এ অভ্যাস ধ্বংস করে। যদি প্রতিশ্রুতি রক্ষা কর, তবে কোনও সমস্যা নেই।

সাহাবায়ে কিরাম কর্জ নিয়েছেন। কিন্তু যথাসময়ে পরিশোধও করে দিয়েছেন। আমরা কী? আলী! আমার উপদেশ মেনে চলবে– এটাও তোমার সৌভাগ্য। হালুয়া এখনও তৈরী হয় নি। ইনশাআল্লাহ সুযোগ পেলেই তৈরী করে পাঠিয়ে দিব। নিশ্চিন্ত থাক।

খুব শীঘ্রই ভালমন্দ জানাবে। যদি বিলম্ব কর, তবে আমি মনে করব, আমার উপদেশ তোমার মনঃপুত হয় নি। ইনশাআল্লাহ রমাযান শরীফে তোমার থেকে ওয়াজ শুনব। আল্লাহ তা'আলা তোমাকে আমার প্রত্যাশা অপেক্ষাও বেশি বলার তাওফীক দিন। তোমার কথা যেন প্রতিক্রিয়াশীল এবং আল্লাহর খুশি ও সন্তুষ্টির যোগ্য হয়। আমীন اللهم اتنى افضل ما توتى عبادك الصالحين বাকী ভাল থেকো। আল্লাহর অনুগ্রহে তুমি তৈরী থেকো। তুমি প্রতিশ্রুতিও দিয়েছ।

তোমার আম্মা

আম্মাজানের সবচেয়ে বড় আকাঙ্ক্ষা ও চিন্তা ছিল, আমি যেন আমার বড় ভাই (আব্দুল আলী) এর কথামত চলি এবং তার হেদায়েতের উপর চোখ বন্ধ করে কাজ করি। তিনি তাকে স্বস্থানে সকল গুণের আধার এবং বংশের সম্মান-মর্যাদার পথিকৃৎ মনে করতেন। আমাদের বংশে হযরত শাহ আব্দুল কাদির রহ. এর কৃত তরজমা ও তাফসীর "মূযিহুল কুরআন" (যা তার প্রাচীন তরজমার টীকায় ছাপা আছে) এর সব সময় গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। একে এক হিসেবে নারীদের এবং লেখাপড়া জানা পুরুষদের পাঠ্যভূক্ত ধরা হয়েছে। মনে হয় আমি ভাইজানের তাগিদ সত্ত্বেও প্রতিদিন তা পড়া ও দেখার ব্যাপারে উদাসীনতা-শৈথিল্য প্রদর্শন আর বেশিরভাগ আরবী সাহিত্য ও উপরি কিতাবাদি অধ্যয়নে মগ্ন থাকতাম। ভাইজান সম্ভবত কোনও পত্রে আম্মাজানকে এ ব্যাপারে অভিযোগ করেন। এরই জবাবে আম্মাজান এক দীর্ঘ পত্র লিখেন। যার একটি উদ্ধৃতি নিম্নে উল্লেখ করা হচ্ছে।

"যখন তুমি এখানে ছিলে, তখন আব্দু বিশেষভাবে লিখেছিল, শাহ আব্দুল কাদির সাহেবের তরজমা প্রতিদিন পড়বে এবং চিন্তা করবে। কিন্তু তুমি তার আদেশ পালন কর নি। আমি খুঁজে এনেছি এবং প্রতিদিন বলতে থেকেছি। তুমি গড়িমসি করতে থেকেছ। আর অন্যান্য কিতাবাদি নিয়ে ব্যস্ত থেকেছ। আমার ভীষণ অপছন্দ ছিল। কিন্তু এতখানি অমনোযোগীতা পরিষ্কার ছিল না। এ পত্র দেখে আমার যতখানি কষ্ট বোধ হয়েছে, আমি তা ভাষায় বলতে পারব না। এমনিতেই এ সময়ের অবস্থাদৃষ্টে আমারও স্বস্তি ছিল না। কিন্তু এখন সকল আশা-স্বপ্ন ভয়ঙ্কররূপে দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। আলী! তোমার এ অযোগ্যতা আমাকে কঠিন পীড়া দিচ্ছে। তোমার কাছে আমার তো এ প্রত্যাশা ছিল না। আমার আশা ছিল, তুমি তোমার নিবেদিতপ্রাণ ভাইয়ের সম্পূর্ণ সমমনা ও অনুগত হবে। এ আশাতেই আমার স্বস্তি ছিল।

কিন্তু আক্ষেপ! বুঝতেই পারি নি, তুমি এমন ভাই, যে নিজের প্রাণের চেয়েও বেশি প্রিয় থাকে এবং নিজের সকল শক্তি-সাহস তত্ত্বাবধান আর শিক্ষাদীক্ষায় ব্যয় করতে প্রস্তুত থাকে, তার চেষ্টাগুলোকে গৌণ মনে করে সকল অধিকার ভুলে যাবে। ভ্রুক্ষেপহীনতা ও সেচ্ছাচারিতামূলক আচরণ করবে। এ তো সেই সুহৃদ ভাই, যে এমন এক মুহূর্তে তোমার হাত ধরেছে, যখন আল্লাহ ছাড়া কাউকে দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল না। আমি তোমার শিক্ষার জন্য ছটফট করছিলাম। স্বয়ং সে-ও পেরেশান ছিল। তবু সে নিজেই পরিশ্রমের পথ বেছে নিয়েছে। যা কিছু তোমার হাসিল হয়েছে, তারই দয়ায়। দেখ! এটা ইলম। আমল বলে তাকে। তুমি আদবে (আরবী সাহিত্যে) সহস্র এগিয়ে যাও। তবু আব্দুর মোকাবেলা করতে পারবে না আর না তুমি তার সেসব যোগ্যতা অর্জন করতে পারবে। কারণ, এখনকার চিন্তাধারাগুলো সে সুযোগই কবে দিবে? আব্দু এমন আলেম এবং যোগ্য ব্যক্তি– এসময় যদি তার মত আরেকজন দেখতে চাও, তবে খুঁজে পাবে না। তোমাদের বংশের সকল গুণ-বৈশিষ্ট্যের নিদর্শন আব্দু।"

আরেকটু সামনে গিয়ে লেখাপড়ায় মনোযোগিতা, কষ্টসহিষ্ণুতা ও প্রবীন জ্ঞানপিপাসুদের গুণ-বৈশিষ্ট্য অর্জনের উৎসাহ দিয়ে লিখেন,

"সব বিষয়ের আকর্ষণকে অনর্থক মনে কর। সৌখিন মানসিকতার লোকদের সাথে বন্ধুত্ব রেখ না। জ্ঞান-পিপাসুদের কেবলই পড়াশোনা করা উচিত। জুতা-কাপড় ছিঁড়ে-ফাঁটাই হোক, লজ্জার কিছু নেই বরং গর্ব করা উচিত। এ অবস্থা কল্যাণ ও সাফল্যেও কারণ হয়ে থাকে। তাদের দুঃখ-কষ্টে ইলমের কদর ও মূল্যায়ন হয়। বুদ্ধিমান ও সৌভাগ্যশীল সে ব্যক্তি, যে দুর্লভ-বিরল জিনিস অর্জন করে। তা কি? শরীঅত পরিপালন। এ সময়কার জ্ঞান অতি সাধারণ। যে কেউ তা অর্জন করতে পারে। দু'চারটা কিতাবাদি নিয়ে নিবে। ব্যাস, যোগ্য হয়ে গেল। শত সহস্র বিপদ আশঙ্কা থাকে সম্মুখে। ইচ্ছে হলে এ পত্রখানা মন দিয়ে পড়বে এবং প্রায়ই এর উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখবে।"

অপর একটি পত্রে দ্বীনী ইলম এবং আরবী শিক্ষার প্রতি পূর্ণ মনোনিবেশ করা, এতে বিশেষ বুৎপত্তি অর্জন করা এবং প্রবীন উলামায়ে কিরামের পদাঙ্ক অনুসরণ করার জন্য তাগিদ দিয়ে লিখেন–

"এখন আরবীতে মেহনত করবে। তবে নিয়ম ছাড়া নয়। স্বাস্থ্যের প্রতি অবশ্যই যত্ন নিবে। সুস্থতা থাকলে সব কিছু হাসিল হতে পারে। তুমি যদি এতটুকু পরিশ্রম আরবীতে করতে, তবে আজ অনেক কিছুই হাসিল হয়ে যেত। যেসব কিতাব বাকী আছে, মনোযোগ দিয়ে সম্পন্ন করে নিবে। আর

যথাসম্ভব প্রবীন উলামায়ে কিরামের মতো যোগ্যতা-দক্ষতা অর্জন করবে। সেসব জ্ঞান অর্জন কর, যাতে কোনও কথা-কাজ শরীঅতের বিপরীত না হয়। সব মাসয়ালা-মাসায়েল গভীর ব্যুৎপত্তি অর্জন কর। আজ এই ইলমেরই প্রয়োজন। আজকের আলেম-উলামা জানে না কিছুই। শুধু সৃষ্টি করে নানা ফেৎনা। আমার আন্তরিক কামনা হল, তুমি যেন ইলমে সেই মর্যাদা হাসিল কর, যা বড় বড় উলামায়ে কিরাম অর্জন করেছেন। যাদের দেখতে চক্ষুযুগল আকুল হয়ে আছে, কান আসক্ত, মনপ্রাণ আবেগে তন্ময় হয়ে যায়। আলী! মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন তোমাকে সেসব গুণ-যোগ্যতা দান করেন। ফিরে আসে সেই সোনালী দিন। আমীন।"[১]

অন্য একটি চিঠিতে তিনি আরও লিখেন–

আমার স্নেহের আলী! (আল্লাহ তোমাকে সুস্থ-নিরাপদ রাখুন)

এই তো তোমার পত্র পেলাম। আমি অপেক্ষা করতে করতে একেবারে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। তখনই তোমার পত্র পেলাম। বিরাট খুশি হয়েছি। আলী! আল্লাহর রহমতে আমি দারুণভাবে আশাবাদী যে, তুমি কারও কোনও পদমর্যাদা ও সাফল্যে (বিন্দুও) প্রভাবিত হবে না। কেননা এটা সাধারণ ব্যাপার এবং নশ্বর-ক্ষণস্থায়ী। ঈর্ষণীয় হল সেই জিনিস, যা শত সহস্রের মধ্যে জন এক পায়। আর তা হয় আল্লাহর পক্ষ থেকে।

قسمت کیا ہر شخص کو قسام ازل نے
جو شخص کہ جس چیز کے قابل نظر آیا

(ভাগ করে দিয়েছে নিয়তি চিরন্তন সবাইকে, যে যার যোগ্য হয়েছে দৃষ্টিগোচর।)

তোমার এ নিয়ে গর্ব করা উচিত। নেহাৎ সাহস ও শক্তির সাথে কাজ করা উচিত। আল্লাহর কাছে দু'আ করি, তিনি যেন এর প্রতি তোমার মনোযোগিতা সৃষ্টি করতে থাকেন। আর তুমি সব গুণ-যোগ্যতার উপর একে অগ্রাধিকার দিতে থাক। তোমার যদি বিচারপতির কিংবা অন্য কোনও পদমর্যাদা লাভ হত– যা অতি সাধারণ ব্যাপার, তবে আমার সেইসঙ্গে সহস্র বিপদ আশঙ্কা দৃষ্টিগোচর হত। তিনি আমাকে সকল ক্ষতি-বিপদ থেকে রক্ষার জন্য এমন উত্তম পন্থা পছন্দ করেছেন। তিনি স্বয়ং রক্ষাকর্তা, তত্ত্বাবধায়ক ও কার্যনির্বাহী। আমার উদ্বেগ-চিন্তার কোনও প্রয়োজন ছিল

[১] সে সময় ইংরেজীর প্রতি অতিমাত্রায় আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিলাম। ফলে স্বাস্থ্য এবং চোখে সমস্যা দেখা দিয়েছিল।

না। চিন্তার স্থলে আমার মন প্রতি মুহূর্ত এমন প্রীত হচ্ছে, যা কোনও উচ্চ মর্যাদাবান লোকেরও লাভ হয় না। তুমি যতই গর্ব কর, তা-ও কম।"

সালামান্তে

তোমার আম্মা

"আমার নয়ন মনি. কলিজার টুকরো আলী!

(আল্লাহ্ তোমাকে সুস্থ-নিরাপদ রাখুন!) তোমার দু'খানা পত্র পেলাম। বিস্তারিত শুনে মনে স্বস্তি এসেছে। মাওলানা আহমদ আলী সাহেবের পুত্রও তোমার সঙ্গে আছে শুনে বিরাট খুশি হয়েছি। দেখো, কতদিন থাকতে হয়। আল্লাহ্ পাক দ্রুত কামিয়াব করুন। আমীন।

বিশেষ বিশেষ মুহূর্তে আমি দু'আ করি, আল্লাহ্ পাক যেন তোমাকে সেই ইলম ও জ্ঞান দান করেন, যা অর্জন করেছেন সাহাবায়ে কিরাম রাযি.। যার দ্বারা ঈমান শক্তিশালী হবে। পবিত্র হবে সব পাপ-পঙ্কিলতা, পরিত্রাণ পাওয়া যাবে বর্তমান সময়ের সকল ফিৎনা-ফ্যাসাদ থেকে; প্রশান্তি আসবে পুরোপুরি।

আমি বলতে পারব না, আমার যে আশা এবং যে কারণে আমার ইলমে দ্বীন হাসিলের স্বপ্ন-সাধ জেগেছে। আল্লাহ্ পাক আঁমার আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করুন। সুখী: ও সাফল্যমণ্ডিত করুন ইহ-পরকালে। আমীন। তুমি যদি এভাবে নিয়মিত পত্র লিখে জানাও, তবে আল্লাহর শোকরিয়া জ্ঞাপন করব। আজকাল আবুল খায়ের প্রতি জুমায় ওয়ায করে, ময়দানপুরেও হয়। আল্লাহর কৃপায় তোমাদের দ্বারা দ্বীন ইসলাম প্রসারিত হোক। মিটে যাক কুফর-বাতিল। আমীন। আল্লাহ্ পাক তোমাদেরকে অবিচল দৃঢ়পদ রাখুন। পাঁচ রূপি আব্দুকে দিয়ে দিয়েছি। ইনশাআল্লাহ হাতে এলে আবার পাঠাব। মামা (মাওলানা সাইয়িদ উবাইদুল্লাহ্) সাহেব, মামাজী (মাওলানা সাইয়িদ আহমদ সাঈদ) কে সালাম লিখলে তখন ভাইজান (তথা আপন মুরব্বী মাওলানা সাইয়িদ খলীলুদ্দীন ইবনে মাওলানা রশীদুদ্দীন) কেও লিখবে। মাহমূদ, মুহাম্মদ ছানী (আল্লাহ্ তাদের সুস্থ-নিরাপদ রাখুন) পড়াশোনা করছে। দু'আ করি, আল্লাহ্ যেন তাদেরকে প্রশান্তির উপযুক্ত বানান।

সালামান্তে

তোমার আম্মা

নয়নমনি আত্মার ধন প্রাণের আলো আলী!

(আল্লাহ্ তাকে নিরাপদ রাখুন, দান করুন দীর্ঘায়ু)

আল্লাহ্ পাকের উপর ভরসা। তিনি তোমার রক্ষাকর্তা ও সাহায্যকারী। তুমি নিয়মিত পত্র লিখে যাবে। তা হলে আমার স্বস্তি থাকবে। সাবধান! শক্তি-

সাহসের চেয়ে অধিক পরিশ্রম করবে না। এ মৌসুমে অতিমাত্রায় পরিশ্রম মেধা-মনন সহ্য করতে পারে না। মন-মস্তিস্কের সুস্থতা জরুরী বিষয়। এর প্রতি বেশি যত্ন নিবে। যথাসম্ভব এক মাসের পরিশ্রম একদিনে করবে না। তুমি যদি এরূপ পরিশ্রম কর, তবে দুনিয়া-সংসার কিভাবে চালাবে? দুনিয়া ঠিক রাখাও একটি এবাদত। সহমর্মিতা-সমবেদনা আর ন্যায়ানুগতা সবই আল্লাহ-রাসূল সা. এর সন্তুষ্টির মাধ্যম। তা ছাড়া সকল আত্মীয়-স্বজন এর প্রতীক্ষায় থাকে। বিশেষত তোমার কাছে অনেকেরই যথেষ্ট প্রত্যাশা রয়েছে। আমি চাই তুমি পাশ্চাত্যবাসীদের থেকে জ্ঞান-প্রজ্ঞায় বড় হও; অভিশপ্তরা যেন ধর্মীয় শিক্ষা ও শাস্ত্রের প্রতি কোন প্রশ্ন-আপত্তি ছুড়ে মারার সুযোগ না-পায়। আল্লাহ তা'আলার কাছে সবসময় দু'আ করি, তোমার যেন এমন এমন যোগ্যতা অর্জিত হয়, যাতে সেসব গুণ-যোগ্যতা– যার উপার সব মানুষ গর্ব করে, সবই গৌণ হয়ে যায়। সকলেই অনুরাগী হয় ধর্মীয় শাস্ত্র-জ্ঞানে। আল্লাহ পাক আমার প্রত্যাশা পূর্ণ করুন। আমীন।

তুমি তাড়াতাড়ি পত্র লিখবে। নতুবা আমার ভীষণ কষ্ট হবে। আব্দু তোমার কর্মপদ্ধতিতে ভারী খুশী হয়েছে। সে আমাকে লিখেছিল। এটা ছিল প্রথম পত্র, যার থেকে এই পুণ্যময় বাক্য প্রকাশ পেয়েছে। আমার তীব্র আকাঙ্ক্ষা ছিল, আব্দুর ভাষায় শুনব। আল্লাহর শোকর! সেই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়েছে। এই আকাঙ্ক্ষা হল, প্রত্যেক ভাষায় তোমার সুনাম ও সফলতা আসুক। আমীন। আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সৎ ইচ্ছাগুলো পূর্ণ করুন। তোমাদের রাখুন অটল-অবিচল। পরিচালিত করুন তাদের পথে, যাদেরকে তিনি পুরস্কৃত করেছেন। কবুল করুন তোমাদের আমলগুলো।

সালামান্তে
তোমার আম্মা

আমার প্রিয় আলী!

(আল্লাহ তোমাকে সুস্থ-নিরাপদ রাখুন!) তোমার কার্ড পেয়েছি। তোমার পরীক্ষা ভাল হচ্ছে জেনে ভীষণ খুশি হয়েছি। এবার পরীক্ষায় ভয় ছিল। আল্লাহর কাছে সব সময় দু'আ করেছি। তার রহমতের অপেক্ষা কর। যখন তার রহমতে ফলাফল প্রকাশ হয়ে যাবে, তখন ইনশাআল্লাহ খুশিমনে আসবে আর যতদিন না ফলাফল জানা যাবে, প্রত্যেহ সকালে সুন্নাত ও ফরযের মধ্যে বিনয়-নম্রতা ও একাগ্রতার সাথে সূরা ফাতিহা একচল্লিশবার পড়বে। আর পূর্বে ওপরে এগারবার করে দরূদ শরীফ পড়বে। এটা বিরাট উপকারী। তারপর ফরয পড়ে সূরা ফাতিহা একবার,

সূরা 'আলাম-নাশরহলাকা' তিনবার আর ইন্না আনযালনা একবার পড়ে নিবে। পূর্বে ও পরে দরূদ পড়বে। সম্ভব হলে সকাল-সন্ধ্যা দু'বেলাই পড়বে। ভরসা রাখবে আল্লাহর ওপর। আমি আল্লাহর সমীপে তোমার জন্য এই মুনাজাত করেছি। আল্লাহ যেন তা কবুল করেন। আমীন।

سدا سے ترے مجھ پر انعام ہیں
ہیں انعام بھی اور اکرام ہیں

جو مانگا دیا ، اور دیا بے طلب
پھری میں ترے در سے محروم کب

تھی جو کچھ مجھے فکر سب دور کی
میں لائی جو حاجت و منظور کی

ترے فضل کی کچھ نہیں انتہا
جو ایا ترے در پہ وہ خوش ہوا

تری شان رحمت سے ہے یہ بعید
پھرے در سے تیرے کوئی ناامید

کرم کم میرے حال پر بھی کریم
کہ ہے نام تیرا غفور و رحیم

مری سعی و کوشش نہ برباد کر
ترے در پہ آئی ہوں امداد کر

دعا جلد میری یہ ہو مستجاب
علی ہو ترے فضل سے کامیاب

وہ ہو کامیابی جو ہو باسند
ہو ایسی سند جوکہ ہو مستند

نہ ہو فکر کوئی نہ رنج و تعب
تمنائی بر آئیں میری یہ سب

خطائوں پہ ان کے نہ کر تو نظر
یہ بندے ہیں تیرے توہی رحم کر

چھاں سدا دونوں پھولیں پھلیں

سدا یہ شریعت پہ قائم رہیں

یہ سب بہن بہائی رہیں شاد کام
جہاں میں ہو اقبال ان کا غلام

خزاں میں جو ہے آج فضل بہار
یہ سب فضل تیرا ہے پرور دگار

یہ فضل بہاری رہے تاحیات
ہو بہتر کی بہتر حیات اور ممات

(কাব্যানুবাদ)

(১) রয়েছে সদা তোমার করুণা
মাওলা আমার পরে,
রয়েছে আরও দান-সম্মান
কত যুগ ধরে।

(২) দিয়েছ যত প্রার্থনা মোর
আরও কত নিজ হতে,
তোমার দুয়ারে গিয়ে কবে
ফিরেছি ব্যর্থ মনোরথে।

(৩) ছিল যত উদ্বেগ-চিন্তা
করেছ তুমি সব দূর,
যত প্রয়োজন-অভাব মোর
করেছ প্রভূ মঞ্জুর।

(৪) নেই তো কোনও প্রান্তসীমা
মাওলা তোমার দয়া-দানে,
এসেছে যে দুয়ারে তোমার
খুশিই হয়েছে মনেপ্রাণে।

(৫) তব রহমতের অথৈ পাথারে
এ তো সুদূ পরাহত–
তোমারি দুয়ার হতে কেউ
ফিরবে হয়ে আশাহত।

(৬) করুণা কর হে আমার পরে
নিখিলের দয়ালু দাতা,
তুমি তো রহীম তুমিই তো গফুর
পরম করুণাময় পাপীদের ত্রাতা।

(৭) করো না অগো ব্যর্থ-নিষ্ফল
যত চেষ্টা-সাধনা আছে মম,
এসেছি আমি দুয়ারে তোমার
সাহায্য দাও মোর প্রিয়তম।

(৮) শীঘ্রই যেন হয় গো কবুল
আমার এই আকুল মুনাজাত,
তব করুণায় মোর স্নেহের আলী
পায় যেন সাফল্য-নেয়ামত।

(৯) সে-ই তো প্রকৃত সাফল্য
প্রমাণ আছে যার,
এমন প্রমাণ যার অন্ত নেই
শক্তি-ক্ষমতার।

(১০) না-হয় যেন চিন্তা কোনও
দুঃখ-কষ্ট দহন,
মনের আশাগুলো মোর
হয় যেন সব পূরণ।

(১১) তাদের ভুলগুলোর তরে তুমি মাওলা
তাকিও না (ক্ষমা কর),
এরা তোমারই তো বান্দা-দাস
ওদের তুমিই রহম কর।

(১২) ফুল দুটি সদা ফুটে থাক
পাপড়ী মেলে ভবে,
শরী'আত পালনে থাক চির অটল
জীবনায়ূ যতদিন রবে।

(১৩) সুখী-সফল থাক আমরণ
ওরা সব ভাইবোন,
ধরণী তলে সৌভাগ্য যেন
করে ওদের পদচুম্বন।

(১৪) হেমন্তের ফসলে যে আজ
মনোহারী বসন্ত হাওয়া,
সবই তোমার করুণা মাওলা
তোমারই অসীম দয়া।

(১৫) রয় যেন এই করুণা ধারা
যতদিন দেহে আছে প্রাণ,
জীবন-মরণ হোক দামী থেকে
দামী, উজ্জ্বল দীপ্তিমান।

সালামান্তে তোমার আম্মা।

আমার দীর্ঘ সফর, আম্মাজানের ত্যাগ-তিতিক্ষা

আম্মাজানের জন্য কঠিন মুজাহাদা ও পরীক্ষা বরং "জিহাদে আকবর" (বড় জিহাদ) ছিল আমার লম্বা লম্বা সফর। যেগুলো অনেক জানা-নাজানা আল্লাহর হেকমত-প্রজ্ঞার কারণে আমার জন্য বোধ হয় নির্ধারিত ছিল। যেই অসম্ভব স্নেহশীল ও দুর্বল মনের মা আমি লক্ষ্ণৌতে থাকা অবস্থায়ও যদি পত্র লিখতে বিলম্ব হত, তবে অস্থির-ব্যাকুল হয়ে যেতেন, তার জন্য দেশ-বিদেশে লম্বা-লম্বা সফর বিরাট জিহাদ নয় তো কি? হতে পারে আল্লাহ পাকে তাকে এর মেধ্যই জিহাদের অনেক সাওয়াব দান করেছেন।

সম্ভবত ১৯৩১ খ্রিষ্টাব্দে হযরত মাওলানা আহমদ আলী লাহোরী সাহেবের নিকট তাফসীর পড়ার অদম্য বাসনায় এবং তার সংশ্রবে উপকৃত হওয়ার উদ্দেশ্যে লাহোর গেলাম। সেখান থেকে কাদেরী সিলসিলার এক প্রবীন বুযুর্গ, যিনি স্বয়ং হযরত মাওলানা আহমদ আলী সাহেবের শাইখ ছিলেন– সেই বুযুর্গ হযরত খলীফা গোলাম মুহাম্মদ সাহেব দীনপুরীর যিয়ারত ও সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে পাঞ্জাব ও সিন্ধের সীমান্ত এলাকা খানপুর যাওয়ার মনোস্থ করলাম। আর আম্মাজানকে এ বিষয়ে অবগত করলাম। তখন এর জবাবে তিনি আমাকে লিখলেন–

"নয়নমনি আলী!

(আল্লাহ তোমাকে নিরাপদ রাখুন!) (তোমার জন্য রইল) দু'আ এবং অনেক দু'আ। কঠিন অপেক্ষা এবং পরপর বেশ কয়েকটি চিঠি পাঠানোর পর তোমার পত্র হাতে পেলাম। ভীষণ আনন্দ ও প্রশান্তি অনুভূত হয়েছে। কিন্তু যেই তুমি সিন্ধু যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছ, তাতে অবশ্যই চিন্তার সৃষ্টি হয়ে গেছে। জানি না তা কোন দিকে? সেখানো অবস্থা-পরিস্থিতি কেমন আর থাকতেই বা হবে কতদিন? যদি আব্দু ও তালহার মতামত থাকে, তা হলে ভাল। কিন্তু তুমি পূর্ণ অবস্থার বৃত্তান্ত জানালে উত্তম হত; আমি নিশ্চিন্ত হয়ে যেতাম। আল্লাহ তোমাকে পূর্ণ সফলতা দান করুন– শুধু প্রত্যাশা এতটুকুই। স্রেফ এ কারণেই এত দূর-দূরান্তে সফর মেনে নিয়েছি। অন্যথায় এমন মনের মানুষদের পক্ষে তা মেনে নেওয়া বিরাট কঠিন এবং অসম্ভব ছিল। তোমাকে তার নিরাপত্তা হেফাযতে সমর্পন করছি। তিনি মহান রক্ষাকর্তা ও সাহায্যকারী। মুখ থুবড়ে পতিত খুপড়ির আমি কী করতে পারি! (কবিতার ভাষায়–)

ترے محفوظ کو کوئی ضرر پہونچا نہیں سکتا
عناصر چھو نہیں سکتے فلک دہمکا نہیں سکتا

"তুমি যারে রক্ষা কর, পারে না কেউ তার ক্ষতি পৌঁছাতে। ছুঁতে পারে না পরাশক্তি তারে; পারে না অন্তরীক্ষ ধমকাতে।"

ব্যাস! এই বলে মনকে বুঝিয়ে রাখি। তবে পূর্ণ বিশ্বাস রয়েছে তার রহমতের ওপর। আল্লাহ তা'আলার কাছে সব সময় প্রার্থনা করি, তিনি যেন তোমাকে নেক কাজের তাওফীক দেন। পৌঁছে দেন ইলমে দীনের সুউচ্চ মর্যাদায়। সদা সর্বদা রাখেন অটল-অবিচল। যাতে দুনিয়া-আখেরাতে সফলকাম হতে পার। আমীন।

আমার মনের আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে, উভয় জগতের যোগ্যতা-সাফল্য অর্জিত হোক তোমার। তুমি হও ঈর্ষণীয়। আর আমি যেন আমার চেষ্টা-সাধনায় হই সফল-কৃতকার্য। আমীন। তোমার এই সকল সফরই হোক বরকতময়। আমীন। আল্লাহ তা'আলা তোমার দ্বারা এমন কাজই করাক, যা হবে তোমার কল্যাণ, সাফল্য; আমার সুখ-আনন্দ আর মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি ও খুশির কারণ। আমীন। তোমার ভালমন্দ সম্পর্কে দ্রুত জানিয়ে যাবে। যেখানেই থাক, তিনিই মালিক। তিনিই আমাদের উপর দয়া করবেন। আর যে ফয়েয ও কল্যাণই লাভ হবে, আমাকে জানাবে। দু'আ করি।

সালামান্তে

তোমার আম্মা

দাওয়াত ও তাবলীগের আগ্রহ

আমি হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াছ রহ. এর খেদমতে প্রথমবার হাজির হয়েছি খ্রিষ্ট ১৯৪০ সন/ হিজরী ১৩৫৯ সনে। এখান থেকে আমার জীবনের দ্বিতীয় ধাপ শুরু হয়। এ যেন এক নতুন জীবনের অভিজ্ঞতা ছিল। তেমনি ছিল এক নতুন ব্যক্তিত্ব ও তত্ত্ব-রহস্যের উন্মেষ। দিল্লি থেকে ফেরার পর আমি আমার কয়েকজন সঙ্গী-সাথী নিয়ে –যাদের বেশিরভাগ দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামার শিক্ষক ও ছাত্র ছিলেন– লক্ষ্ণৌ ও তার আশপাশে তাবলীগী জামাতের মূলনীতির উপর এবং হযরত মাওলানা ইলিয়াছ রহ. এর আধ্যাত্মিক তত্ত্বাবধানে একটু-আধটু তাবলীগী কাজ শুরু করলাম। এত সবচেয়ে বেশি আনন্দ অনুভূত হয়েছে আমার আম্মাজান আর ভাই সাহেবের। দু'জনের আসল বাসনা এবং জীবনের সবচেয়ে বড় প্রত্যাশা ছিল দ্বীনের প্রচার-প্রসার এবং তাবলীগ ও দাওয়াতের কাজ। কিছুদিন পর বুঝতে পারলাম, আমার কোনও পত্র কিংবা কারও কথাবার্তায় আম্মাজানের ধারণা হয়েছে, আমার সেই প্রথম পর্যায়ের আগ্রহ-উদ্যম নেই। এরই প্রেক্ষিতে তিনি নিজের উদ্বেগের কথা প্রকাশ করেন। সে সময়কার একটি পত্রে তিনি লিখেন–

"আমার স্নেহের আলী!

(আল্লাহ তোমাকে সুস্থ-নিরপদ রাখুন!)

তোমার পত্র পেয়েছি। তোমার নাশ্‌তা ইত্যাদিতে তৃপ্তি আছে জেনে নিশ্চিত ও প্রীত হয়েছি। নদওয়াতে বেশি থাকার বিরোধী নয় তো আব্দু! সে যদি এর বিরোধী না-হয়, তবে ভাল। তুমি নিজেই বুঝতে পার। তাবলীগে চেষ্টা চালিয়ে যাও। যাতে উত্তরোত্তর উন্নতি হতে থাকে।

প্রথম প্রথম তোমার যে আগ্রহ-প্রেরণা ছিল, সেটা আজ বোধ হয় নেই। আব্দুরও এতে কিছুটা ঘাটতি আছে মনে হচ্ছে। অবশ্য প্রথম অবস্থা অক্ষুণ্ন না-থাকা অতি সাধারণ। তবে ধারবাহিকতা চালু রাখবে অবশ্যই। তাহলে আগ্রহও বাড়তে থাকবে। আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ করি, তোমার দ্বারা যেন সেই কাজ নেন, যা তার নেক ও মাকবূল বান্দাদেও দ্বারা করান। গর্ব-অহংকার ও লৌকিকতা থেকে রক্ষা করেন। তোমার উন্নতি-সাফল্য হোক ঈর্ষণীয়। আমীন। আল্লাহ তা'আলা সব কবুল করুন। আমীন।

সালামান্তে

তোমার আম্মা

বাইয়াত ও শ্রদ্ধাবোধ

(হযরত মাওলানা ইলিয়াছ রহ. এর হাতে এবং হযরত মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী এর বাইয়াতের নবায়ন)

এ সম্পর্ক এত গভীর হয়ে যায় যে, (১৯৪৩ খ্রিঃ) রজব ১৩৬২ হিজরীতে হযরত মাওলানা আমি অধমের দাওয়াত ও আকাঙ্ক্ষায় বন্ধু, শুভকাঙ্ক্ষী ও খাদেমদের এক বিশাল জামাতসহ লক্ষ্ণৌ তাশরীফ নিলেন। পূর্ণ এক সপ্তাহ অবস্থান করেন নদওয়াতুল উলামার মেহমানখানায়। অধিকন্তু অনুগ্রহ ও দয়া পরবশ আমাদের বাসস্থান দায়েরায়ে হযরত শাহ আলামুল্লাহ রায়বেরলীতে এসে ২৫ জুলাই ১৯৪৩ খ্রিঃ/ ২২ রজব ১৩৬২ হিজরী রবিবার দিন পদধূলি দেন। হযরত শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া সাহেব রহ., হযরত হাফেয ফখরুদ্দীন সাহেব পানিপতি রহ. সহ আরও ক'জন বন্ধু-শুভাকাঙ্ক্ষী সঙ্গে ছিলেন। আম্মাজান তখন পর্যন্ত কোনও বুযুর্গের নিকট বাই'আত হোন নি। একটি স্বপ্নের প্রেক্ষিতে –যাতে তার খেয়াল ছিল, রাসূলে কারীম সা. তাকে নিজের বাই'আতে গ্রহণ করে নিয়েছেন– তিনি খোদ আপন কামেল শায়খ পিতার নিকট বাইয়াত হওয়ার প্রয়োজনবোধ করেন নি। কিন্তু এ সুযোগে তার মনে বাইয়াতের আগ্রহণ সৃষ্টি হল। তিনি আমার নিকট সে কথা প্রকাশ করলেন। আমি মাওলানার কাছে আরয করলাম। মাওলানা ইস্তখারার নামায শেষে তৎক্ষণাত তাকে গ্রহণ করে নিলেন। আর আম্মাজানও অন্যান্য মহিলাদের সঙ্গে বাই'আতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলেন। মাওলানার মৃত্যু পর্যন্ত এই সম্পর্ক অটুট-অক্ষুণ্ণ ছিল।

মাওলানার ইন্তিকালের পর লক্ষ্ণৌত হযরত মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী রহ. এর কোনও শুভাগমনের প্রেক্ষিতে –যা আমাদের এখানে প্রায়ই হত– তিনি নতুন করে বাই'আত হোন। আমাদের পুরা ঘর তখন পর্যন্ত হযরত মাওলানার নিকটেই বাই'আত ছিল। কাজেই এই চিন্তা আসা বিশেষত হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াছ সাহেব রহ. এর ইন্তিকালের পর অযৌক্তিক কিছু ছিল না।

রাত্রিজাগরণ, দু'আ-দরূদ ইত্যাদির ব্যাপকতা

এক সময় দুর্বলতা ও বার্ধক্য বাড়ছিল। ১৯৩১ হিজরীতে আম্মাজান ভাইজানের পরামর্শে পর পর দু'চোখের ছানির অপারেশন করিয়েছিলেন। অপারেশন সফলও হয়েছিল। কিন্তু লেখাপড়ার ব্যস্ততা এবং প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন না-করার কারণে কয়েক বছর পর দৃষ্টিশক্তি ভীষণ দুর্বল হয়ে পড়ে। ১৯৬৩ খ্রিষ্টাব্দে দৃষ্টিশক্তি প্রায় চলে যাচ্ছিল। কিন্তু মা'মূলাতের

পাবন্দী (নিয়মিত আমলের অনুবর্তিতা), দু'আ-দরূদ, যিকির-আযকার, ওযীফা আর মুনাযাত-আরাধনায় মগ্নতা বাড়ছিল ক্রমেই। বিন্দুও কমছিল না। কেবল কুরআনে কারীম দেখে পড়া সম্ভব ছিল না। যখন থেকে আমার জ্ঞান হয়েছে, আমি তাকে তাহাজ্জুদ নামাযে নিয়ামিত পেয়েছি। দিন দিন রাত্রি-জাগরণ বৃদ্ধি পেতে থাকে। এর যত্ন ছিল অত্যধিক। তার প্রকৃত আনন্দ ও বাসনার জন্যে কাম্য সময় ছিল এটাই। তদুপরি সে সময় তার চোখ অধিকাংশ এমনিতেই খুলে যেত। এলার্ম লাগানোর খুব লক্ষ্য রাখতেন। ঘড়ি ঠিক রাখা এবং সূর্যোদয়-সূর্যাস্তের সঠিক সময় জানার বিরাট গুরুত্ব ছিল। শেষদিকে আমরা চেষ্টা করতাম, দুর্বলতা এবং বিভিন্ন ধরনের সমস্যার কারণে তিনি যেন খুব একটা আগে না ওঠেন। কিন্তু তিনি মানতেন না। আরও কিছুদিন পর আমার উপর আদেশ ছিল– যখন আমি ফজর নামাযে গমন করি, তখন যেন তাকে বলে দেই। কিন্তু প্রায় প্রতিদিনই যখন আমি বলতাম– সকাল হয়ে গেছে, তখন তিনি এমন আক্ষেপের সাথে জিজ্ঞাসা করতেন, যেমন কিছু পূর্বে হয়ে গেছে আর কিছু অপেক্ষা রয়ে গেছে।

বার্ধক্য ও দুর্বলতায় তার সেবা-শুশ্রূষা

জীবনের শেষ দিনগুলোতে তার পক্ষে নিজে চলাফেরাও কষ্টকর হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আল্লাহর অশেষ সাহায্যের সঙ্গে তার প্রতি আরও একটি সাহায্য ছিল, তাকে তিনি এমন ভাগ্যবান, অনুগত ও সেবা-শুশ্রূষায় আকুল সন্তানাদি এবং নাতি-নাতকর দান করেছিলেন। যারা কোনও প্রকার নিঃস্বতা-অসহায়ত্বের অনুভূতিই আসতে দেয় নি। এক দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তার এরূপ সেবা-শুশ্রূষা হয়েছে, যা বড় বড় অভিজাত, সম্ভ্রান্ত সম্মানী পদাধিকারী নারী-পুরুষদের ভাগ্যে জুটে নি। প্রত্যেকেই তার খেদমত করা, তাকে স্বস্তি-আরাম দেওয়া ইত্যাদিকে নিজের জন্য না শুধু সৌভাগ্যের কারণ বরং ইবাদত মনে করতেন। উপস্থিত থাকতেন মনেপ্রাণে। আমার বড় দুই বোন ছিলেন। তারা বছর বছর ধরে তার কাছাকাছিই বরং পাশেই থাকতেন। একজন স্নেহের মাওলানা মুহাম্মদ ছানী, মুহাম্মদ রাবে এবং মুহ্মাদ ওয়াযেহ (আল্লাহ তাদের নিরপদ রাখুন) -এর আম্মা আমাতুল আযীয সাহেবা স্বয়ং এবং তার পৌত্রীগণ খেদমতের জন্য সদা সচেষ্ট উপস্থিত থাকতেন। আরেক বোন– যিনি মাশাআল্লাহ স্বয়ং একজন লেখিকা ও কবি, মাসিক রিযওয়ান এর সম্পাদিকা ও "যাদে সফর" (সফরের পাথেয়)-এর রচয়িতা আমাতুল্লাহ তাসনীম সাহেবা– আম্মাজানের খেদমত

ও সান্নিধ্য লাভের সবচেয়ে বড় সৌভাগ্য তার নসীব হয়েছে। তার জীবনের সবচেয়ে বড় ব্যস্ততা, ওযীফা ও ব্রত ছিল আম্মাজানের খেদমত, দেখাশোনা, অসুস্থ হলে সেবা শুশ্রূষা ও চিকিৎসা করা। সবচেয়ে বেশি তারই দীর্ঘ সময় পর্যন্ত এবং ধারাবাহিকভাবে এই সৌভাগ্য হয়েছে। আমাদের ভাই-বোনদের মধ্যে তিনি এ ধন-রত্ন অর্জন করেছেন সর্বাধিক।

ইসলামের বিজয় আর দ্বীন প্রসারের তীব্র বাসনা

বার্ধক্য সত্ত্বেও অনুভূতি ও শ্রবণশক্তিতে বিন্দুমাত্র ত্রুটি আসে নি। মন-মস্তিষ্ক পুরোপুরি সক্রিয় ছিল নিজ কাজে। কোনও কোনও নতুন কথা ভুলে যেতেন ঠিক; যাদের নতুন আসা-যাওয়া শুরু হয়েছিল, তাদের নাম কখনও কখনও বিস্মৃত হয়ে যেতেন বটে। কিন্তু পুরনো লোকদের খুব স্মরণ ছিল তার। মাঝে মধ্যে এমন এমন পুরনো ছোট্ট কথাগুলো স্মরণ করিয়ে দিতেন, আমরা আশ্চর্য হয়ে যেতাম। সম্ভবত এটা ছিল তার সময়ানুবর্তিতা, দু'আ-দরূদ ও ওযীফার রবকত। যদ্দরুন শেষ মুহূর্ত পর্যন্তই তিনি অনুভূতিশীল ছিলেন। মন-মস্তিষ্কও কখনও অকেজো-অক্ষুণ্ন হয় নি। সে দিনগুলোতেও তার মনে ইসলামের বিজয়-সাফল্য, দ্বীনের প্রচার-প্রসারের সীমাহীন আগ্রহ-উদ্দীপনা ছিল। এর যে কোনও সংবাদ শুনে তার লোম-পশম সতেজ হয়ে যেত। তিনি ভুলে যেতেন নিজের দুঃখ-ব্যথা। তার মত দ্বীনের সম্ভ্রমবোধ এবং এর বিজয়ের আগ্রহ আমি ভাল ভাল পুরুষদের মধ্যেও দেখি নি। এরই ধ্যান-খেয়াল, এরই চিন্তা-ফিকির থাকত সবসময়। এ দিক থেকে তার মধ্যে কখনও কখনও তার প্রথম শাইখ হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াছ রহ. এর আলো-আভা দৃষ্টিগোচর হত। যখন খুব অস্থির-ব্যাকুল হয়ে পড়তেন, তখন কাব্য-কবিতায় নিজের আবেগ-অনুভূতি ও আকাঙ্ক্ষাগুলো প্রকাশ করতেন। নিজে লিখতে পড়তে পারতেন না বটে –স্নেহের মুহাম্মদ ছানীর কন্যা কিংবা সহদোরা বোনকে দিয়ে লেখাতেন। ইসলামের শত্রু এবং মুসলিম উম্মাহকে অপদস্তকারীদের প্রতি (যাদের আলোচনা সময় সময় সভা-সম্মেলনে হতে থাকত) চরম ঘৃণা পোষণ করতেন। তাদের উপর তার ভীষণ রাগ হত। আর নিশ্চিত তাদের জন্য হেদায়েতের দু'আ কিংবা ধ্বংসের বদদু'আও করতেন।

আমার ব্যাপারে তাঁর সবচেয়ে বড় প্রত্যাশা ছিল, আমার দ্বারা যেন দ্বীনের শক্তি সঞ্চার হয়, ইসলামের প্রসার ঘটে। মাঝে মধ্যে আমাকে জিজ্ঞাসা করতেন, আলী! তোমার হাতে কি কখনও কেউ মুসলমানও হয়েছে? আমি বলতাম– হ্যাঁ, হঠাৎ হঠাৎ দু'একজন কালিমা পড়েছে। তিনি বলতেন–

আমি চাই মানুষ দলে দলে তোমার হাতে কালিমা পড়ে মুসলমান হোক। একদিন বড় ভারী শ্বাস নিচ্ছিলেন। ছোট বোন বলল– শেষ পর্যন্ত আপনি কি চান? আপনার কি আকাঙ্ক্ষা আলী নবী হয়ে যাক? তিনি বললেন– আমি কি জানি না নবুয়তের পরিসমাপ্তি হয়ে গেছে! আমার আকাঙ্ক্ষা হল, তার হাতে যেন মানুষ দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করে। পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ইসলামের বিজয় ডঙ্কা বেজে ওঠে।

সুন্নাত পরিপালন ও দুনিয়া-বিমুখতা

অন্ধকার বরং তীব্র বাতাস, প্রবল বর্ষণ আর বিদ্যুৎ চমকের প্রতি তাঁর বিরাট ভয় ও আতঙ্ক হত। তিনি এসব মুহূর্তে তৎক্ষণাৎ ঘরের কোনায় চলে যেতেন। ব্যস্ত হয়ে পড়তেন দু'আ-দরূদে। এখানেও তার অনিচ্ছাকৃতভাবে একটি সুন্নাতের অনুসরণ ছিল। বয়স যতই বড়ছিল আর দুনিয়ার অবস্থা-পরিস্থিতি ও নানা ঘটনা শুনছিলেন, তার নিজের সে সময় পর্যন্ত বেঁচে থাকা এবং সেসব অবস্থা-পরিস্থিতি দেখার ব্যাপারে বিরাট দুঃখ ও উদ্বেগ হত। কিন্তু আল্লাহর সন্তুষ্টি ও মানশার উপর ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞ থাকতেন। প্রায় দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলতেন– জানি না, আমি সেসব অবস্থা দেখার জন্য বেঁচে থাকব কিনা? জানি না, আল্লাহর আর কি মর্জি আছে? কি কি দেখার বাকি আছে? কিয়ামত-নিকটবর্তী বিপর্যয়-বিশৃঙ্খলার ব্যাপারে জীবনভর ভয় পেতেন। প্রথম বয়সে কিয়ামতের আলামত আর হাশর-নশরের অবস্থা সম্পর্কে যা কিছু শুনেছিলেন এবং পড়েছিলেন, তা মনের গভীরে গেঁথেছিল। অক্ষরে অক্ষরে ছিল সেসবের বিশ্বাস। সেসব বিপদ-বিপর্যয় থেকে নিজের এবং নিজের সন্তানদের নিরাপত্তার ভাবনা ছিল। দু'আ করতেন তাদের জন্য।

জুমুআর দিন বড় যত্নসহ সূরা কাহাফ পড়ার আমল ছিল নিয়মিত। এ ব্যাপারে হাদীস শরীফে অনেক উপকারীতা ও ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। দাজ্জালের ফিৎনা থেকে নিরাপত্তা লাভের জন্যে একে বলা হয়েছে মহৌষধ। আমাকেও এর তাগিদ দিতেন অনেক। প্রায় সময় জিজ্ঞাসা করতেন– সূরা কাহ্ফ কি পড়েছ?

প্রিয় আমল

সে সময় তার সবচেয়ে পছন্দের কাজ ও প্রিয় আমল ছিল কুরআনে কারীমের সেসব রুকু, আয়াত, আসমায়ে হুসনা আর দরূদ শরীফের সেসব বিশেষ শব্দাবলি পাঠ করে করে তার ছোটদের এবং ঘরের লোকদের সকলের উপর দম করা (ফুঁক দেওয়া) –যে সব আয়াত ও দু'আ-দরূদের বিশেষ ফযীলত-উপকারীতা ও বরকত বিভিন্ন বিতাবাদি কিংবা তার নিজের

অভিজ্ঞতায় লক্ষ্য করেছিলেন। পড়তে প্রায় ঘণ্টা-পৌনে এক ঘণ্টা লেগে যেত। এরপর দম করার এক দীর্ঘ লাইন পড়ে যেত। শেষে তিনি খুবই দুর্বল ও জীর্ণ-শীর্ণ হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু নিয়মিত আমলগুলো পূর্ণ করা এবং দু'আ-দরূদ পাঠ করায় আল্লাহ্ মালুম তার কোত্থেকে এত শক্তি আসত যে, তাকে বিরাট সুস্থ শক্তিশালী মনে হত। কয়েক দিন আগের কথা, আমি এবং ভাগ্নে-ভাতিজা বসেছিলাম। তিনি পড়ছিলেন। আমরা সবাই বললাম– এ শক্তি জানি না কোত্থেকে আসছে? এটা নিছক আত্মিক শক্তি। দম করা পানিও সব সময় রাখতেন। কাছে কি দূরের রুগ্ন-অভাবী লোকজন এসে তা বরাবরই নিয়ে যেত। বলত, এর উপকারীতা আর মহান আল্লাহর দেওয়া সুস্থতা ও বরকতের কথা।

প্রতিবার যখন তাঁর উপর কোনো রোগের আক্রমণ হত, আমরা সবাই তখন ভাবতাম, এই বুঝি নিশিথ প্রদীপ নিভে গেল! শরীরে একরতি প্রতিরোধশক্তিও ছিল না। কেবল ছিল একটি বিশ্বাস, আগ্রহ ও আল্লাহর নামের রবকত। তিনি নিজের মা'মূলাত, নিয়মিত আমলগুলো এবং যিকির-আযকার অত্যন্ত যত্নসহ পূর্ণ করতেন। যে দিন কেটে যাচ্ছিল, আমরা তাকে গনীমত করতাম। আমি কখনও তার বয়স হিসাব করতাম না আর না কাউকে করতে দিতাম। কেননা আল্লাহর রহমতের এ ছায়া এবং মায়ের পদতলের এ জান্নাত আমাদের ঘরে যতদিন থাকবে, পুরোই মহান আল্লাহর অনুগ্রহ ও করুণা।

আমার ভূপাল সফর, আম্মাজানের প্রতিক্রিয়া

অবশেষে যার ভয় ছিল এবং যা অপছন্দনীয়, সেই মুহূর্তটিএসে গেল। ২৩ আগস্ট ১৯৬৮ খ্রিষ্টাব্দে তিনি যখন একটি রোগের আক্রমণ থেকে বেঁচে ওঠলেন, তখন আমি নিবেদন করলাম– দিল্লি ও ভূপালে একটি সফরের প্রয়োজন। কিন্তু সবার আগে চাই আপনার খুশি ও সন্তুষ্টি। আমি অপারগতার পত্র লিখেছিলাম দিল্লি। কিন্তু তাদের মনের আকুলতা দেখে আপনাকে বলাই ভাল মনে করলাম। এটা ছিল তাঁর জন্য সবচেয়ে কঠিন পরাকাষ্ঠা, বিরাট বড় মুজাহাদা। কিন্তু তিনি নিজেকে সামলে নিয়ে জবাব দিলেন– আল্লাহ তোমাকে যে কাজের জন্য বানিয়েছেন, তার জন্য নিশ্চয় যাবে। তবে ফিরবে কবে নাগাদ? আমি বললাম– আগামী শুক্রবার, নতুবা শনিবারে তো অবশ্যই ভুল হবে না (এটাই সেই দিন, যেদিন তিনি ইন্তিকাল করেন)। আম্মাজান বললেন– আচ্ছা যাও! যাত্রাকালে আমাকে তিনি নিয়মমাফিক বিদায় জানালেন। পড়লেন আয়াতে কারীমা আর সুন্নাত দু'আসমূহ।

মৃত্যু রোগ এবং একটি পুণ্যময় স্বপ্ন

২৮ আগস্ট। সকাল বেলা। ভূপালে বসে আছি। আমার স্নেহের মুহাম্মদ ছানীর তারবার্তা পেলাম– নানী সাহেবার শরীর ভাল নয়। আপনি শীঘ্রই ফিরে আসুন। যে পেরেশানীর মুহূর্তে সেখান থেকে ফিরে এসেছি, আল্লাহ পাক যেন সে পেরেশানী আর না দেখান। সব চেয়ে বড় আকাঙ্ক্ষা ছিল, আমি যেন তার জীবদ্দশায় পৌঁছে যাই। ভাইজানের দাফন কাজে শরীক না-থাকার দাগ সারাজীবন থাকবে। মৃত্যু একটি চিরন্তন সত্য। যে কোনও দিন তা এসে হাজির হবে অবশ্যই। একে টলানো বা পিছিয়ে দেওয়া যায় না। আল্লাহ পাক অনুগ্রহ করলেন, আমি বৃহস্পতিবার ২৯ আগস্ট সকালে রায়বেরলী এসে পৌঁছালাম। জানতে পেলাম, আমার যাত্রা করার পরের দিনই রাত্রিবেলা আম্মাজান যখন তাহাজ্জুদের জন্য ওঠলেন এবং প্রস্রাবের জন্য তাকে চৌকিতে বসানো হল, তখন অন্ধকার আর তন্দ্রার কারণে সবকিছু পরিষ্কার বুঝা গেল না, হাত ছুটে গেল। তিনি পড়ে গেলেন মাটিতে। এতে তার কাঁধ এবং হাতের কব্জির হাড়ে চোট লাগল। তারবার্তায় আমার প্রস্থানের সংবাদ তিনি শুনেছিলেন। এতে তার বিরাট আনন্দ হয়েছিল। আমি এসে হাজির হলে তিনি বললেন– অর্ধেক শক্তি ফিরে এসেছে। সালাম করলেন। কাছে ডাকলেন। বললেন– আমি একটি স্বপ্ন দেখেছি, "আমার শরীরের লোম-পশম থেকে আল্লাহর হাম্‌দ-ছানা (প্রশংসা-স্তুতি) ঠিকরে পড়ছে। আর আশ্চর্যরকমের আনন্দ-আগ্রহ হচ্ছে।" আমি বললাম– এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। খুবই বরকতপূর্ণ স্বপ্ন। শুক্রবারও অনেকটা ভালই কেটেছে। তবে হাড়ের ব্যথা ছিল প্রচণ্ড।

অন্তিম যাত্রা

শনিবার রাত কাটে অস্থিরতায়। যোহর নামায পড়েন সচেতন-স্বজ্ঞানে। অঙ্গুলি টিপে যিকির শুরু করেন। এরপরে পরযাত্রার ঘাঁটি শুরু হয়ে যায়। আপন তিন মরহুমা বোনের নাম নিয়ে বলেন– তারা লক্ষ্ণৌ গিয়েছেন। এরপরেই মৃত্যু যন্ত্রণা শুরু হয়ে যায়। নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে ইসমে যাত "আল্লাহ আল্লাহ" যিকির ধ্বনী চলতে থাকে। যখন এ আওয়াজ বন্ধ হল, তখন বুঝা গেল, তিনি আমাদের সকলকে ছেড়ে তার সেই সৃষ্টিকর্তা ও মালিকের কাছে পৌঁছে গেছেন, যার নাম নিতেন সারা জীবন। সর্বদা কড়া নাড়তেন যার রহমতের দুয়ারে।

يا أيتها النفس المطمئن إرجعى إلى ربك راضية مرضية فادخلى فى عبادى وادخلى جنتى

"হে প্রশান্ত মন! তুমি তোমার পালনকর্তার নিকট ফিরে যাও সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে। তারপর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও আমার বান্দাদের এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর।" (সূরা ফাজ্‌র ঃ ২৭-৩০)

পরের দিন রবিবার ৭ জুমা উখরা ১৩৮৮ হিজরী/১লা সেপ্টেম্বর ১৯৬৮ খ্রিষ্টাব্দে দেশবরেণ্য বহু বুযুর্গ, আলেম-উলামা, ছাত্র-শিক্ষক এবং তাবলীগ জামাতের অসংখ্য লোকজন তার জানাযার নামায পড়েন। আর চিরদিনের জন্য আব্বাজান মাওলানা হাকীম সাইয়িদ আব্দুল হাই রহ. এর পাশে এবং শাইখুল মাশায়েখ হযরত শাহ আলামুল্লাহ্ রহ. এর মুহতারাম সহধর্মিনীর পদতলে আরাম নিদ্রায় শায়িত হন। পূর্ণ সাতচল্লিশ বছরের দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর গিয়ে মিলিত হন নিজের সুযোগ্য স্বামী ও জীবনসঙ্গীর সাথে। কি আশ্চর্য! ঠিক এ মাসেই (জুমাঃ উখরা ১৩৪১ হিঃ) আব্বাজান ইন্তিকাল করেছিলেন।

দেশ-বিদেশ থেকে যেসব শোকবার্তা, সমবেদনাপত্র এসেছে, তা থেকে মাগফেরাতের দু'আ এবং অনেক ব্যাপকভিত্তিক ঈছালে ছাওয়াবের খবর পাওয়া গেছে। তা ছাড়া বুযুর্গানে দ্বীন, সমসাময়িক উলামা-মাশাইখ ও আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণের শোকপত্র থেকে আল্লাহর রহমত এবং তার মাকবুল হওয়ার আশাবাদ সৃষ্টি হয়।

যেসব রমণী আর যে পুরুষ এ বিষয়টি পড়বেন, তাদের কাছেও নিবেদন রইল, আম্মাজানের জন্য মাগফেরাতের দু'আ ও ছাওয়াব রেছানীতে কার্পণ্য করবেন না। কেননা দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণকারী সকলের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন এরই। এতেই তারা খুশি হন। এর মুখাপেক্ষী নারী-পুরুষ, ছোট-বড় সকলেই।

আমার বোন মরহুমা আমাতুল্লাহ্ তাসনীম সাহেবা

পূর্ণ অর্ধশতক পঞ্চাশ বছরের ভাইবোনের মহাব্বত, সহাবস্থান, দুঃখ-সুখে ও হাসি-কান্নায় অংশীদারত্ব, পড়াশোনা ও অধ্যয়নে একতা-সহানুভূতি, লেখালেখি ও রচনা-গ্রন্থনায় পরামর্শ ও কল্যাণ কামনা, তারপর হজ্বের দীর্ঘ সফরে একসঙ্গে থাকা এবং শেষদিকে অসুস্থতা এবং দুনিয়া থেকে বিদায়ের দীর্ঘ ও মর্মস্পর্শী ঘটনা আর তারপর এক ব্যথা ভারাক্রান্ত ভাইয়ের অভিব্যক্তি প্রকাশ –যার অন্তর-আত্মায় এই দুর্ঘটনার আঘাত

লেগেছে এখনও বেশিদিন হয় নি– বিরাট কঠিন কাজ। ইতিহাস ও জীবনচরিত নিয়ে অত্যুক্তি ছাড়াই শত-সহস্র পৃষ্ঠা কালো করার পরও কলম এই বৃত্তান্ত লিখতে গিয়ে থমকে দাঁড়াচ্ছে বারবার। কারণ, হয়তো এতে যুগের অবস্থা-প্রকৃতি অপেক্ষা "আত্মকথা"-র অংশ বেশি হবে। সেই বৃত্তান্ত শোনানোর দ্বারা এমন অনেক ঘটনা ও দৃশ্যপট চোখের সামনে ভেসে ওঠে, যার দ্বারা জীবন্ত হয়ে যায় পুরনো ক্ষত। চক্ষু যুগল হয় বেঘোর অশ্রুসজল। মনকে শান্ত করা ছাড়া তার বৃত্তান্ত শোনানো এবং লেখা সম্ভব নয়।

পঞ্চাশ বছরের কথাও বলেছি, জ্ঞান-বুদ্ধি হওয়ার সময়ের কথা ভেবে। নতুবা শৈশবের দিনগুলোও এতে যোগ করে নিলে এই সময় সীমা আরও দীর্ঘ হয়ে যায়। আমার এবং মরহুমা বোনের মধ্যে মাত্র ছয় বছরের ছোট-বড়োর ব্যবধান ছিল।

তার জন্ম হয়েছে ১২ জুমাঃ উলা ১৩২৬ হিজরী মোতাবেক ১৮ জুন ১৯০৮ খ্রিঃ রোজ বৃহস্পতিবার আর আমার জন্ম হয় ৬ মহররম ১৩৩৩ হিজরী (১৯১৪ খ্রিঃ) সনে। সম্ভবত ১৯২০-২১ খ্রিষ্টাব্দের কাছাকাছি কোনও এক সময়ের কথা। লক্ষ্ণৌর আমীনাবাদের সেই মহল্লায়, সেকালে যাকে ঝাউলাল বাজার বলা হত আর আজ তার মাথায় "মুহাম্মদ আলী লেন" লেখা ফলক লাগানো আছে– আমার আব্বাজন মাওলানা হাকীম সাইয়িদ আব্দুল হাই সাহেবের একদম সড়কের এক প্রান্তে বাড়ি ও দাওয়াখানা ছিল। আজও আল্লাহর দয়ায় সেই বাড়ি আমাদের ব্যবহারাধীন রয়েছে। এ বাড়িতেই বসবাস করত আমাদের ছোট্ট পরিবার। সে পরিবার ছিল বাবা-মা আর চার ভাই-বোনদের নিয়ে। দু'ভাই, দু'বোন। বড় ভাই যিনি পরবর্তীতে ডা. হাকীম মৌলভী সাইয়িদ আব্দুল আলী সাহেব বি.এস.সি., এম.বি.বি.এস., নাযেমে নদওয়াতুল উলামা নামে প্রসিদ্ধ হয়েছেন। তার ছোট এক বোন আমাতুল আযীয সাহেবা [স্নেহের মৌলভী মুহাম্মদ ছানী মরহুম, মুহাম্মদ রাবে', মুহাম্মদ ওয়াযেহ (আল্লাহ তাদের নিরাপদ রাখুন)- এর আম্মা]। আল্লাহ পাক তার জীবনে বরকত দান করেছেন। তিনিই আজ আমাদের ক্ষুদ্র পরিবারের বরকত এবং বুযুর্গদের স্মৃতিচিহ্ন। তার ছোট আমাতুল্লাহ তাসনীম সাহেবা। যাকে বংশের মধ্যে বিবি আয়েশা বলেই সকলে চিনত এবং ডাকত। আর আজ যিনি আল্লাহর রহমতের প্রান্তে পৌঁছে গেছেন। আর সবার ছোট ছিল এ অধম লেখক। যার বয়স ছিল তখন ছয়-সাত বছর। আমার বড় বোনের বিয়ে হয়ে গিয়েছিল আগেই। তিনি অধিকাংশ শ্বশুর বাড়ি রায়বেরেলী আর ভাবী সাহেবা তার বাপের বাড়ি হেন্সু চলে যেতেন। দু'জনই সেখানে কয়েক

মাস পর্যন্ত অবস্থান করতেন। এজন্য আম্মাজানের বেশিরভাগ সম্পর্ক ও সহাবস্থান ছিল উক্ত মরহুমা বোনের সঙ্গেই।

আমাদের বংশ আলেম-উলামা ও লেখকদের বংশ। আব্বাজান ছিলেন তার সময়ের মহান লেখকদের একজন। বংশীয় উত্তরাধিকার সূত্রতার প্রভাবগুলো হয়ে থাকে বিরাট শক্তিশালী। তা চালু থাকে প্রজন্মের পর প্রজন্মে। শিশু-কিশোর ছেলেমেয়ে সকলের মধ্যে তার প্রভাব কমবেশি পরিলক্ষিত হয়। কিছু ঐ পূর্বসূরীদের প্রভাবে, কিছু আব্বাজানের আগ্রহ-মনোযোগীতায় আমাদের পুরো পরিবারের উপর এই বই-পুস্তকে (অধ্যয়ন) আগ্রহ ছিল ছায়াময়। বই-পুস্তক পড়ার আগ্রহ-উদ্যম অনেকটা আগ্রহের সীমা ছাড়িয়ে বদ-অভ্যাস ও ব্যাধি পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। ছাপা কোনও জিনিস হাতে পেলে তা পড়া ছাড়া কেউ ফেলতে পারত না। আমাদের ভাইবোনের যৎসামান্য যে পয়সা হাতখরচের জন্য জুটত কিংবা কোনও বুযুর্গ যাওয়ার সময় সেকালের বংশগত রীতি অনুযায়ী শিশুদের যে অর্থকড়ি দিয়ে যেতেন, তা খরচের একটি মাত্র প্রিয় খাত ছিল অর্থাৎ তা দিয়ে কোনও বই-পুস্তক কেনা। এ প্রসঙ্গে খোদ আমার একটি হৃদয়গ্রাহী ঘটনা শুনুন। একবার আমার হাতে এরূপ কিছু টাকা এসে গেল। তা দু'-এক আনা থেকে বেশি ছিল না। আমি তখন এতই ছোট ছিলাম যে, আমার এতটুকুও জানা ছিল না– বই-পুস্তক কেবল বই বিক্রেতার কাছেই পাওয়া যায়। আর প্রত্যেক জিনিসের দোকান ও বিপনন কেন্দ্র আলাদা আলাদা। আমি আমীনাবাদ গেলাম। ঘণ্টাঘার পার্কের সম্মুখে বড় বড় দোকানের যে লাইন রয়েছে, তন্মধ্যে কোনও এক ঔষধের দোকানে গিয়ে দাঁড়ালাম। সম্ভবত "সালুমন কোম্পানী" ছিল। আমি পয়সা বাড়িয়ে দিয়ে বললাম, আমায় বই দিন। দোকানে কর্মরত লোকটি মনে করলেন, কোনও সম্ভ্রান্ত পরিবারের সরল ছেলে। ঔষধের দোকানে কি আর বই পাওয়া যায়। ঔষধের তালিকা ছিল উর্দূতে। তিনি তা-ই বাড়িয়ে দিলেন এবং পয়সাও ফিরিয়ে দিলেন। আমি তো খুশিতে আটখানা। বইও পেলাম আর পয়সাও হাতে রইল। খুশি মনে ফিরে এলাম ঘরে। আর তা-ই দিয়ে সাজালাম নিজের কুতুবখানা, যা আব্বাজানের ওখান থেকে কুড়িয়ে পাওয়া তার পরিত্যক্ত বই-পুস্তক দ্বারা বানিয়েছিলাম। যেগুলো তিনি ফেলে দিতেন ময়লার ঝুড়িতে। এমনই আগ্রহ ছিল আমার দু'বোনের। বই ছাড়া তাদের স্বস্তি আসত না। সেকালে জনৈক বইবিক্রেতা আমাদের গলিতে মাঝেমধ্যেই আসত। আর হাঁক ছাড়ত হরিণীনামা, নূরনামা, ধাত্রী হালীমার

কাহিনী, নবী পরিবারের মুজিযা, মীলাদনামা ইত্যাদি বলে বলে। তার হাঁক এখনও আমার কানে বাজে। চোখের পাতায় ভাসে সেই দৃশ্য। সে উক্ত বই-পুস্তকের ছন্দ কবিতাগুলো গেয়ে গেয়ে পড়েও শোনাত। এদিকে তার হাঁক কানে আসল। ওদিকে দু'বোনের পক্ষ থেকে হুকুম পেলাম– অমুক বই নিয়ে এসো! গেলাম দৌড়ে দৌড়ে। কিনে আনলাম বই।

বলা বাহুল্য, আমাদের পরিবার আকীদা-বিশ্বাস ও মতাদর্শে ছিল হযরত সাইয়িদ আহমদ শহীদ রহ. এবং হযরত শাহ ইসমাঈল শহীদ রহ. এর কঠোর অনুসারী। তাদের প্রভাব-ক্রিয়া আমাদের মধ্যে এমনই শেকড় ছড়িয়ে বসেছিল, যার ফলে ভিত্তিহীন অমূলক আর অনির্ভরযোগ্য জিনিস, যার দ্বারা ঈমান-আকীদায় ত্রুটি আসে– সেগুলো ঘরে কখনও স্থান পায় নি। আকীদার বিষয়ে পুরুষদের চেয়ে নারীরা ছিল বেশি কঠোর। এজন্য "নবী পরিবারের মুজিযা" প্রভৃতি জাতীয় বই-পুস্তকের তো এখানে স্থান ছিল না। তবে সীরাত, জীবনচরিত, বুযুর্গদের ঘটনাবলি এবং অক্ষতিকর (যাতে ক্ষতি নেই) হৃদয়গ্রাহী বই-পুস্তক পদ্যে হোক চাই গদ্যে হাতে হাতে চলতে থাকত। সেসব বই-পুস্তকের দাম আর কত ছিল। কোনোটির দুই পয়সা, কোনোটির চার পয়সা, আর দাম বেশি হলে দুই আনা-চার আনা। দু'বোনের একজন সুর দিয়ে মজা করে পড়তে শুরু করলেন। আর যতক্ষণ না পড়ে শেষ করলেন, অন্যদের স্বস্তি আসল না। যে সময় "আন্-নদওয়াহ"-এর পাতায় "মেরী মুহসিন কিতাবেঁ" (আমার প্রিয় বইগুলো) শিরোনামে এ জাতীয় প্রবন্ধগুলো প্রকাশ হচ্ছিল, সেসময় আমর বলার কারণে কিংবা স্বআগ্রহে এই মরহুমা সহোদরা বোনও এ বিষয়ে প্রবন্ধ লিখলেন। যার শিরোনাম ছিল "মেরী বে-যবান উস্তানিয়াঁ" (বা আমার নির্বাক শিক্ষিকা)। তার সে প্রবন্ধ জলন্ধরের চিন্তাশীল নারী বিষয়ক পুস্তিকা "মুসলিমা" তে ছাপা হয়েছে।

সেকালেই একটি বই সম্ভবত উর্দু পাঠ্যের একটি অংশ হিসেবে আমি পড়েছি, সেটি আমার হাতে আসল। আর তা ছিল মৌলভী ঈসমাঈ মীরাঠী বিরচিত "সফীনায়ে উর্দূ" বইখানা। এই কচি বয়সে উক্ত বইখানার নির্বাচিত বিষয়বস্তু ও কবিতাগুলো –যা ছিল উর্দূ ভাষার বিশিষ্ট গদ্যকার, প্রবন্ধকার ও কবি-সাহিত্যিকদের কলমে– আমাদের মেধা-মননে আর মন-মাস্তিষ্কে বিরাট প্রভাব ফেলে, বিশেষত মাওলানা যাফর আলী খানের কবিতা "রাজা দশরথের গল্প ও তার বক্তব্য"। যাতে তিনি অত্যন্ত প্রভাবময় ভঙ্গিতে রাজা দশরথের হাতে জনৈক ঋষির ছেলে (যে তার বৃদ্ধ পিতার জন্য পানি আনতে সকাল সকাল নদীতে গিয়েছিল আর তার তীরে ধরাশায়ী

হয়ে গিয়েছিল)-এর হৃদয়বিদারক কাহিনী শুনিয়েছেন। এতে কবিত্বের রত্ন, প্রভাবময় দৃশ্যপট আর আবেগ-উচ্ছ্বাস চিত্রায়নের যোগ্যতা চূড়ান্তভাবেই পরিলক্ষিত হয়। আমরা দু'ভাইবোন এ কাহিনী মজা করে বারবার পড়েছি। বিস্ময়ের কিছু নেই! এর কোনও কোনও অংশে আমাদের মন উদ্বেলিত হয়ে যেত। চক্ষুদ্বয় হত অশ্রুসজল। উক্ত কবিতার শুরু ছিল!

ابر تہا چھایا ہوا اور فصل تہی برسات کی
تہی زمیں پہنے ہوئے وردی ہری باغات کی

"ছেয়েছিল মেঘ আর মৌসুম ছিল বরষার,
সেজেছিল পৃথিবী অপরূপে শ্যামল বাগিচার।"

এরপর আসে তার দ্বিতীয় কবিতা। সেটি মূসা নদীর তুফান সম্পর্কিত। যার শুরু ছিল :

آئے نامراد ندی تجہ پر غضب خدا کا
الٹا ہے تونے تختہ پاران آشنا کا

(ব্যর্থ হে নদী! খোদার ক্রোধ তোমার পরে;
উল্টালে তুমি আপন বন্ধুর আসন ধরে)।

আমরা স্বয়ং বেশ কয়েকবার সমুদ্র উপকূলে– যেখানে মারাত্মক প্লাবন আসে– সেখানে বসবাস করার কারণে এ অভিজ্ঞতা আমাদের যথেষ্ট হয়েছিল। এজন্য আমরা সেই বিপদের অনুমান করতে পারতাম, মূসা নদীর প্লাবনে আক্রান্ত লোকদেরকে যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। উক্ত বিষয়ে সংকলিত গদ্য-পদ্যগুলো বারবার পড়ার কারণে আমাদের মধ্যে বেশ উত্তম গদ্য এবং ভাল কবিতার স্বাদ গ্রহণের যোগ্যতা সৃষ্টি হয়েছে।

আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে আমাদের ঘরে মেহমানদের আসা-যাওয়া রীতিমত চলতে থাকত। তাদের কোনও সংখ্যা ও সময় নির্দিষ্ট ছিল না। সেকালে অভিজাত সম্ভ্রান্ত লোকদের নীতি ছিল, কোনও বংশের কোনও ঘর-পরিবার যদি কোনও শহরে থাকত আর সে বংশের কাউকে– কাছের হোক চাই দূরের– যে প্রয়োজনেই শহরে আসতে হত, তবে সে ঐ ঘরেরই মেহমান হত। এসব মেহমানের জন্য খাবার প্রস্তুত করা একা পাঁচকীর পক্ষে সম্ভব ছিল না। খাবার রান্নার জন্য বাবুর্চি/আয়া নিযুক্ত ছিল। তার বোঝা সবচেয়ে বেশি আমার ঐ ছোট বোনের উপর পড়ত। আম্মাজানের খাবার রান্না করা, সেলাই ও কারুকাজে বিরাট দক্ষতা ছিল। এক্ষেত্রে তিনি নতুন নতুন আবিষ্কার উদ্ভাবন করতে থাকতেন। তিনিই এ বোনকে এসব কাজের জন্য ভালভাবে তৈরী করে

দিয়েছিলেন। আর অধিকাংশ তার কষ্ট-শ্রম এবং সময়-অসময়ে মেহনতের কারণে ভাইজানের কান্না এসে যেত। কখনও কখনও তো সাহস যোগানোর জন্যে তিনি তার পাশে গিয়ে বসতেন। সহযোগিতারও চেষ্টা করতেন।

আমাদের ঘরগুলোতে মেয়েদের শিক্ষাদীক্ষার ঘরেই হত। সহোদরা বোন তখন পর্যন্ত সকল শিক্ষা পেয়েছিলেন আব্বাজন এবং আপন চাচা মাওলানা আযীযুর রহমান নদভী সাহেবের কাছ থেকে। এ শিক্ষা কুরআনে কারীম, উর্দু আর সামান্য ফার্সী জ্ঞান থেকে বেশি ছিল না। গ্রহণযোগ্য প্রিয় কিতাব ছিল "ছমছামুল ইসলাম" তথা "ইসলামের তীক্ষ্ণ তরবারী" নামক আল্লামা ওয়াকেদী বিরচিত আরবী গ্রন্থ "ফুতূহাতু শাম"-এর কাব্যানুবাদ। যাতে প্রায় পঁচিশ হাজার শ্লোক আছে। এটি যেন সেকালের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য ইসলামের রাজকাহিনী ছিল। এ কিতাবখানা বংশেরই একজন এই দীন লেখকের আব্বাজানের ফুফা মুনশী সাইয়িদ আব্দুর রায্যাক সাহেব কালামী টোঙ্কী বিরচিত কবিতা। তিনি ছিলেন সুনিপুন কথাশিল্পী কবি। জেহাদী প্রেরণা এবং ইসলামী উদ্দীপনা পেয়েছিলেন তিনি তার পিতামহ সাইয়িদ আহমদ শহীদ রহ. এর উত্তরাধিকার সূত্রে। একে কিতাব কি বলব! মনে হত, জিহাদের উত্তপ্ত রণক্ষেত্র বিরাজ করছে। ঝনঝন করছে ঝলমলে তরবারী। মুজাহিদগণ অঞ্জলিতে মাথা রেখে প্রাণপণে লড়াই করছেন। বইটির বাচনিক প্রভাবে পাঠকের কণ্ঠ ভারী আর চোখ হয়ে যেত অশ্রুসিক্ত। শ্রোতাদের আপাদমস্তকে থাকত না হুঁশ। আমাদের বংশে দীর্ঘকাল ধরে এ রীতি চলে আসছিল। কোনও দুর্ঘটনা কিংবা উৎসবকালে ঘরে ঘরে উক্ত কিতাব দ্রুত পাঠ করতে সক্ষম কোনও নারী পড়ে শোনাত আর বংশের সকল স্ত্রী-কন্যা-জায়ারা তা শুনত। আমাদের বংশে বইটি পাঠের বিশেষ আকর্ষণ ছিল দু'জনের। বড়-বৃদ্ধদের মধ্যে আমার আপন খালা বিবি সালেহার– যিনি কুরআনে হাফেযাও ছিলেন। আর আমার ঐ মরহুমা বোনের। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত সহোদরা সেই বোনের কাছে এ বইটি বিরাট প্রিয় ছিল। এর দ্বারা তিনি নিজের রচনাবলী ও কাব্যচর্চায় উপকৃত হয়েছেন।

সে সময় তিনি কোথাও মাওলানা সুলাইমান নদভী এর প্রসিদ্ধ রচনা "সীরাতে আয়েশা"-এর বিজ্ঞাপন দেখলেন। আজ মনে নেই, মরহুম ভাইজান কি এ বইয়ের আলোচনা করেছেন নাকি এর বিজ্ঞাপনের উপর চোখ পড়েছে! যাহোক, ঐ সহোদরা বোন বইটি সংগ্রহ করলেন এবং একে মনমন্ত্র বানিয়ে নিলেন। এর সাথে সম্পর্কের কয়েকটি প্রকাশ্য কারণও

ছিল। প্রথম তো স্বানামের সম্মান ও গৌরব। দ্বিতীয়ত হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাযি. এর জ্ঞানের গভীরতা ও স্বকীয়তা, পূর্ব থেকেই তার অন্ত-আত্মায় যার স্থান ও মূল্য ছিল। মোটকথা, এ বইটি তিনি কেবল পড়েই শেষ করেন নি বরং এর বিষয়বস্তুগুলো নিজের মধ্যে গেঁথে নিয়েছেন এবং আকর্ষণ করছেন। এটা তার জন্য বিরাট পাথেয় ও পথপ্রদর্শক প্রমাণিত হয়। সেকালে আর বিস্ময়ের কিছু নয় এ বইয়েরই বরকতে তিনি আরবী পড়তে শুরু করেন। তখন আমারও আরবী ভাষা শিক্ষার শিশুকাল ছিল। কিন্তু আমি ঘরের বাইরে বিশিষ্ট বিখ্যাত ও সুযোগ্য অভিজ্ঞ উস্তাদগণের নিকট পড়তাম। যার মধ্যে শাস্ত্রীয় পণ্ডিৎ শায়খ খলীল আরব ইয়ামেনী ভূপালীর স্থান ছিল সবার শীর্ষে। একারণে আমি তাকে কিছুটা সাহায্য করার যোগ্য হয়ে গিয়েছিলাম। সবচেয়ে বড় সাহায্য তিনি পেয়েছেন আপন ফুফা মাওলানা সাইয়িদ তালহা সাহেব হাসানীর কাছ থেকে। যিনি গরমের ছুটিতে লাহোর থেকে বাড়ি চলে আসতেন। তার মধ্যে ছিল জ্ঞানকে সুরা পান করানোর অপূর্ব যোগ্যতা। নাহব-ছরফের জরুরী মাসায়েল চর্চা ও রপ্ত করানোর ক্ষেত্রে ছিল তার লম্বা হাত। এ বিষয়ে আরও ছিল তার আশ্চর্য আশ্চর্য রসবচন। ইতিহাস ও কাব্য কবিতায়ও ছিল তার বেশ সুরুচি। সহোদরা বোনের মানসিকতা সব সময়ই ছিল ভারসাম্যপূর্ণ। আর এ মানসিকতার পৈত্রিক সম্পদ আমাদের ভাইবোনদের মধ্যে কেবল তিনিই পেয়েছিলেন। "গুলে রাণা" (কমনীয় ফুল) ছিল ঘরের সম্পদ। এটা তিনি এতবার পড়েছেন, যেন তিনি এর হাফেয ছিলেন। বংশের মধ্যে রাত্রি-জাগরণের প্রতিযোগিতা অনেক পুরনো। এতে অতিরঞ্জন না হলে উপকারীতাও প্রচুর। এখানে ভারী মুশকিলেই কেউ তার থেকে অগ্রগামী হতে পারত। কবিতা নির্বাচনের বিষয়টি ছিল খুবই স্বচ্ছ-পবিত্র। পরবর্তী সময়ে তিনি এ বিষয়ে বইও রচনা করেছেন। যা উস্তাদগণের পছন্দনীয় ও পবিত্র কবিতাসমূহের উত্তমতর সংকলন হয়ে গেছে। তার বই-পুস্তক সংগ্রহের আগ্রহ ছিল প্রচুর। প্রাচীন আদলে নির্মিত ঘরে তিনি এর জন্য পৃথক একটি স্থান নির্দিষ্ট করে নিয়েছিলেন, যেখানে তিনি নিজের বই-পুস্তকের সংগ্রহ সাজিয়ে রাখতেন।

অধ্যয়ন ও লেখালেখির এ আগ্রহের কারণে মনে করা যাবে না যে, তিনি হাতের কাজ, সেলাই, কারুকাজ, রান্নাবান্না ইত্যাদির সেসব কাজ সম্পর্কে অনভিজ্ঞ ছিলেন কিংবা সেব কাজের প্রতি তার ভীতি ছিল, যেগুলো নারী ও মেয়েদের জন্য জরুরী মনে করা হয়। তিনি এসব কাজের বিরাট

আগ্রহী, সুরুচিবান ও সুদক্ষ ছিলেন। এতটুকুও কম ছিলেন না সমবয়সী কারও থেকে।

২৫ নভেম্বর ১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দ। বিয়ে হয়ে গেল তার। আপন মামাত ভাই মাওলানা সাইয়িদ আবুল খায়ের হাসানী সাহেবের সঙ্গে। এ সম্বন্ধ তো ছিল অনেক পুরনো! কিন্তু বিভিন্ন ঘটনা-দুর্ঘটনার কারণে বিলম্ব হচ্ছিল বরাবর। তখন পর্যন্ত তার বয়সও বেশি হয় নি। সহোদরা মরহুম বোনের জীবনে সুখের দিন ছিল সেই প্রথম কয়েক বছর, যা তিনি আপন পিতৃতূল্য স্নেহশীল মামা ও শ্বশুর মাওলানা হাফেয সাইয়িদ উবাইদুল্লাহ সাহেব রহ. (হযরত সাইয়িদ শাহ যিয়াউন্নবী সাহেব রহ. এর পুত্র, তার ইন্তিকাল হয়ে গেছে মে ১৯৩৮ হিজরীতে)- এর স্নেহের ছায়াতলে কাটিয়েছেন। মরহুম ভাই সাইয়িদ আবুল খায়ের সাহেব ১ম জুন ১৯৭০ খিষ্টাব্দ ইন্তিকাল করেন।

মরহুম ভাইয়ের ঔরসে তার তিনটি সন্তান জন্ম নিয়েছে। দুই মেয়ে এক ছেলে সালেম। এরা সবাই তাকে বিচ্ছেদ যন্ত্রণা দিয়ে যায় দুখের বয়সেই। এমন শিক্ষিত দম্পতি আমাদের বংশে আরেকটি পাওয়া মুশকিল হবে। কিন্তু অনেক জানা-অজানা হেকমত ও রহস্যের কারণে, যার জ্ঞান একান্তই সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময় ও পরম করুণাময় অতিশয় দয়ালু আল্লাহ পাকেরই আছে আর কারও নেই; তার ভাগ্যে সুখ-আনন্দের এ দিনগুলো ১৯৪৩ খ্রিষ্টাব্দে শেষ হয়ে গেছে। তার জীবনে এমন দাগ লেগে যায়, যা ভারতের সম্ভ্রান্ত বংশ ও পরিবারের জন্য স্বাভাবিক অবস্থায় সহ্য করার নয়। কিন্তু তিনি নিজের ঈমানী শক্তি এবং অনেকটা শিক্ষামূলক কর্মব্যস্ততা আর আগ্রহ-রুচির সাহায্যে একে না কেবল সহ্যই করেছেন বরং তার জীবনের এ দিকটি তার শত-সহস্র উন্নতি ও সৌভাগ্যের কারণ হয়েছে। প্রকাশ পেয়েছে طے شود این جادہ باهے گاهے (তথা আহা! কালে কালে হয়েছে অতিক্রম এ পথ) প্রবাদ বচনের বাস্তবচিত্র। তার নিঃসঙ্গ একাকিত্বের এই বাকী জীবন ত্রিশ/পঁয়ত্রিশ বছরের পুরো সময়টাই কেটেছে আপন ভাইদের কাছে। এ ঘরের দরজা দিয়েই তিনি শেষ বিদায় নিয়ে আপন আব্বাজানের পাশে চিরনিদ্রায় শায়িত হয়ে গেছেন।

এটা সে যুগের কথা, যখন তার সময়গুলো লেখাপড়া, আল্লাহর সামনে হাত প্রসারিত করা, নিজের ব্যথা-ভারাক্রান্ত মনের কথাগুলো বলা, দু'আ-মুনাজাত, যিকির-আযকার, তিলাওয়াতে কুরআন, রচনা-গ্রন্থনা ছাড়া কোনও কিছুতে ব্যয় হত না।

পরীক্ষা ছিল কঠিন। তার মন ছিল দুর্বল, ব্যথাতুর ও সীমাহীন অনুভূতিপরায়ণ। খুব সম্ভব ছিল, তার মন-মস্তিষ্কে এমন প্রভাব পড়ে যাবে, যা তিনি সহ্য করতে পারবেন না। এ অবস্থা-প্রেক্ষিতে মরহুম ভাইজান (যিনি ছিলেন একজন স্নেহশীল ভাই আবার দরদী অভিজ্ঞ ডাক্তারও) তার চিকিৎসার জন্য একটি প্রক্রিয়া আবিষ্কার করলেন তিব্বে নববী (নবীজীর চিকিৎসাবিজ্ঞানের) আলোকে। তিনি তার মেধাকে ব্যস্ত আর মনকে প্রশান্ত রাখার জন্য পরামর্শ দিলেন, তুমি বিখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম নববী রহ. (মৃতঃ ৬৭৬ হিঃ)-এর প্রসিদ্ধ এবং আগাগোড়া বরকতপূর্ণ কিতাব "রিয়াযুস্ সালেহীন"-এর উর্দূ অনুবাদ করে দাও। এ কিতাবখানা মরহুম ভাইজানের কাছে অনেক প্রিয় ছিল। তার আগ্রহ-চেষ্টায় একটি প্রথমবার নদওয়াতুল উলামার পাঠ্যভূক্ত করা হয়। আর আজ এটা আরব দেশগুলোতে দ্বীনী এবং দাওয়াতী মজলিসগুলোর বিরাট গ্রহণযোগ্য কিতাব। তখন পর্যন্ত উর্দুতে এর কোনও অনুবাদ প্রকাশ হয় নি। কিন্তু কাজটা তত সহজ ছিল না। মূল কিতাবখানা মাঝারি কলেবরে হালকা মিসরীয় টাইপে সাড়ে চার শ'র অধিক পৃষ্ঠায় রচিত। এতে হাদীস সংখ্যা এক হাজার নয় শত তিন (১৯০৩) টি। এতে ছিহাহ গ্রন্থে সেসব হাদীসও সন্নিবেশিত আছে, যার ব্যখ্যায় বড় বড় জটিল বহু স্থান আসে। আর তার ব্যাখ্যায় উচ্চ পর্যায়ের উলামায়ে কিরাম ডজন ডজন এবং বিশের অধিক পৃষ্ঠা কালো করেছেন কলমের কালিতে। তিনি যথারীতি হাদীসের (কোনও মাদরাসা, বিদ্যাপীঠ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা কি বলব?) কোনও উস্তাদের কাছেও হাসীস পড়েন নি। আর পারিবারিক ও ঘরোয়া শিক্ষা-অধ্যয়নে এবং মাদরাসা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মাঝে বিরাট পার্থক্য হয়ে থাকে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাকে অনেক বড় সাহস দিয়েছেন। তিনি "যাদে সফর" (বা পথের কড়ি) নামে সংশ্লিষ্ট শিরোনাম ও ব্যাখ্যামূলক জ্ঞাতব্যসহ এর অনুবাদ সম্পন্ন করে ফেলেন। এ অনুবাদ যার চতুর্থ সংস্করণ পাঠকের সম্মুখে– এটা দু'খণ্ড এবং আট শ'র অধিক পৃষ্ঠায় মুদ্রিত। আজ চিন্তা করলে একে একটি কারামত বলেই মনে হয়। জানি না, এটা আমাদের মুখলেছ একনিষ্ঠ ভাইয়ের কারামত ছিল নাকি সেই বোনের ব্যথাতুর চুরচুর ভগ্নপ্রাণের– যার সম্পর্কে বারী তা'আলার ঘোষণা রয়েছে– انا عند المنكسرة قلوبهم (আমি ভগ্নপ্রাণের খুব কাছে থাকি)। মোটকথা, আজ যখন হাদীসের বিশাল কিতাবের প্রতি লক্ষ্য করি, যা ইনশাআল্লাহ তার এই আধ্যাত্মিক সফরে "আলোময় তরী" এর কাজ করেছে বলেই মনে হয়, তখন জলিল মাঙ্গপুরীর নিম্নোক্ত পঙক্তিটি অজান্তে অনিচ্ছায়ই মনে পড়ে যায়–

مل گیا زاد سفر مجھ کو سفر سے پہلے

"পেয়ে গেলাম আমি পথের কড়ি সফরের আগেই"।

মাওলানা শাহ হাকীম আতা সাহেব এ পাণ্ডুলিপির উপর পুনঃদৃষ্টি ও উপকারী পরামর্শ দেন। তার আরও সৌভাগ্য ছিল যে, বিশিষ্ট আলেম সমকালের গবেষক মাওলানা সুলাইমান নদবী রহ. স্বস্নেহে ও অনুগ্রহপূর্বক (১৫ শা'বান ১৩২৫ হিঃ) এর উপর একটি ভূমিকা লিখে দেন। তিনি তার ভূমিকায় লিখেন– আমি অতিব আনন্দের সাথে বলছি, ইমাম নববী রহ. "রিয়াযুস সালেহীন" কিতাবখানার অনুবাদ এমন ঘরের লোক করেছেন, যে ঘর সুন্নাতের নববীর প্রচার-প্রসার এবং বিদ'আত-কুসংস্কার নির্মূলের কাজ এক শতক পূর্ব থেকে শুরু করে ছিল। যাদের জ্যোতির্ময় আলো-আভা, নূর ও বরকতসমূহ দেশের সর্বত্র উজ্জ্বল দ্বীপ্তিমান। اللهم زد فزد ولا تنقص (হে আল্লাহ তুমি আরও অনেক অনেক উন্নতি দাও; কমিও না)।

আরেকটু সামনে গিয়ে লিখেন– উক্ত অনুবাদিকা তার অনুবাদে ভাষার সাবলীলতা প্রাঞ্জলতার ও গতিশীলতার লক্ষ্য রেখেছেন। স্থানে স্থানে প্রয়োজনীয় টীকা-টিপ্পনী সংযোজন করেছেন। প্রতিটি হাদীসের শিরোনাম দিয়েছেন। যার দ্বারা মর্মকথা বা অন্তর্মর্ম পর্যন্ত পৌঁছুতে কিতাবের পাঠকদের বিরাট সহজ হয়।"

কিতাবখানার অসাধারণ গ্রহণযোগ্যতার একটি প্রমাণ তো সে সব অসংখ্য শোকপত্র থেকে পাওয়া যায়, যেগুলো তাঁর মৃত্যুর পরে হস্তগত হয়েছে। যেগুলোর লেখকগণ ঐ কিতাব সম্পর্কে গভীর প্রভাব-প্রতিক্রিয়া এবং উপকারীতা লাভের কথা উল্লেখ করেছেন। দ্বিতীয়ত খুব সম্ভব তিনিই প্রথম ভারতীয় নারী, যার রচনা জিদ্দাস্থ সউদী বেতার কেন্দ্র থেকে কিস্তি কিস্তি উর্দূ প্রোগ্রামে সম্প্রচারিত হয়েছে। আর রাবেতা আলমে ইসলামী তো এর কয়েক শ' কপি ক্রয় করে উর্দূভাষী দেশগুলোতে প্রেরণ ও বিতরণ করেছে। সুতরাং কবি যওকের নিচের পঙক্তিটি যেন পুরোপুরি তার অবস্থামাফিক, تری آواز مکے اور مدینے (তোমার ডাক মক্কা-মদীনায়।)

এ কিতাবখানার প্রকাশ্য বরকত দেখা গেছে, এ অনুবাদকর্ম সম্পন্ন করার পরপরই আল্লাহ তা'আলা তাকে হজ্জে গমনের সৌভাগ্য দান করেছেন। তাকে পৌঁছে দিয়েছেন দরবারে রেসালাতে, যার কথা ও বাণীর করেছেন তিনি নিজের সাধ্যমত। এ সফরের ঘটনাও আশ্চর্য প্রভাবময় ও শিক্ষণীয়।

সম্ভবত ১৯৪৭ খ্রিঃ এপ্রিল মাসের কথা। আমাকে তাবলীগ জামাতের তৎকালীন আমীর মাওলানা মুহাম্মদ ইফসুফ কান্ধেলবী রহ. হেজাযের উদ্দেশ্যে সফরের প্রস্তুতি গ্রহণ ও পোশাক পরার নির্দেশ দিলেন। আর সিদ্ধান্ত করলেন, আমি যেন কিছুদিন সেখানে অবস্থান করি। যেন এই দাওয়াতী কাজের উন্নতি সাধন এবং শিক্ষিত মহলে একে পরিচিত করার প্রয়াস চালাই। যার সূচনা কয়েক বছর পূর্বেই করা হয়েছিল। তিনি না কেবল এ নির্দেশই দিলেন বরং পথের কড়ি ও সফরের ব্যবস্থাও করে দিলেন। আমাদের শিরোমনি মাখদূম এবং যারপরনাই স্নেহশীল বুযুর্গ হযরত শাইখুল হাদীস মাওলানা মুহাম্মদ যাকারিয়া সাহেব রহ.- যার বিশেষ স্নেহদৃষ্টি প্রথম থেকেই আমি অধমের প্রতি ছিল তিনি হুকুম করলেন, মুহতারাম আম্মাজান, সহধর্মীনি এবং স্নেহের ভাগ্নে মৌলভী মুহাম্মদ ছানীকে সঙ্গে নিয়ে নিবে। যাতে স্থির মনে সেখানে দাওয়াতের কাজে লিপ্ত থাকতে পার। সে মুহূর্তের কথা আমি কখনও ভুলব না, যখন সেই মরহুমা সহোদরা বোন, যিনি বেশ কয়েকদিন ধরে এ সফরের কথা শুনে আসছিলেন, তিনি অকস্মাৎ আমার কামরায় প্রবেশ করলেন এবং বড় অধিরতা ও ব্যাকুলতার সঙ্গে কেঁদে কেঁদে বললেন- আলী! তোমারা কি আমাকে এখানেই ফেলে যাবে? তাঁর কথা শুনে স্বয়ং আমারই কান্না থামানো মুশকিল হচ্ছিল। কেননা তার জীবনরে সকল ঘটনা আমার সম্মুখে ছিল। আমি বললাম, না। আমি অঙ্গিকার করছি, আপনাকে ছাড়া যাব না। নতুবা কেউ যাবে না। একথা শুনে তিনি নিশ্চুপ চলে গেলেন।

আমি কথা বলতে তো সেকথা বলে দিলাম। কিন্তু মুশকিল ছিল, তখন মাত্র এক বছর হয়েছিল যুদ্ধ শেষ হয়েছে এবং হিজাযের পথ খুলেছে। সফরের জন্য মুসাফিরদের কোটা ছিল নির্ধারিত। দরখাস্ত দিতে হত। তারপর পারমিট (অনুমতিপত্র) আসত। আর সেসব লোকই যেতে পারত, যাদের হজ্ব কমিশনের পক্ষ থেকে পারমিট হাতে এসেছে। আমাদের তিনজনের পারমিট এসে গিয়েছিল। কিন্তু স্নেহের মৌলভী মুহাম্মদ ছানী এবং আমার সহোদরা বোনের জন্য তখন পর্যন্ত কোনও দরখাস্তই দেওয়া হয় নি। আর সময় পেরিয়ে যাওয়ার কারণে তাদের জন্য পারমিট তিতে অস্বীকৃতি জানানোর আশঙ্কাই ছিল বেশি। ভাগ্যক্রমে আমি নিজেই দিল্লি গেলাম। সেসময় ভারত সরকারের হজ্ব অফিসার ছিলেন লাল শাহ্। আমি তার সঙ্গে সাক্ষাত করলাম। তিনি বললেন- কোটায় এখন আর কোনও সুযোগ নেই। আমি হতাশ হয়ে ফিরছিলাম। তিনি আমাকে আবার

ডাকলেন, বললেন, মাওলানা! সুযোগ তো নেই, তবে আমি ব্যক্তিগতভাবে বলছি– আপনি বন্দরে পৌঁছে গেলে সুযোগ বেরিয়ে আসবে ঠিকই। প্রাণে প্রাণ ফিরে এল। আমি লক্ষ্ণৌ এসে বোনকে এই সুসংবাদ শোনালাম, এখন প্রয়োজন আপনার দু'আ। করাচি পর্যন্ত তো আমরা সবাই একসঙ্গে যাব। তার সম্মুখে আপনার দু'আ এবং আল্লাহর রহমত।

তিনি এই সংশয়পূর্ণ অবস্থায়ও যাওয়ার জন্য তৈরী হয়ে গেলেন। সেদিন যেন তার ঈদের দিন হয়ে গেল। অনেক বছর তিনি সানন্দে রায়বেরলী গেলেন আপন বোনের সঙ্গে সফরের মুহূর্ত এসে গেল।

২৬ জুন ১৯৪৭ খ্রিঃ (শা'বান ১৩৬৬ হিঃ) একই ঘরের পাঁচ সদস্যের এই ছোট্ট কাফেলাটি পাঞ্জাব বন্দর থেকে যাত্রা করল। পূর্ণ পথই অতিক্রম হল আশা-ভরসায়। পথিমধ্যে মহিলা বগিতে অবস্থানরত সহোদরা বোনটি মরহুমা আম্মাজানের জ্বালাময়ী মোনাজাতগুলো পড়ে শোনাতেন। যাতে মহান আল্লাহর অপার অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়েছিল। লাহোরের পথে আমরা করাচি পৌছি। বোম্বাই আমাদের থেকে কাছে ছিল। কিন্তু তখন পর্যন্ত সেখানে কারও সঙ্গে পরিচয় ছিল না। করাচিকে বেছে নেওয়া হয়েছে হাজী আব্দুল জাব্বার সাহেবের কারণে। যিনি ছিলেন দিল্লির পাঞ্জাব বংশোদ্ভুত। করাচির বিখ্যাত ও বিশিষ্ট ব্যবসায়ী এবং তাবলীগ জামাতের ঐ অঞ্চলের প্রথম মুবাল্লিগ ও সক্রিয় সাথী। তার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল নিযামুদ্দীনে, হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াছ রহ. এর জীবদ্দশায় ও দয়ার্দ্রতার ছায়ায়। আমরা করাচি পৌছেছি অকস্মাৎ। এখন স্মরণ নেই, হাজী সাহেবকে আগে ফোন দেওয়া হয় নি কেন? রাতটা আমরা যেন-তেনভাবেই কাটালাম। তারপর আমি হাজী সাহেবের খেদমতে গিয়ে হাজির হলাম এবং ভয়ে ভয়ে বললাম, আমাদের সঙ্গে দু'জন অভিযাত্রী পারমিট ছাড়া আছেন (আল্লাহ পাক তাদের কবরকে আলোয় আলোয় ভরে দিন)। হাজী সাহেব শোনামাত্র বললেন– আপনি কোনও চিন্তা করবেন না, সকলেরই ব্যবস্থা হয়ে যাবে। তখনই তাঁর পুত্রকে হুকুম করলেন, গাড়ি নিয়ে যাও! সবাইকে নিয়ে এসো এবং ভাইজান (হাজী আব্দুস সাত্তার)-এর ওখানে থাকতে দাও। তখনই এ কাফেলা হাসি-খুশি পৌঁছে গেল আব্দুস সাত্তার সাহেবের কুঠিতে। তার কুঠির কয়েক রুমবিশিষ্ট উপরতলাটি আমাদের জন্য নির্দিষ্ট করে দেওয়া হল। আল্লাহ তা'আলা ঐ দু'ভাইয়ের মর্যাদা বাড়িয়ে দিন। দান করুন অনন্ত সুখ-শান্তি। কেননা ঐ হাজী আব্দুল জাব্বার সাহেব আমাদের মনোরঞ্জন ও সহানুভূতি প্রদর্শন এবং হাজী আব্দুস সাত্তার ও তার পরিবার সেবা-যত্ন ও

আতিথিয়েতায় এতটুকুও ক্লান্তিবোধ করেন নি। আমাদের টিকিট ছিল উলাবী জাহাজের– যা ছোটও ছিল আবার এর তারিখও ছিল সন্নিকটে। এদিকে মরহুমা বোন নারীদের বেশ কিছু তাবলীগী জলসায় তার কোনও দ্বীনী (ধর্মীয়) রচনা কিংবা "যাদে সফর" এর কোনও অংশ পড়ে শুনিয়েছেন। অপরদিকে আমিও তাবলীগী ময়দানে এখন থেকে বেশি দীপ্তিমান ছিলাম। কাজেই হাজী আব্দুল জাব্বার সাহেব মরহুম একটি সুবিজ্ঞ পরামর্শ দিলেন। যার রহস্য পরবর্তীতে বুঝা গেছে। তিনি পরামর্শ দিলেন, আপনারা উলাবী জাহাজের পরিবর্তে ইসলামী জাহাজে সফর করুন। এ জাহাজটি যেমনি বড়; তেমনি আরামদায়ক। তা ছাড়া এটা বন্দর ছেড়ে যাওযার পূর্বে সপ্তাহ দশদিন বাড়তি উপকার লাভের সুযোগও হবে আমাদের। তার পীড়াপীড়ি আর সে সময় করাচিতে অবস্থানরত এবং তাবলীগ জামাতের প্রথম সারীর আরেক সক্রিয় সাথী মুহাম্মদ শফী সাহেব কুরাইশী রহ. এর তাগিদে তার পরামর্শ মেনে নেওয়া হয়। অনন্তর দেখা গেল, যারা উলাবী জাহাজে সফর করেছিল, তাদের চরম দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে। পৌঁছাতেও হয়েছে অনেক বিলম্বে। পক্ষান্তরে ইসলামী জাহাজে সফর করার পেছনে অনেক অনেক রহস্য ছিল, যা সামনে উল্লেখ করা হচ্ছে।

ইসলামিক জাহাজে আমরা প্রথম শ্রেণীর যে কেবিনটি পেয়েছি, তার পাশের দুটি কেবিন ছিল বোম্বাই থেকে আগত এক বিরাট বিশিষ্ট নন্দিত ব্যবসায়ী হাজী আহমদ এবং তার বংশের লোকজন। এখানেও সেই অবস্থার সৃষ্টি হয়, যা হয়েছিল করাচিতে। জাহাজ জুড়ে ছিল তাবলীগী ও দাওয়াতী পরিবেশ। মহিলাদের পৃথক জলসা হত। সেখানে কোনও একভাবে মুসাফির মহিলারা জানতে পারল যে, বোনটি একজন লেখিকা ও বিদ্বান-গবেষক। দ্বীনিয়াত ও ধর্মীয় জ্ঞান-প্রজ্ঞায় সুদক্ষ। ব্যাস আর যায় কোথায়! এক-দুটি রচনা শোনার পরে এ নারীগণ তার ভক্ত-অনুরক্ত হয়ে গেল। তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি অনুরাগ ও সম্পর্ক হয়েছে হাজী আহমদ সাহেবের বংশের, বিশেষত তাদের "খোশদামন" সাহেবার। তিনি তো একেবারে মাতৃসূলভ আচরণ করতে থাকেন। বোনটির মন ছিল এমনিতেই দুর্বল আর বিভিন্ন দুঃখ-ব্যথা ও শোকতাপ তাকে করে দিয়েছিল আরও দুর্বল। ঝড় বইছিল সমুদ্রে আর জাহাজে অস্বাভাবিক নড়াচড়া ও হৈচৈ। তার ভয় হতে লাগল। ছড়িয়ে পড়ল ত্রাস। এহেন মুহূর্তে এই পুণ্যবান ধার্মিক নারী রহমতের দূত হয়ে সম্মুখে আসেন। তিনি তাকে (বোনটিকে) সব ধরনের সান্ত্বনা দিতেন। নিজের কেবিনে নিয়ে যেতেন। খাতির-যত্ন

করতেন বেশ। তার বিচ্ছিন্নতা পছন্দ ছিল না। তার মধ্যে শ্রদ্ধা-স্নেহ দুটিই ছিল সমান। এ সম্পর্ক এমনই বরকতময়, উপকারী ও স্থায়ী-সুদৃঢ় প্রমাণিত হয়েছে, যার ফলে হজ্ব থেকে প্রত্যাবর্তনের পর এবং এ মরহুমার জীবনের শেষদিন করাচিতে মৃত্যুবরণ পর্যন্ত তিনি কখনও তার পত্রাবলী ও হাদিয়া উপহার প্রেরণ বন্ধ করেন নি। মরহুমা বোন ঐ বংশ-পরিবারের সম্মান ও মহব্বতের কথা যখনই স্মরণ করতেন, তখন তার প্রতিটি অভিব্যক্তিতে কৃতজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ ঘটত। তার মনপ্রাণ অফুরন্তভাবে তাদের জন্য দু'আ করত। বন্দরে পৌঁছতেও তিনি বিরাট সাহায্য করেছেন। হারামাইন শরীফাইনে গিয়েও তিনি আসা-যাওয়া করতেন যথারীতি। নিয়ে যেতেন সঙ্গে করে। আমাদের প্রত্যাবর্তনের মুহূর্তে বোম্বাইতে একরকম জোর করে এই মহিলা কাফেলাকে তিনি নিজ বাড়িতে অবস্থান করান। আমার সে বোনটিই নয় বরং যেসব মেয়েদের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল, তাদের সঙ্গেও তিনি এ স্নেহ-প্রীতি প্রকাশ করতেন। বোম্বাই থাকতেই মুহাম্মদ ছানীর ওখানে প্রথম সন্তান জন্মের সংবাদ পেলাম। তখন তিনি এ নবজাতকের জন্য– যিনি স্বয়ং এখন মাশাআল্লাহ দুই সন্তানের জননী (উমামা হাসানী)– কাপড়-চোপড় ও খেলনাপাতি পাঠালেন। মরহুমা আম্মাজানের বরকতে কিংবা মরহুমা বোনটির উপর আল্লাহর রহমতে এ সফরে পদে পদে আল্লাহর মদদ ও সাহায্য প্রত্যক্ষ করেছি খোলা চোখে।

হজ্বে বিশেষত আরাফার ময়দানে বিরাট মনোযোগিতা, ব্যস্ততা এবং দু'আ-মুনাজাতের মধ্যে সময় কেটেছে। তার অবস্থা ছিল আরাফার ময়দানে পঠিত মাসনূন দু'আর প্রতিচ্ছবি।

أنا البائس الفقير المستغيث المستجير الوجل المشفق

"আমি দীন-দুঃখী, মুখাপেক্ষী-অভাবী, ফরিয়াদী-প্রার্থনাকারী, আশ্রয়প্রার্থী, কম্পমান ভীত-সন্ত্রস্ত।"

হজ্জ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর তার সবচেয়ে যত্নের-গুরুত্বের ও প্রিয় ব্যস্ততা ছিল মুহতারামা আম্মাজানের সেবা-শুশ্রূষা এবং তার সাহায্য সহযোগিতা। যিনি দিন দিন দুর্বল রুগ্ন অক্ষম হয়ে যাচ্ছিলেন। আর জীবনের শেষ বছরগুলোতে তার দৃষ্টিশক্তি একেবারেই হারিয়ে যাচ্ছিল। একাজ যেমন ছিল মুশকিল, তেমনি স্পর্শকাতর। সার্বক্ষণিক দায়িত্ব, দুর্বলতা ও অক্ষমতার চাহিদা ও প্রয়োজনাদি আবার তার উপর মায়ের ব্যাপার। এটা একান্তই তার সৌভাগ্য ও সাহসিকতা ছিল। জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত তিনি এ দায়িত্বভার অতি উত্তমরূপে সামলে যান। আর فلا

فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما আয়াতে কারীমার উপর এমনভাবে আমল করেন, যার ফলে তিনি (আম্মাজান) এ নশ্বর পৃথিবী থেকে বড় আনন্দিত ও প্রশান্ত মনে এবং তার জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনাকারী হয়ে বিদায় নেন। এটা দু'এক বছরের বিষয় ছিল না। অবশ্যই প্রায় দশ বছর কেটেছে এই ধারাবাহিক ও ধৈর্য পরীক্ষার সেবা-শুশ্রূষায়। এটা তার জীবনের এক চমকপ্রদ অধ্যায়। আর পরকালীন জীবনের এক অমূল্য সঞ্চয়। আম্মাজানের ইন্তিকালের বিষয়ে প্রকাশিত "রিযওয়ান' পত্রিকার এক বিশেষ সংখ্যায়" তার যে রচনা ছাপা হয়েছে, তাতে সেকালের কিছু তথ্যচমক দৃষ্টিগোচর হয়।

১৯৪৩ খ্রিষ্টাব্দে হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াছ রহ. আমাদের দীনঘর রায়বেরলী তাশরীফ নিয়েছিলেন। তখন তিনি আম্মাজান, বংশের অন্যান্য নারী ও বোনদের সঙ্গে তার হাতে বাইআত এবং তাওবা করেছিলেন। পরবর্তীকালে তার ইন্তিকালের পর হযরত মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী রহ. এর হাতে নতুনভাবে বাইআত হন। (বাইয়াত নবায়ন করেন।) আর জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তার প্রতি মহব্বত ও শ্রদ্ধানুরাগ ছিল। চিঠিপত্র লেখারও মুহূর্ত এসেছে। তিনি একবার হযরত মাওলানার বরাবরে এক ভারী ব্যথা-ভারাক্রান্ত ও প্রাণস্পর্শী পত্র লিখেছিলেন। দরখাস্ত করেছিলেন দু'আ ও অন্তর্দৃষ্টি দানের। মাওলানা এর জবাব অসাধারণ স্নেহ ও নেহাৎ গুরুত্বের সাথে দিয়েছিলেন দেখেছি। পত্রখানার শব্দে শব্দে তার গভীর প্রভাব এবং বুযুর্গসুলভ স্নেহ-প্রীতির বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল। তাতে তিনি তাকে গভীর সান্ত্বনা দিয়েছিলেন। প্রকাশ করেছিলেন সমবেদনা। আমাদের বড় বোনসহ ঘরে আরও বেশ কয়েকজন সদস্য হযরত শাইখুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া রহ. সাথে বাইয়াত ও তরবিয়তের সম্পর্ক রাখতেন। হযরত শাইখের প্রতি মরহুমা বোনটির বিশেষ প্রদ্ধানুরাগ ছিল। একবার তো তিনি খাদেমা (সেবিকা) সুলভ অনুযোগ করলেন, তিনি শুধু বড় বোনকে (যনি নিয়মিত চিঠিপত্র লিখতেন হযরতকে) সালাম লিখেন এবং দু'আ দেন। হযরত শায়খ এরপর থেকে আবশ্যক করে নিয়েছিলেন, প্রত্যেক চিঠিতে তাকেও অবশ্যই সালাম লিখবেন এবং দু'আয় শরীক রাখবেন। মরহুমা এ বোন সে সময় একাধিক ধর্মীয় বই-পুস্তক ও প্রবন্ধ-নিবন্ধ লিখেছেন। আল্লাহ পাক যখন আমাকে আরবী ভাষায় শিশুদের উপযোগী করে মাদরাসার প্রাথমিক পাঠ্যবই হিসেবে তিন খণ্ডে রাসূলে কারীম সা. কিস্সা লেখার তাওফীক দিলেন, যা "কাসাসুল্ নাবিয়্যীন"

নামে প্রকাশিত, তখন তিনি এর খোলা তরজমা করেছেন। যা স্বতন্ত্র একটি রচনার মর্যাদার রাখে এবং "শিশুদের কাসাসুন্ নাবিয়্যীন" নামে প্রকাশিত ও সমাদৃত হয়েছে। ভাইয়ের তো সে সময় তিন খণ্ড মাত্র লেখার তাওফীক হয়েছিল। কিন্তু উক্ত সাহসী বোন এর চতুর্থ ও পঞ্চম খণ্ড লিখে এ ক্রমধারা সম্পন্ন করেন। চতুর্থ খণ্ডে হযরত শু'আইব আ., হযরত আইয়ূব আ., হযতে দাউদ ও সুলাইমান আ. প্রমুখ নবী-রাসূলগণের ঘটনা রয়েছে। আর পঞ্চম খণ্ড সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ সা. জীবন চরিত প্রসঙ্গে লিখিত। যা "আমাদের নবী সা." নামে প্রকাশিত ও সাদর সমাদৃত হয়েছে।

আমাদের বংশে একটি প্রার্থনামূলক কবিতা বিরাট সমাদৃত ও প্রচলিত আছে। দুঃখ-দুর্দশা, পেরেশানী এবং অধিকাংশ ওযীফা হিসেবে ভারী সুর-সঙ্গীত ও মর্মস্পর্শীতার সাথে এটা পাঠ করা হয়। এটা বংশের নারী ও কন্যাদের মুখস্থ আছে। এটা কোনও এক অজানা তবে নন্দিত কবির লিখিত কবিতা। যার ছদ্মনাম ছিল হাতেফ। উক্ত কবিতায় মহান আল্লাহর আসমায়ে হুসনার মধ্য থেকে এক একটি নাম নিয়ে তার কাছে দু'আ করা হয়েছে। এটা প্রসিদ্ধ ছিল "নাতে উযমা" (মাহাত্ম্যের গান) নামে। মরহুমা বোনের এর প্রতি ছিল বিশেষ আকর্ষণ, পাঠে ছিল বিরাট পারদর্শিতা। তিনি একে "মুনাজাতে হাতেফ" নামে প্রকাশ করেছেন। এ কিতাবের প্রকাশনাও তার একটি সুকীর্তি।

সেকালে আরও একটি কাজ ছিল, সেসব মোনাজাত এবং কবিতাগুলোর অনুলিপি তৈরী করা, যেগুলো মরহুমা আম্মাজান রচনা ও আবৃত্তি করতেন; তিনি স্বয়ং লিখতে পারতেন না। এজন্য অন্য কাউকে দিয়ে লেখাতেন। এ কাজটি বেশিরভাগ তাঁকেই করতে হত। সেইসঙ্গে তিনি নিজের বড় বোনের গৃহস্থলীর কাজকর্ম-ব্যবস্থাপন– যা মাশাআল্লাহ এক বড় ও প্রাণচঞ্চল ঘর– এর দায়িত্বভারও স্বেচ্ছায় নিজ কাঁধে তুলে নেন এবং তাকে প্রায় এ চিন্তা-ভাবনা থেকে মুক্ত করে দেন। নিজের মন ভুলানো এবং খেদমত করা আর সেবা-শুশ্রূষার আগ্রহে তিনি নিত্যদিনের প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ও রাখতে শুরু করেন। এভাবে ব্যবসার একটি সুন্নাত পালনও হয়ে যায়। একারণে অনেক সময়ই তাকে দুর্ভোগ পোহাতে হত। বেশির ভাগ এসব জিনিস বাকীতে বা ঋণ হিসেবে যেত। তার বড় বড় অংকের টাকা-পয়সা চলে যেত মানুষের হাতে। বেশ কয়েকবার তাকে বলা হয়েছে, কেন সে এই টানাপোড়েন ও মাথা ব্যথা কিনে রাখে? তিনি এর জবাবে বলতেন, আমি এসব জিনিসপত্র না রাখলে মানুষের কষ্ট-ভোগান্তি হয়ে যাবে। এর দ্বারা সময়-অসময় মানুষের

কাজ হয়ে যায়। পূর্ণ হয়ে যায় প্রিয়জনদের প্রয়োজনাদি। বলাবাহুল্য, আমাদের বাড়ি শহর থেকে দূরে। কাছে ধারে কোনও বাজারও নেই।

ডিসেম্বও ১৯৫৬ খ্রিঃ থেকে স্নেহের মাওলানা মুহাম্মদ ছানী এবং তার তত্ত্বাবধানে মুসলমান স্ত্রী, কন্যা, বোন ও মাহিলাদের ধর্মীয় পুস্তিকা "রিযওয়ান" প্রকাশ শুরু হয়। এতে তার লেখাপড়ার আরেকটি কর্ম হাতে আসে। এতে তিনি সমানভাবে প্রবন্ধ-নিবন্ধ লিখতেন। তার বিভিন্ন কবিতাও ছাপা হত এতে। এই ধারাবাহিকতা তার মৃত্যু অবধি চালু থাকে।

এগুলো তার জীবনগ্রন্থেও জরুরী অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ও শিরোনাম। যেগুলো জীবনী রচনার জন্য আবশ্যকীয়। কিন্তু তার জীবন গ্রন্থের সর্বাধিক মূল্যবান পৃষ্ঠা এবং সবচেয়ে আলোকোজ্জ্বল শিরোনাম হল, তার মনোত্তাপ, অন্তর্জ্বালা, দু'আর আগ্রহ, তার মনের ব্যাকুলতা, তার চক্ষুদ্বয়ের অশ্রুপাত এবং তার অহর্নিশ আহাজারী। বাহ্যত যা তার বিশেষ অবস্থা-প্রেক্ষিতের ফল। কিন্তু বাস্তবে তার দাসত্ব প্রকাশের জন্য অদৃশ্য সম্পদ; তার উন্নতি ও মর্যাদা বৃদ্ধির উপকরণ। বড় শুভ সেই ভূমিকাগুলো, যা এমন পরিণতি সৃষ্টি করে। আরও শুভ সেসব অবস্থা-পরিস্থিতি, যা এভাবে (কাউকে তার) মালিকের সামনে কাঁদায়; প্রবাহিত করে প্রেমাশ্রুর, যা দেখে-শুনে উদ্বেলিত হয় মহান আল্লাহর অজস্র রহমত। পাথর প্রাণেও পানি নির্গমন হয়। বিদায় হওয়ার পূর্বে একবার একটু এই কবিতা পড়ুন। কেমন প্রাণ থেকে নিঃসৃত এ কবিতা! আর রহমতের সাগরে কেমন তার যাদুক্রিয়া? আজও তা মনের স্থির সমুদ্রে যাদুময় তরঙ্গ সৃষ্টির জন্য যথেষ্ট। পড়ুন এ কবিতা! পড়ুন বারবার! পড়ুন মনের গহীন থেকে!

کب سے کھڑی ہوں یارب امید کے سہارے
یہ دن نہ جانے میں کس طرح سے گزارے

بے چین و مضطرب دل جاکر کسے پکارے
وہ کون ہے جو حالت بگڑی ہوئی سنوارے

ہے باب یہ کرم کا خالی نہ پھر یارب
دنیا اگر تجھے ہے پھر کیوں ہی دیر یارب

کنج و قفس سے بدتر اپنا ہے آشیانہ
اس قید بے کسی میں گزرا ہے اک زمانہ

مغموم دل پہ یارب لازم ہے رحم کہانا
کرتی ہوں میں شکایت تجہ سے یہ عاجزانہ

بار الم ہے دل پر طاقت نہیں ہے دل میں
کیونکر ہو صبر مجہ سے ہمت نہیں دل میں

উক্ত কবিতার আরও দু'টি পংক্তি মনকে সামলে নিয়ে শুনুন। তিনি লিখেন–

کب سے لئے کہڑی ہوں میں کاسئہ گدائی
اب تک ملا نہ مجہ کو اور شام ہونے آئی

এটা দ্বিতীয় কবিতা। আর কে আছে এমন বড় থেকে বড় বিদ্বান-পণ্ডিৎ ও ব্যথিতপ্রাণ, যে এই কবিতা পড়ে দাসত্ব ও অক্ষমতার স্বাদ পাবে না।

بندہ نواز میری منت کی لاج رکہ لے
میری نہیں تو اپنی رحمت کی لاج رکہ لے

এসব কবিতা তার সংকলিত "বাবে করম" থেকে চয়িত। যা ছাপা হয়ে দু'আ ও মুনাজাতে আগ্রহী নারী-পুরুষের মাঝে সাদর সমাদৃত হয়েছে।

অবশেষে একদিন সেই মুহূর্ত এসে পড়ে, যা নিশ্চয় আসবে সকল প্রাণীর জীবনে। তিনি যার দুয়ারে বছরের পর বছর কপাল ঠুকেছেন, দিয়েছেন সিজদা, করেছেন আহাজারী আর মুহতারামা আম্মাজানের ভাষায় সত্যিই বলতে হয় :

عمر گزری ہے ترے دربار میں آتے ہوئے
گڑ گڑ آتے مانگتے اور ہاتہ پہیلاتے ہوئے

(কেটেছে জীবন দুয়ারে তোমার কপাল ঠুকে। কত কান্না-কাটি, যাচনা আর হাত পেতে।)

সুতরাং তার রহমতের ফায়সালা চূড়ান্ত হয়ে গেল। এবার তিনি তার এ বিনীত, ব্যথা ভারাক্রান্ত, ভগ্নপ্রাণ, মনোত্তাপে দগ্ধ বান্দিকে এই শ্রম সাধনার জগত থেকে আপন রহমতের ঐ প্রান্তরে ডাকলেন, যেখানে অবস্থানকারীদের জন্য তিনি ঘোষণা করেছেন–

لاخوف عليهم ولاهم يحزنون

(তাদের নেই কোনও ভয়; আর না তারা উদ্বিগ্ন-চিন্তিত হবে।)

রজব-শা'বান ১৩৯৫ হিজরী (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯৭৫ খ্রিঃ) থেকে তার ভেতরে ভেতরে কিছু কষ্ট-যাতনা হতে থাকে। শেষ পর্যন্তই যা নির্ণয় করা সম্ভব হয় নি ঠিকভাবে। যে রমাযানুল মুবারকের (১৩৯৫ হিঃ/১৯৭৫ খ্রিঃ) জন্য বিরাট প্রতীক্ষা ছিল, এবার সে রমাযানে মাত্র দশটি রোযা রাখতে সক্ষম হোন তিনি। কেননা দুর্বলতা ও কাঁপুনির মারাত্মক আক্রমণ হয় তার ওপর। রায়বেরলীর জনৈক অভিজ্ঞ ডাক্তারের চিকিৎসার মাধ্যমে সে অবস্থার উন্নতি হচ্ছিল ঠিক, কিন্তু শক্তি-কর্মক্ষমতা আর ফিরে আসল না। চলাফেরা করতে পারতেন ঠিক কিন্তু দুর্বলতা বরাবরই বাড়ছিল। এদিকে আমরা নদওয়াতুল উলামার ৩১ অক্টোবর থেকে ৩ নভেম্বর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত শিক্ষা সম্মেলন- ১৯৭৫খ্রি.-এর প্রস্তুতি কাজে এত ব্যস্ত হয়ে পড়লাম, যদ্দরুন আমাদের স্বয়ং নিজের আপাদমস্তকের খেয়াল রইল না। কিন্তু যখন সম্মেলন থেকে অবসর হয়ে সম্ভবত ৭/৮ নভেম্বর রায়বেরলী এসে পৌঁছলাম, তখন ঘরে পা রাখতেই সর্বপ্রথম তিনিই নিজ কামরা থেকে বেরিয়ে দরজা পর্যন্ত আসলেন এবং বললেন- আলী! ধন্যবাদ! তোমাদের সম্মেলন বেশ সফল হয়েছে। আমাদের দুই বোন এবং ঘরের মেয়েরা, ছোট বড় সকলেই সম্মেলন সফল হওয়ার জন্য দিনরাত দু'আ করছিল। তাদের কেউ লক্ষ্ণৌ যেতে পারে নি। কিন্তু আগন্তুক আত্মীয়-স্বজনদের কাছ থেকে তারা খবরাখবর নিতেন। তাদের সেই আনন্দ-উচ্ছ্বাসের কথা আজও স্মরণ আছে। যা আমাদের লোকজনের মুখে সম্মেলনের অবস্থা শুনে তাদের হচ্ছিল।

সম্মেলন এবং জরুরী কাজকর্ম থেকে যখন আমরা অবসর হলাম, তখন তার ছোটরা পীড়াপীড়ি শুরু করল, লক্ষ্ণৌ নিয়ে গিয়ে ডাক্তারদের দেখান। সঠিক রোগ নির্ণয় হয়ে যাবে। এতে তার অনেক আপত্তি ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ছোটদের পীড়াপীড়ি প্রাধান্য পায়। তিনি ১৭ জানুয়ারী ১৯৭৬ খ্রি. লক্ষ্ণৌ গমন করেন। যাওয়ার মুহূর্তে তিনি কোনও একজনকে বললেন- "জানি না, হয়তো মৃত্যুই আমাকে টেনে নিচ্ছে।" ইতোপূর্বেও তিনি এমন ইঙ্গিত করেছিলেন। আপন খালাত বোনের মেয়ে ফাতেমা -করাচির নবাব সাইয়িদ নূরুল হাসান খান সাহেবের নাতি নন্দিত কারী সাইয়িদ রশীদ হাসান-এর সহধর্মীনী- তার প্রতি এ বোনটির নিজ সন্তানের মতই স্নেহ-প্রীতি ছিল। তিনি তাকে মেয়ের মতোই রেখেছিলেন। এই সম্বন্ধও হয়েছিল তার পছন্দ ও চেষ্টায়। মেয়েটির মা জীবিত থাকা সত্ত্বেও তিনিই তাকে আপন মায়ের মতো বিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি নবাব সাহেবের সেই যুগ

দেখেছিলেন। তার এবং তার সহধর্মীনীর স্নেহ-মহব্বত সব চোখের সামনে ছিল। তিনি আমাদেরকে নিজ সন্তানের মতোই মনে করতেন। এজন্য তার এ আত্মীয়তায় বিরাট আনন্দ ছিল। কয়েক বছর ধরে এই মেয়ে -আজ যে মাশাআল্লাহ একাধিক সন্তানের মা (আল্লাহ তাদের শান্তি ও নিরাপদে রাখুন)- রায়বেরলী আসত না। তিনি এখান থেকেও তার ছেলেমেয়েদেরকে যথারীতি উপহার পাঠাতেন। কারী সাহেবের যখন চিঠি আসল- আমরা সবাই আসছি, তখন তিনি শোনা মাত্রই বললেন- এখন কি আর আমার সাথে সাক্ষাত হবে?

মরহুমা বোনটি যেদিন লক্ষ্ণৌ পৌঁছলেন, সেদিনই আমার নাগপুর, আওরঙ্গাবাদ এবং পৌনার দৌরপুর যাওয়ার কথা ছিল। আমি ১৭ জানুয়ারী সন্ধ্যায় দারুল উলূম থেকে ঘরে আসলাম। তাকে সালাম করব এবং দু'আ নিয়ে সফরে যাত্রা করব। তখন আকস্মিক বিপদ ও অস্থিরতার কোনও আলামত ছিল না। আমি দীর্ঘক্ষণ বসে বসে কথা বলতে থাকি। যে সময় তিনি আমাকে নিয়ম মাফিক বিদায় জানালেন এবং আম্মাজানের অভ্যাস অনুযায়ী إن الذى فرض عليك القران لرادك إلى معاد পড়ে আল্লাহর যিম্মায় ন্যস্ত করলেন- তখন কি জানা ছিল, সচেতন-সজ্ঞানে এটাই হবে তার সঙ্গে আমার শেষ সাক্ষাত।

সংক্ষেপে বলি, সফরের মাঝে আমার মধ্যে ফিরে আসার এমন তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হল, ফলে নিজের মানসিকতা ও অভ্যাস পরিপন্থী কারও পীড়াপীড়ি জয়ী হতে পারল না। সামনের সকল প্রোগ্রাম স্থগিত করে আওরঙ্গাবাদ থেকে বিমানে করে দিল্লি, দিল্লি থেকে ট্রেনে কানপুর আর কানপুর থেকে জিপে করে ২৫ জানুয়ারী বাদ মাগরিব লক্ষ্ণৌ এসে পৌঁছলাম। সঙ্গে ছিলেন আমার শুভাকাঙ্ক্ষী ডা. মুহাম্মাদ ইশতিয়াক হুসাইন সাহেব কুরাইশী এবং স্নেহাস্পদ মৌলভী মঈনুল্লাহ নদবী (নায়েবে নাযেম নদওয়াতুল উলামা)। গাড়ী থেকে মাটিতে পা রাখতেই মনের মধ্যে বিদ্যুৎ গতিতে এ সংবাদ এসে পড়ল যে, তিনি সম্পূর্ণ অজ্ঞান। বেশ কয়েকজন রোগীর অবস্থা ইতোপূর্বে দেখেছি। আবার এক ডাক্তার পরিবারের সাথে সম্পর্ক আছে। এজন্য তার শেষ অবস্থা-চিত্র বিদ্যুতের মতো চোখের পাতায় ভেসে ওঠল। তারপর এ দুইদিন তিনরাত কিভাবে পার হল, তা বিশদভাবে শোনানোর অবকাশ নেই। এক কথায় জীবনের কঠিন দিনগুলোর মধ্যে সেগুলো অন্তর্ভূক্ত। মানুষের অসহায়ত্ব, জীবনের

অনিশ্চয়তা, পৃথিবীর নশ্বরতা, আল্লাহর ইচ্ছার দৃঢ়তা-কঠোরতা ও রাজত্ব ক্ষমতা সবকিছুর বাস্তবতা প্রতিভাত হয়ে গেল। অবশেষে ২৮ জানুয়ারী আনুমানিক সকাল দশ ঘটিকায় সেই ঘরে, যেখানে তিনি বাবা ও ভাইয়ের ছায়ায় শৈশব, কৈশোর, যৌবন, বার্ধক্য আর দুঃখ-সুখের অনেক দিন কাটিয়েছিলেন– এ প্রাণটা তার সৃষ্টিকর্তাকে সোপর্দ করে দেন। আর পুরোপুরি বাস্তব হয় জিগর মুরাদাবাদীর এ পঙক্তি :

عمر بھر کی بے قراری کو قرار آہی گیا

"সারা জীবনের অস্থিরতা সব আজ তো হলই স্থির।"

সেদিনই আল্লাহর এ আমানতকে, যে ছিল আমাদের সকলের অতিপ্রিয় –তার পৈত্রিক নিবাস থেকে আসল ও চিরস্থায়ী নিবাস পর্যন্ত পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা হয়। إن إلى ربك الرجعى (নিশ্চয় তুমি ফিরে যাবে আপন প্রতিপালকের কাছে) সেদিনই (২৮ জানুয়ারী) আসর নামাযের পরে এক বিশাল জামাআতসহ –যেখানে উপস্থিত ছিলেন অসংখ্য আলেম-উলামা, ছাত্র-শিক্ষক ও নেককার লোকজন– তার জানাযার নামায পড়া হয় এবং তার সেই স্নেহময়ী মায়ের পাশে মাটির বুকে সঁপে দেওয়া হল তাকে। আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি তিনি যার খেদমত করেছিলেন। একদিকে তার সুযোগ্য বিখ্যাত পিতা, অপরদিকে তার স্নেহশীল ও দয়ার্দ্র ভাই ডা. সাইয়িদ আব্দুল আলী আর মাঝে হাসানী ও কুতবী বংশের দুই মহান বুযুর্গ হযরত শাহ আলামুল্লাহ নকশবন্দী এবং হযরত সাইয়িদ মুহাম্মদ আদল রহ. প্রমূখ বুযুর্গানে দীন আরামনিদ্রায় শায়িত আছেন। বর্ষিত হোক আল্লাহ পাকের অফুরন্ত রহমত সকলের ওপর। আর অসংখ্য দরূদ ও সালাম তার প্রিয় হাবীব, নবী-রাসূলগণের সরদার এবং পাপী-তাপীদের সুপারিশকারী মুহাম্মাদ সা. এর প্রতি, যার মাধ্যমেই নসীব হয় সিরাতে মুস্তাকীম, মুক্তির পথ এবং উচ্চ মর্যাদার ধন-রত্ন।

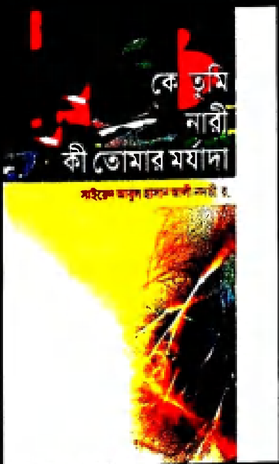

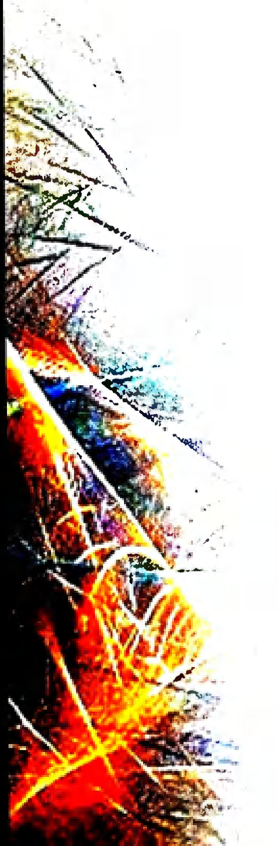

আল ইরফান পাবলিকেশন্স
ইসলামী টাওয়ার, ১১, বাংলাবাজার, ঢাকা

design : shaj ■ 01911031184